মাও. জাকিরুল্লাহ
ড্যানিয়েল হাকিকাতজু

আসিফ আদনান
ডা. শামসুল আরেফীন

অভিশপ্ত রঙধনু

শর'ঈ সম্পাদনা

উস্তায মাঈনুদ্দিন আহমাদ

সম্পাদনা

ইহদা মুখপাত্র

দারুল ইহদা

অভিশপ্ত রংধনু

ISBN: 978-984-347306-6

প্রথম সংস্করণঃ জুমাদা আল-আখিরাহ ১৪৪১ হিজরি

পরিবেশক:
দারুন নাহ্‌দা
৩৪, মাদরাসা মার্কেট, ২য় তলা, বাংলাবাজার।
০১৭৩৯১৫২১৯৭

প্রকাশক
তাজুল ইসলাম
দারুল ইহ্‌দা

www.facebook.com/darulihdaa
darulihda@gmail.com

প্রচ্ছদঃ সানজিদা সিদ্দিকি
পৃষ্ঠাসজ্জাঃ আকিল ইবনে আফছার

অনলাইন পরিবেশকঃ
রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ, নিয়ামাহ শপ,
সুন্নাহ গ্যালারী, নিত্য শপ, মা'ইদাহ শপ

মুদ্রিত মূল্যঃ ৩৫৪ টাকা (তিনশত চুয়ান্ন) টাকা মাত্র

OBHISHOPTO RONGDHANU, published by Darul Ihda, Bangladesh. First Edition in Jumada Al-Akhirah 1441 Hijri.

অভিশপ্ত রঙধনু

উৎসর্গ

"এমন এক মানুষকে যিনি সমস্যা সৃষ্টির আগেই সমস্যার সমাধান নিয়ে কাজ করেছেন,

যে সংশয়বাদ আর তাওহীদ নিয়ে মানুষের মাঝে আজ এতো পরিবর্তন

এই মহামানব সেই কাজটি দু'যুগ আগেই করে দিয়ে গিয়েছিলেন"

-

বাংলায় সবচেয়ে অবহেলিত গুণী

মাওলানা আব্দুর রহিম রাহিমহুল্লাহ

কলমযোদ্ধারা

পাঠ (১-৯) মাওলানা জাফিরুদ্দিন

(মুহাম্মাদ শাকিল হোসাইন)

পাঠ (১০) ড আবু আমিনাহ্ বিলাল ফিলিপস

পাঠ (১০,১১,১৭,১৮) (লস্ট মডেস্টি ব্লগ)

পাঠ (১২,১৫,১৯) ডাঃ শামসুল আরেফিন

পাঠ (১৩,১৪) আসিফ আদনান

পাঠ (১৬) ড্যানিয়েল হাকিকাতজু

মুসলিম স্কেপটিক কালেকশন ইন বাংলা পেইজ

পাঠ (১৯) জেমস পার্কার

(আনিকা তুবা)

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

নিশ্চয় সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের ওপর।

সমকামিতা, সেক্স, পর্ণোগ্রাফি শব্দগুলো সাধারণত ট্যাবু ভাবা হয়। ট্যাবু থাকা ই ভালো ছিল; কিন্তু অশ্লীল সংস্কৃতির আগ্রাসন আর এর প্রভাবে এই শব্দগুলো একজন সভ্য মানুষের কাছে লজ্জার মনে হলেও অধিকাংশ মানুষের কাছে ডাল-ভাত বিষয়। আবার আপনি যদি এই বিষয়গুলো নিয়ে সচেতন করতে চান তাহলে তারাই বলে উঠবে এগুলো লজ্জার বিষয় প্রকাশ করতে নেই। কিন্তু এই মরণ ফাঁদে ধোঁকে ধোঁকে যে হাজার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠছে মুক্তবাতাসের খোঁজে তা অস্বীকার করলেও সত্যটা তা-ই।

"অভিশপ্ত রঙধনু" তেমন একটি বই যেখানে সমকামিতা নামক বিষকে ইসলামি দর্শন এর পাশাপাশি বিজ্ঞান আর দর্শন দিয়ে খন্ডন করা হয়েছে। মূলত বইটি সমকামিতায় আসক্ত ভাই-বোনদের জন্য এক পথ্য। যে সকল ভাই-বোনেরা সমকামী ব্যাধির কারণে সামজিকভাবে, মানসিকভাবে ও আত্মিকভাবে কষ্টে ভোগছেন তাদের জন্য এই বই। ইনশাআল্লাহ্‌ এই বই একটি সুস্থ পরিবার গড়তে বা আপনার সন্তানকে মরণ ফাঁদ থেকে বাঁচাতে পথ দেখানোর চেষ্টা করবে।

বইয়ের মূল ভিত্তি হলো মাওলানা জাফিরুদ্দিন রাহিমাহুল্লাহুর "Islam on Homosexuality" কে কেন্দ্র করে। সমকামিতা বিষয়ে এতো সুন্দর করে আলোচনা করেছেন প্রায় পাঁচ যুগ আগে। স্বভাবতই সংস্কৃতির পরিবর্তনে এমন অনেক বিষয় এই উপমহাদেশ ও বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে যা এই বই আছে কিন্তু বর্তমান সময়কে তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই সময় ও চাহিদা অনুসারে এই বিষয়ে বিজ্ঞান, দর্শন ও ইসলামি দর্শন-কে সময়োপযোগীভাবে উপাস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটকে স্পষ্টকরণে পেডোফেলিয়া ও সমকামিতার নাড়িনক্ষত্র আলোচনা করা হয়েছে। ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের এক ভাই, শামসুল আরেফিন ভাই, আসিফ ভাই, আবদুর রহমান ভাই বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ে আমাদের সার্বিক

সহায়তা করেছেন। বিজ্ঞান ও ইসলামি দর্শনকে মজাদারভাবে উপস্থাপনের জন্য আমরা ড্যানিয়েল হাকিকাতজুর আলোচিত "ডিবেটিং অন হোমোসেক্সুয়ালিটি" প্রবন্ধটি সংযুক্ত করেছি, যা ইন শা আল্লাহ্ পশ্চিমা দা'ঈ দ্বারা প্রভাবিত মুসলিমদের জন্য উত্তম নিয়ামক হবে। সবশেষে এই পাপ থেকে মানসিকভাবে, শারীরিকভাবে ফিরে আসার রাস্তা দেখানো হয়েছে।

শারঈ সম্পাদনার ক্ষেত্রে বইয়ের তথ্যে আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক বিষয় যাচাই করা হয়েছে এবং হাদিস-আসার এর ক্ষেত্রে এর মান এর দিকে খেয়াল রাখা হয়েছে। এই জটিল বিষয়টি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় উস্তায মাইনুদ্দীন আহমাদ ভাই করে দিয়েছেন।

বইয়ের শুরু থেকে শেষ অবধি অনেক ভাই-ই মানসিকভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। আবার অনেক ভাই সতর্ক করেছেন। আল্লাহ্ প্রত্যেক ভাইকে দ্বীনের খেদমতে কবুল করে নিন। বিশেষ করে কারও নাম উল্লেখ করতে চায় না, কারণ নামের তালিকা অনেক বড় হয়ে যাবে।

তবে দারুল ইহদার শুরুর দিকে যিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আশরাফুল ইসলাম ও আমিনুল ইসলাম এর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নামদ্বয় উল্লেখ করা। আল্লাহ্, তাদের স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারে বারাকাহ দান করুক এবং ইসলামের খেদমতকারী হিসেবে কবুল করে নিন।

সবশেষে, প্রত্যেক পাঠকের প্রতি দু'আর দরখাস্ত রইল "আল্লাহ্ যেন আমাদের এই কাজকে দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন"। এছাড়া গঠনমূলক যেকোন সমালোচনা ও আলোচনার জন্য আমাদের মেইল করুন (darulihda@gmail.com)। বইয়ের কোন তথ্যবিভ্রাট, বানান প্রমাদ চোখে পড়লেও আমাদেরকে মেইল করতে পারেন, ইন শা আল্লাহ্ আমরা সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রকাশক

দারুল ইহদা

২৯ জুমাদা আল আউয়াল, ১৪৪১ হিজরি

শারঈ সম্পাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

إنالحمدلله،نحمدهونستعينهونستغفره،ونعوذباللهمنشرورأنفسناوسيئاتأعمالنا،مني
هدهاللهفلامضلله،ومنيضللفلاهاديله،وأشهدأنلاإلهإلااللهوحدهلاشريكله،و
أشهدأنمحمداًعبدهورسوله،صلىاللهعليهوعلىآلهوأصحابهومنتبعهمبإحسانإلىيومال
دينوسلمتسليماًكثيراً.أمابعد:

আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত এক হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ “যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখাযায়নি।” [সুনানে ইবন মাজাহ, হাঃ ৪০১৯]

বর্তমান যুগে অশ্লীলতা ব্যপক ছড়িয়ে গেছে, অধিকাংশ মানুষের কাছে যেনো অশ্লীলতা বৈধ আর শালীনতা পাপ! অশ্লীলতা নিজেই এক বিধ্বংসী বিষয়, তার উপর সমাজে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পরলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আযাব নেমে আসে! উপরোক্ত হাদীসের বাস্তব চিত্র আমাদের এই যুগ, অশ্লীলতার ব্যপকতার পাশাপাশি নতুন নতুন ব্যাধিও প্রকাশ পাচ্ছে।

অশ্লীলতার একটি কালো অধ্যায়ের নাম ‘সমকামিতা’। বর্তমান যুগে ‘সমকামিতা’ দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে, যা পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক মূল্যবোধ ও মানব জাতির জন্য হুমকি স্বরূপ। ইসলামী শারী'আতে ‘সমকামিতা’র বিধান সুস্পষ্ট; সমকামিতায় লিপ্ত ব্যক্তি দ্বয়ের শারঈ শাস্তিও স্পষ্ট। আমাদের দেশে-সমাজে ‘সমকামিতা’ দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে, স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে মাদ্রাসা, বাদ পরছে না কোনো কিছুই!

‘অভিশপ্ত রঙধনু’ বইটি ‘সমকামিতা’র বিরুদ্ধে একটি উত্তম পদক্ষেপ। সমকামিতার শার'ঈ বিধান, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে সমকামিতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা থাকছে বইটিতে। শারী'আতের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয়ে যেনো বইটিতে উপস্থিত না থাকে আমি তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি; এটাই ছিল প্রকাশকের পক্ষ হতে আমার মূল দায়িত্ব। পাশাপাশি কিছু হাদীসের সূত্র ও সনদের মান উল্লেখ করেছি। এক্ষেত্রে আমার নীতি ছিলঃ যেসকল হাদীসের সনদের গ্রহণযোগ্যতার

বিষয়ে মুহাদ্দীসগনের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে, সেসকল হাদীস যদি বর্তমানের যুগের সাথে মিলে গিয়ে থাকে, তাহলে সেসকল মুহাদ্দীসগনের উপর নির্ভর করেছি যারা হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।

এই বইয়ের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দান করুক। আশাকরি, বইটির মাধ্যমে উম্মাহ উপকৃত হবে ইন শা আল্লাহ।

উস্তায মাইনুদ্দিন আহমাদ
ইসলামিক অনলাইন একাডেমী

মুখবন্ধ

সকল গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও চরিত্রহীন মানুষ সুন্দর কফিনে রাখা সেই শবদেহের মত, আজ হোক বা কাল যার থেকে দুর্গন্ধ ছড়াবেই। মানুষ কেবল বাহ্যিক অবস্থার দিকেই মনোযোগী হবে আর অভ্যন্তরীন অবস্থার দিকে ফিরে তাকাবে না, এ সুযোগে অভ্যন্তরীন ভ্রষ্টতা ডালপালা বিছাবে, বিষয়টি আসলেই আশ্চর্যজনক। চরিত্র গঠনের দিকটিকে অবহেলা করার কারণেই এমনটি হয়ে থাকে। মানুষ হিসেবে তার উচিত ছিলো নিজের দুর্বলতা আর কদর্যতাকে অপবারণ ও পরিহার করে চলা।

বর্তমান সমাজে প্রচলিত কিছু কদর্যতা ও ত্রুটি সমাজকে ঘুণের মত ধীরে ধীরে খেয়ে ফেলছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো লূতের (আলাইহিস সালাম) জাতি চর্চিত সমকামিতা। সংক্রামক ব্যধির মত দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছে সমকামিতা। যখন নদওয়াতুল মুসান্নিফীন, দিল্লী থেকে আমার 'নিযামে ইফফাত ও ইছমাত' বইটি প্রকাশিত হলো তখন অনেক বন্ধুবর সমকামিতা বিষয়ে পৃথক বই লেখার অনুরোধ করলেন। আমার সহজ-সরল গ্রাম থেকে শহরের উন্মাদনায় এসে যখন পড়লাম তখন আমি নিজেও এমন বই লেখার প্রয়োজন অনুভব করেছি।

পাঁচ বছর আগেই আমার সর্বোচ্চ সামর্থ্য নিয়ে কাজটি শুরু করি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ যেন তা কবুল করে নেন। বইটি মাওলানা মুহাম্মাদ তায়্যিব (প্রধান, দারুল উলূম দেওবন্দ), মাওলানা আব্দুস সামাদ রহমানী (নায়েবে আমিরে শরীয়ত বিহার ও উড়িষ্যা) ও মাওলানা মিন্নাত উল্লাহ রহমানীর (আমিরে শরীয়ত বিহার ও উড়িষ্যা এবং খানকাহ রহমানী মুঙ্গীরের প্রধান) নিকট পেশ করি। (নিজস্ব ব্যস্ততা সত্ত্বেও) প্রত্যেকেই বইটি দেখেছেন এবং লেখককে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

মুহাম্মাদ জাফিরুদ্দীন
দারুল উলূম দেওবন্দ,
২৪শে রবিউল আওয়াল, ১৩৮০ হিজরী

পাঠ ১।। কিছু বুঝে নিব

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। মানুষ স্বভাবগতভাবেই অধৈর্য ও ত্বরাপ্রবণ। প্রয়োজনীয় পরিমান স্থৈর্য মানুষের মাঝে নেই। আর তাই শয়তান তার পরিকল্পনায় সফল হয়, মানুষ তার স্বভাবের বিপরীতে যেয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌছায়।

মানবীয় স্বভাবঃ

মানুষের স্বভাবে ভালোবাসা ও আকর্ষণ নামক বস্তু আছে, তা সত্য। হালের সার্বক্ষণিক যৌনতা পরিপৃক্ত এ সমাজে এহেন ভালোবাসা ও আকর্ষণ যৌন চাহিদার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তবে মানুষকে সবসময় মনে রাখা চাই যে, তার মর্যাদাপূর্ণ ও সুউচ্চ একটি অবস্থান আছে। তার বিবেক বুদ্ধি আছে। আর তাই মানুষকে তার সম্মান ও মর্যাদার বিপরীত যৌন চাহিদা কর্তৃক তাড়িত হওয়া মোটেই উচিত নয়।

ইসলামি জীবনব্যবস্থাঃ

ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও আল্লাহর মনোনীত দ্বীন, পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মানুষের জীবনের কোনো অংশই ইসলামের আওতামুক্ত নয়। তাই প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ, যারা ইসলামে বিশ্বাস করেন, তাদের উচিত ইসলাম নিয়ে অধ্যয়ন করা ও একে মেনে চলা।

মানুষের দায়িত্বঃ

যদি কোনো মুসলিম ইসলামী বিশ্বাসের বিপরীত কিছু করে এবং নিজের প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে তবে তা তার ঈমানের অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল। সে অবশ্যই যৌন চাহিদা চরিতার্থ করবে, তবে তা হবে ইসলাম নির্দেশিত পন্থায়। ভালো-মন্দের প্রভেদটুকু ভুলে গিয়ে যৌনতুষ্টির জন্য যখন ইচ্ছা ও যেখানে ইচ্ছা যা খুশি তা-ই করা মোটেও উচিত নয়।

পরিশুদ্ধ ও তাকওয়াঃ

'নিযামে ইফফাত ও ইসমাত' বইতে পরিশুদ্ধতা ও তাকওয়া বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের স্বভাবের ব্যাপারে ইসলামে তিনটি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। আমাদের এখানে বলতে হবে ইসলামে যেমন (স্ত্রী ব্যতীত) সকল নারীদের মাধ্যমে যৌন চাহিদা পূরণ করা বৈধ নয়, তেমনিই এর ইসলাম নির্দেশিত স্বভাবজাত পন্থা ব্যতীত অন্য কোনো উপায়েও তা পূরণ করা বৈধ নয়।

ইসলামি আইনঃ

ইসলামি আইনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, পুরুষ তার বৈধ স্ত্রীর মাধ্যমে ও নারী তার বৈধ স্বামীর মাধ্যমেই কেবল যৌন চাহিদা নিবারণ করতে পারে। আরো বর্ণিত হয়েছে যে, এক্ষেত্রে কেবলমাত্র নারীর সম্মুখ অংশই ব্যবহার করা যাবে, পেছনের অংশ এ কাজে ব্যবহার করা যাবে না, এটা প্রকৃতিসিদ্ধ নয়। নারীরা না তা পছন্দ করে আর না এর মাধ্যমে তারা যৌন তৃপ্তি পায়।

ইসলামি বিধানঃ

পুরুষ পুরুষের মাধ্যমে ও নারী নারীর মাধ্যমে অর্থাৎ সমলিঙ্গীয় দুজন দুজনার

মাধ্যমে তৃপ্তি লাভের অনুমতি কোনো প্রত্যাদিষ্ট ধর্মই[১] প্রদান করে না। আমরা এখন ধর্ম, চিকিৎসা ও মানবীয় সাধারণ যুক্তির মাধ্যমে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো, যাতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এ ব্যধির প্রসার ঠেকানো যায়।

---

[১] ইহুদী ধর্মঃ
"একজন পুরুষের অন্য পুরুষের সাথে স্ত্রীলোকের ন্যায় যৌন সম্পর্ক অবশ্যই থাকবে না। তা হলো ভয়ঙ্কর পাপ।" [লেবীয় পুস্তক, (লেভেটিকাস), ১৮ঃ২২]
"কোনো পুরুষের অন্য কোনো পুরুষের সাথে স্ত্রীলোকের মত যৌন সম্পর্ক থাকে তবে অবশ্যই যেন তাদের উভয়কেই মেরে ফেলা হয়।" [লেবীয় পুস্তক, (লেভেটিকাস), ২০ঃ১৩]
খ্রিস্টধর্মঃ
"ঠিক একইভাবে পুরুষরাও স্ত্রীদের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে অপর পুরুষের জন্য লালায়িত হয়ে লজ্জাকর কাজ করেছে; আর এই পাপের শাস্তি তারা তাদের শরীরেই পেয়েছে।" (রোমীয় পুস্তক, ১ঃ২৭)
হিন্দুধর্মঃ
"যদি কোনো অবিবাহিত নারী আরেক অবিবাহিত নারীকে অপবিত্র করে তবে দু'শ টাকা জরিমানা অবশ্যই করা হবে, তাকে বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বিগুণ পরিশোধ করতে হবে এবং দশটি বেত্রাঘাত করা হবে।" (মনুস্মৃতি, ৮ঃ৩৬৯)
"কিন্তু যদি কোনো মহিলা অবিবাহিত মেয়েকে অপবিত্র করে তবে তৎক্ষণাৎ তার মাথা ন্যাড়া করে দিতে হবে, অথবা তার দু অঙ্গুলী কর্তন করে দিতে হবে এবং তাকে (শহরভর) গাধার পিঠে করে চড়ানো হবে।" (মনুস্মৃতি, ৮ঃ৩৭০)
পুরুষের সাথে পুরুষের যৌন মিলনের শাস্তি শুদ্ধিকরণের স্নান করাতে হবে ও কাপড় পরিধান করাতে হবে (পবিত্রকরণের জন্য)। (মনুস্মৃতি, ১১ঃ১৭৫)
তবে এগুলো হিন্দুধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মতাত্ত্বিক অবস্থান নয়। হিন্দুধর্মের পুরাকথায় অনেক জায়গায়ই পুরুষ ও নারী সমকামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিষ্ণুরুপী মোহিনীর সাথে শিবের সহবাস, হনুমানের লঙ্কা ভ্রমণের সময় সেখানকার নারীলোকদের একে অপরের সাথে আলিঙ্গণ করতে দেখা, শিখন্ডির নারী হওয়া সত্ত্বেও তার বাবার আরেক নারীর সাথে বিবাহ দেওয়া, স্নানের পরে অর্জুনের নারীরুপ অর্জুনীর কৃষ্ণের সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া, ইন্দ্র ও বরুণের সম্পর্ক, অগ্নির মাঝে শিবের শুক্র গ্রহণে কার্তিকেয়র জন্মসহ বিভিন্ন ঘটনাতেই সমকামের ইঙ্গিত, উল্লেখ ও বর্ণনা পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মের দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক মূল অবস্থান হলো যৌনতা-বিয়ে এগুলো পার্থিব বিষয়, স্রষ্টার এগুলো দিয়ে কোনো কাজ নেই, এগুলোর সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক নেই। স্রষ্টার সাথে মিলিত হওয়া, মোক্ষলাভ, নির্বানপ্রাপ্তির সাথে এ সকল পার্থিব কাজের কোনোই সম্পর্কে নেই। এগুলোর কোনটিই মূল উদ্দেশ্যে পার্থিব চাহিদার বিনাশ করে পুনর্জন্মের চক্রলোপের মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে মিলিত হওয়া ও চূড়ান্ত মুক্তিলাভ করার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। সমকামী, উভকামী, বহুগামী প্রত্যেকেই যার যার যৌন অবস্থানের ক্ষেত্রে স্বাধীন, ধর্মে এগুলোর কোনো বাধা নিষেধ নেই। সামাজিক কারণে কোনো কোনো সময় বাধা নিষেধ থাকতে পারে। আর উপরোল্লেখিত উদ্ধৃতিসমূহ মূলত আইনগ্রন্থ মনুস্মৃতির, কোনো ধর্মতাত্ত্বিক গ্রন্থের নয়। [অনুবাদক]

পাঠ ২।। ইতিহাসের পাতায়

সমকামিতার ইতিহাসঃ

একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষকে যৌন সন্তুষ্টির জন্য বেছে নেবে ও তার দেওয়ানা হয়ে যাবে বিষয়টি আসলেই আশ্চর্যজনক ও হতবাক করে দেওয়ার মত। তা কেবল যৌন বিকৃতিই নয়, শয়তানী কর্মও বটে। এর আছে দীর্ঘ ইতিহাস, যা একই সাথে অদ্ভুত ও ভয়ানক। কুরআন থেকে বোঝা যায় লূতের (আলাইহিস সালাম) জাতির থেকেই এর উৎপত্তি। তাদের আগে কেউই এ কাজ করেনি। লূতের (আলাইহিস সালাম) বর্ণনা কুরআনে এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে,

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (٨١)

"তোমরা এমন অশ্লীল ও কু-কর্ম করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে আর কেউই করেনি। তোমরা স্ত্রীলোককে বাদ দিয়ে পুরুষের দ্বারা নিজের যৌন ইচ্ছা নিবারণ করে নিচ্ছ। প্রকৃতপক্ষে তোমরা হচ্ছ সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।" (সূরা আ'রাফ, ৮০-৮১)

সমকামিতার অভিশাপের উদ্ভবঃ

কুরআনের অনেক আয়াতের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়ে যে, লূতের জাতির পুরুষদের মাঝেই প্রথমবারের মত সমকামিতা দেখা যায়। সেসকল অভিশপ্তরাই এ অভিশাপময় কাজের সূচনাকারী। তাদের মাঝে আরো অনেক খারাবী ছিলো, তবে এটাই ছিলো সর্বনিকৃষ্ট গুণ। প্রত্যেকেই এ কু-কর্মের প্রতি লালায়িত ছিলো। তারা স্বভাবসম্মত পন্থাকে ত্যাগ করে কোনো প্রকার শালীনতার বালাই না করেই প্রকাশ্যে এ ঘৃণ্য কাজ করে বেড়াত।

প্রাথমিক অবস্থা ও এর ফলাফলঃ

তাফসীরকারকরা লিখেছেন প্রথমদিকে অন্য শহর থেকে আগত পুরুষদের সাথেই এমন কাজের উৎপত্তি ঘটে। ব্যধি ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে তারা নিজেদের মাঝেই এর চর্চা শুরু করে দিলো। প্রকৃতিবিরুদ্ধ এ কাজে তারা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো যে, এর বিরুদ্ধে একটি কথাও তারা শুনতে পারত না, উল্টো তাদের কল্যাণকামীদেরকে তারা তিরস্কার করত। যখন লূত (আলাইহিস সালাম) তাঁর জাতির এ সীমালঙ্ঘন,

কুকর্মের ব্যাপারে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন তারা লূতকে (আলাইহিস সালাম) চলে যেতে বলে, কেননা তাঁর মত এত পবিত্র ব্যক্তির এখানে থাকার কোনো দরকার নেই। কুরআনের ভাষায় তাদের জবাব ছিলোঃ

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّآ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

"তাঁর জাতির লোকদের এটা ছাড়া আর কোনো জবাবই ছিলো না যে, এদের তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, এরা নিজেদেরকে বড় পবিত্র রাখতে চায়।" (সূরা আ'রাফ, ৭:৮২)

সামগ্রিক সম্পৃক্ততা ও নবীর (আলাইহিস সালাম) উপর অহংকার প্রদর্শনঃ

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী লিখেছেন,

"তাঁর জাতি তাঁর বক্তব্যের বিপরীতে কোনো যৌক্তিক জবাব দিতে না পেরে শেষমেষ বেয়াদবি করে বলে, 'লূত আর বিশ্বাসী সঙ্গীদের তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, কেননা এরা খুব পবিত্র সাজতে চায় আর আমাদেরকে নোংরা বলে, তো আমরা যখন এতই নোংরা তখন এত পবিত্ররা আমাদের সাথে থেকে কি করবে?' এমনটা তারা অবজ্ঞবশত বলেছিলো।"

লূতীদের শয়তানী আচরণঃ

যখন তারা নবীর সদুপদেশ না মেনে নিজেদের নোংরা খারাপ কাজে সীমালঙ্ঘন করে ফেলে, তখন তারা নবীকে ব্যঙ্গ করতে শুরু করে। তখন আল্লাহর ক্রোধ তাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেলো। ফেরেশতারা সুদর্শন যুবকের রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন। তখন সেসব বদকার লোকেদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিলো, কীভাবে তারা যুবকরূপী ফেরেশতাদের সাথে আচরণ করেছিলো, তার স্বাক্ষী লূত (আলাইহিস সালাম), আল্লাহ্ বলেন,

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (٧٧) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (٧٨)

"আর যখন আমার ঐ ফেরেশতারা লূতের নিকট উপস্থিত হলো তখন সে তাদের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লো এবং সেই কারণে অন্তর সংকুচিত হলো, আর বললো, 'আজকের দিনটি অতি কঠিন। আর তার জাতি তার কাছে ছুটে এলো, এবং তারা পূর্ব হতে কু-কর্ম করেই আসছিলো। লূত বললোঃ হে আমার জাতি! আমার ঘরে আমার এই কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে

আমার মেহমানদের সামনে অপমানিত করো না; তোমাদের মাঝে কি সুবোধসম্পন্ন লোক কেউ নেই?" (সূরা হুদ, ১১:৭৭-৭৮)

লূতের (আলাইহিস সালাম) দুঃখঃ

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

"ইব্রাহীমের পরে ফেরেশতারা যখন লূতের (আলাইহিস সালাম) কাছে এলেন তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। যেহেতু ফেরেশতারা সুদর্শন যুবকের চেহারা নিয়ে এসেছিলেন, তাই লূত (আলাইহিস সালাম) তাঁদেরকে মানুষ ভেবে নিয়ে স্বীয় জাতির অপকর্মের কথা মনে করে দুঃখবোধ করলেন, তিনি হতাশ হয়ে দুঃখের সুরে বললেন, 'আজকের দিন অতীব কঠিন। আমি একা। আর এ যুবকরা অত্যন্ত সুদর্শন। আর আমার জাতিরা যুবকদের পিছেই পড়ে আছে। সামনে কি হয় তা আমাদের দেখতে হবে। (যুবকদের আগমণের) সংবাদ যখন জাতির নিকট পৌছালো তারা লুতের কাছে ছুটে এলো। তারা পূর্ব থেকেই অপকর্মের সাথে জড়িত ছিলো, সেই একই মনোবাঞ্ছা নিয়েই তারা এখানে এসেছে। লূত (আলাইহিস সালাম) তাদের প্রশমিত করার জন্য বললেন, 'আমার কন্যা ও বোনেরা তোমাদের ঘরে তোমাদেরই সাথে বসবাস করে, তারাই তোমাদের যৌনতুষ্টির জন্য যথেষ্ট।' এ যুবকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, আমাকে অতিথিদের সামনে অমর্যাদা করো না। তাদের সাথে যেকোনো প্রকার অশালীন কথা বা কাজ আমার মর্যাদাহানি করবে। তারা অতিথি, যদি তাদের কথা না ভাবো, কমপক্ষে আমার কথা ভাবো, আমি তোমাদের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে বাস করছি। আশ্চর্যজনক কথা! তোমাদের মাঝে এতটুকু শালীনতা আর সভ্যতা রাখার মত কেউ নেই, যে আমার কথা বুঝবে আর অন্যদের বোঝাবে?"

উপদেশ ও এর প্রতিক্রিয়াঃ

কুরআনে আঁকা লূতের (আলাইহিস সালাম) অন্তর্জ্বালার সেই হৃদয়ঘন দৃশ্যের কথা মনে করুন। আল্লাহর নবী তাঁর অতিথিদের সম্মান রক্ষার্থে তাঁরই জাতির সাথে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। তিনি তাদের প্রশমিত করার সকল চেষ্টা করে যাচ্ছেন। অতিথিদের সম্মান, তাঁর নিজের সম্মান বোঝানোর চেষ্টা করছেন। তবে এরা উপদেশ শোনার উপযোগী জাতি ছিলো না। কেউ কথা না শোনার কারণে লূত (আলাইহিস সালাম) ব্যথিত হলেন। সেই দুষ্কর্মা জাতি সমস্বরে বলে উঠলো,

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

"তারা বললোঃ তুমি তো অবগত আছ যে, তোমার এই কন্যাগুলোর কোনো প্রয়োজনই আমাদের নেই, আমাদের ইচ্ছা কি তাও তোমার জানা আছে।" (সূরা হুদ, ১১:৭৯)

সীমাছাড়া নির্লজ্জতাঃ

সমকামিতার শত শত অপকারিতার একটি হলো সমকামী মাত্রাতিরিক্ত লজ্জাহীন হয়ে থাকে। যারা পুরুষের মাধ্যমে নিজের যৌন চাহিদা পূরণ করে তারা এ পৃথিবীর বুকে সবচাইতে অভিশপ্ত ও লজ্জাহীন। সুযোগ পেলেই তারা উত্যক্ত করে। কখনো কখনো তারা শক্তিও ব্যবহার করতে পারে। আর ইতিহাস বলে তারা কোনো সুযোগই বৃথা যেতে দেয় না।

লূতের (আলাইহিস সালাম) বেদনাঃ

তাঁর জাতির নিকট থেকে জবাব শোনার পর লূত (আলাইহিস সালাম) অস্থির হয়ে পড়লেন এবং বললেন,

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ

"হায়! যদি আমার এতটা শক্তি থাকত যা দিয়ে আমি তোমাদের সোজা করে দিতে পারতাম অথবা কোনো শক্তিশালী আশ্রয় থাকত সেখানে আমি আশ্রয় নিতে পারতাম।" (সূরা হুদ, ১১:৮০)

ফেরেশতাদের প্রতিক্রিয়াঃ

قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

"তাঁরা বললেন, হে লূত! আমরা আপনার রবের প্রেরিত ফেরেশতা। এরা আপনার নিকট পৌঁছাতে পারবে না। আপনি কিছুটা রাত থাকতে আপনার পরিবার-পরিজন নিয়ে বের হয়ে যান, আর সাবধান! আপনাদের কেউ যেন পেছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু আপনার স্ত্রী যাবে না, তার উপরও ঐ আপদ আসবে যা অন্যান্যদের প্রতি আসবে, তাদের (শাস্তির) অঙ্গীকারকৃত সময় হচ্ছে সকালবেলা, আর সকাল কি নিকটবর্তী নয়?" (সূরা হুদ, ১১:৮১)

আল্লাহর আযাবঃ

লূত (আলাইহিস সালাম) যখনই ফেরেশতাদের কথা শুনলেন ঠিক তখন রাতের মধ্যেই বের হয়ে পড়লেন, আর দিনের আলো ফুটলেই আল্লাহর আযাব তাদের গ্রাস করলো। আল্লাহু আকবার! তিনি এমন শাস্তি দিলেন যে পুরো মানবজাতির ইতিহাসে তা নিদর্শন হয়ে রইলো। ভূমিকে তাদের উপর উল্টিয়ে দেওয়া হয়, তাদের উপর

পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়, এভাবেই গোটা জাতি ধ্বংস হয়ে গেলো। যেমনটা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ

"অতঃপর যখন আমার নির্দেশ পৌঁছালো, আমি ঐ ভূ-খন্ডের উপরি-ভাগকে নীচে করে দিলাম এবং ওর উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা একাধারে ছিলো (বর্ষিত হচ্ছিলো)।" (সূরা হূদ, ১১ঃ৮২)

উপদেশ ও সতর্কতাঃ

যেহেতু তারা নিজেদের স্বভাব-প্রকৃতির সম্পূর্ণ উল্টো কাজ করছিলো তাই আল্লাহও ভূমিকে তাদের উপর উল্টো করে দিলেন, সাথে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণও করেছেন। আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ আযাবের বর্ণনা দিয়েছেন, সকল স্থানেই তিরস্কারের ভঙ্গিতে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তিই প্রমাণ করে যে, ইসলামে এ কাজটি অত্যন্ত অনাকাঙ্খিত, সাথে সাথে এর মাধ্যমে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মাতকে এ কাজের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

লূত (আলাইহিস সালাম)

লূত (আলাইহিস সালাম) ইব্রাহীমের (আলাইহিস সালাম) ভাই হারুনের পুত্র ছিলেন। ফিলিস্তিন লাগোয়া ট্রান্সজর্দান এলাকায় সাদূম, আমূদ ও আরো কিছু লোকালয় ছিলো। অঞ্চলটি ছিলো অতীব উর্বর। এ অঞ্চলেই তিনি দাওয়াতী কাজ করতেন। তিনি সাদূম শহরেই বসবাস করতেন। সাধারণত মৃত সাগরের উপকূলকেই এ শহরের অবস্থান বলা হয়েছে। এখানকার ভূমিকেই উল্টে দেওয়া হয়েছিলো।

প্রথম সমকামিতা শিক্ষাদানকারীঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে লূতের (আলাইহিস সালাম) জাতি শহরে আগমণকারী অন্য শহরের লোকদের সাথে প্রথম এ অপকর্ম শুরু করে। ধীরে ধীরে তাদের নিজেদের মধ্যেই এ রোগ বাসা বাঁধে। ইবনু আসাকির সূত্রে ইমাম শাওকানী একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন যে, শয়তানই মানুষের বেশে এসে সেই জাতিকে এই অপকর্ম শিক্ষাদান করে। তা না হলে এর পূর্বে এমনটা কেউ ভাবতেও পারে নি। সমকামিতার মত ঘৃণ্য কাজ একমাত্র শয়তান থেকেই আসতে পারে, এটা যুক্তিযুক্তও বটে। আল্লামা শাওকানী লিখেছেন,

ইবনু আসাকির বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহু আনহু) বলেনঃ "শয়তান একবার এসব লোকদের (লূতের জাতি) কাছে অত্যন্ত সুদর্শন

বালকের বেশে এসে তার সাথে অপকর্মের আহ্বান জানায়। মানুষজন এ অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে এবং একসময় স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে এ ঘৃণ্য কর্মকে গ্রহণ করে নেয়। এভাবেই এ দুষ্কর্মের সূচনা হয়।"

এর অর্থ শয়তানই লূতের জাতির মাঝে সমকামিতার সূচনা ঘটায়। সুদর্শন বালকের বেশে এসে সে এ কাজের দিকে প্রলুব্ধ করে, এভাবেই এর প্রারম্ভ হয়। যদিও এ অভিশাপের শুরু বালক দিয়েই হয়, তবে সমকামিতায় আসক্ত হয়ে পড়লে ব্যক্তি বয়সের প্রভেদ হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া উপরে বর্ণিত আয়াতে আর-রিজাল (الرجال) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, এর অর্থ যেকোনো বয়সের পুরুষ। আলিমদেরও একই মত। এ সংক্রামক ব্যধি যখন তাদের মাঝে বিস্তার লাভ করলো তারা নিজেদের মধ্যেও এর চর্চা শুরু করে দিলো। অত্যন্ত লজ্জাহীন পন্থায় কাজটি করা হত, যার উদাহরণ মানুষের ইতিহাসে আর নেই। কখনো কখনো তারা একইসাথে একাধিক জনের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হত। হাফিজ ইবনু কাছির (রাহ) লিখেছেন,

"অনেক সময় তারা প্রকাশ্যেই এ কাজ করে বেড়াত। তারা কোনো প্রকার লজ্জা-শরম অনুভবই করত না।"

লূতের (আলাইহিস সালাম) জাতির নারীরাঃ

আলিমরা উল্লেখ করেছেন যে, পুরুষদের মত লূতের (আলাইহিস সালাম) জাতির নারীরাও সমকামিতায় লিপ্ত ছিলো। তাদের জাতির পুরুষের মত তারাও নারীরাও সমলিঙ্গীয় কারো মাধ্যমেই যৌন চাহিদা পরিতৃপ্ত করত। এ অবস্থায় মহিলাদের আর করণীয়ই বা ছিলো কি! এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, সমকামিতায় আসক্ত পুরুষ চায় তার স্ত্রীও তার মত অস্বাভাবিক উপায়ে যৌনকামনা চরিতার্থ করুক। সে স্বাভাবিক পন্থায় কোনো সুখ পায় না। মহিলারা স্বীয় প্রকৃতির কারণে একে গ্রহণ করতে পারে না।

লূতের (আলাইহিস সালাম) পরবর্তী অবস্থাঃ

সমকামিতার শুরুটা এখান থেকে হলেও এর সমাপ্তি লূত (আলাইহিস সালাম) পরবর্তী সময়ে, ইতিহাসের এ পর্যায়েই শেষ হয়ে যায় নি। আলিমদের থেকে জানা যায় যে, সমকামিতা ঈসার (আলাইহিস সালাম) আবির্ভাবের পূর্বেও চর্চিত হত। গ্রীক, রোমানদের মধ্যে সমকামিতার বিকৃতি বহুল প্রচলিত ছিলো। তারা এ বিকৃতির দিক থেকে শীর্ষে অবস্থান করছিলো। সক্রেটিস, এরিস্টটল, আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সিজারের[২] মত প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সমকামীদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

---

[২] সক্রেটিসের দুজন বিখ্যাত ছাত্র প্লেটো ও জেনোফোন উভয়ের মতেই তাদের শিক্ষক ছিলো বালকপ্রেমী। আলেকজান্ডারের সাথে বাগোয়াস ও হেপায়েশনের সাথে সম্পর্কের কথা জানা যায়। জুলিয়াস সিজারের সাথে বেথিনিয়ার রাজা চতুর্থ নিকোমেডাসের সম্পর্কের কথা পাওয়া যায়। [অনুবাদক]

ফ্রান্স ও জার্মানীতে সমকামিতাঃ

বর্ণিত আছে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে সমকামিতা বহুল প্রচলিত হয়ে গিয়েছিলো, এমনকি এর বিস্তৃতির মাত্রা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে, সরকারকে এর বিরুদ্ধে আইন প্রনয়ণ করতে হয়েছিলো। ১২১২ সালের দিকে এ আইন প্রয়োগ করা শুরু হয়। আইনে সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদন্ড নির্ধারণ করা হয়। তবুও এ অভিশপ্ত অপকর্ম চলতেই থাকে। বলা হয়ে থাকে চতুর্দশ ও অষ্টাদশ শতকে বালকদের সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত হওয়া ও যৌন চাহিদা পরিতৃপ্ত করা ছিলো বহুল প্রচলিত। কম-বেশী একই অবস্থা বিরাজমান ছিলো জার্মানীতেও।

জার্মান পার্লামেন্টের নির্লজ্জাতার পক্ষে আইন পাশঃ

জার্মানীতে নাজি শাসনক্ষমতা আসার পূর্বে একটি দল এ জঘন্য কাজকে জোরেসোরে প্রচার-প্রসার করতে থাকে, এর মাধ্যমে জার্মানীতে এ কাজের প্রসার উপলব্ধি করা যায়। এর মূখ্য ছিলো World Association for Sex Reforms এর প্রধান ড. ম্যাগাস হার্সেফেল্ড। পুরুষে পুরুষে যৌন চাহিদা নিবারণের বৈধতার পক্ষে তারা টানা ছয়টি বছর দাবী করে গেছে। শেষমেষ forum of democracy এ অবৈধ কাজের বৈধতা দিয়ে দিলো। জার্মান সংসদ সংখ্যালঘুদের মতের উপর ভিত্তি করে এ মত দিলো, শর্ত ছিলো উভয়ের সম্মতি ও ক্ষেত্রবিশেষে অভিভাবকের সম্মতি।

পশ্চিমা দেশসমূহের অবস্থাঃ

পশ্চিমা দেশসমূহে এ অভিশপ্ত কাজের প্রচার-প্রসার ধূমধামের সাথেই চলছিলো। ১৯৪৮ সালে কিনসে ও তার সঙ্গীগণ কর্তৃক তৈরীকৃত রিপোর্টে ১২০০০ পুরুষের উপর চালানো পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিলো, যেখান থেকে জানতে পারা যায় পরীক্ষিত অ্যামেরিকান পুরুষদের এক-তৃতীয়াংশই জীবনে একবার হলেও সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছে। ৪% অ্যামেরিকান পুরুষই নারীদের চিন্তা ব্যতিরেকেই আজীবন পুরুষের প্রতি আসক্ত ছিলো। রিপোর্টে আরো উঠে এসেছে ৭৭% স্কুলের ছেলেরা সমকামিতাকে পছন্দ করে। (ইসলাম এন্ড সেক্স, পৃ-৮৪)

প্রাচ্যের দেশসমূহের অবস্থাঃ

প্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে এক্ষেত্রে ইরান সবচেয়ে ভয়ানক অবস্থায় আছে। এটা তাদের কাব্যচর্চা থেকে আগত। ইরান থেকেই ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে সমকামিতা ছড়িয়েছে। পারস্যের কাব্য এ তিনটি দেশকেই প্রভাবিত করেছে। এমন একটি সময় ছিলো যখন আফগানিস্তান থেকে আগত কাফেলায় করে পুরুষ পতিতা

নিয়ে আসা হত। ১৯৪৫ সালে প্রায় তিনটির মত এমন পতিতালয় পাওয়া গেছে যেখানে নপুংশকরা যৌন কর্মের জন্য নিজেদের শরীর বিক্রি করত। কিছু কিছু ভারতীয় শহর এহেন ঘৃণ্য কর্মের জন্য নামকরা হলেও প্রকাশ্যে এর চর্চা সেখানে হত না। সাধারণ ও শিক্ষিতদের মাঝে গোপনে এর প্রচলন আছে। ধরা হয় বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষই নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে এর সাথে জড়িত। হাই স্কুল থেকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়, সবখানেই এ অভিশাপের ছড়াছড়ি। দিনকে দিন তা বেড়েই চলছে। এটি একই সাথে ঘৃণ্যার্হ ও ভয়াবহ যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এহেন বিকৃতির করালগ্রাসে পড়ছে। প্রতিষ্ঠান কিংবা ভাষা ভেদে দিনকে দিন এ দুষ্কর্ম বেড়েই চলেছে।[৩] হোক হাইস্কুল, হোক বা কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়; হোক সংস্কৃত কিংবা আরবি স্কুল, সবখানেই এক অবস্থা। তবে এতটুকু বলা যায় গ্রামের নিরক্ষর মানুষদের মধ্যে ব্যাপকহারে এ বিস্তৃতি এখনো ঘটেনি।

মুসলিমদের মাঝে সমকামিতার সূচনাঃ

শিয়াদের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে এ ব্যধি প্রবেশ করেছে। ইরান শিয়া অধ্যুষিত দেশ। আর শিয়াদের মাঝে একটি উপদল স্ত্রীর সাথে পায়ুপথে মেলামেশা বৈধ মনে করে। এখানেই এর শুরু। প্রথমে স্ত্রীর সাথে এবং বিকৃতি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তা পুরুষে যেয়ে পৌছায়। আসক্ত হয়ে পড়লে সে পুরুষের সাথেই যৌনতৃপ্তি পায়। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা নিজেদের মাঝে এর চর্চা শুরু করে। আল্লাহ্ যেন তাদের কাজের যথাযথ প্রতিদান দেন যারা কাব্যের মাধ্যমে আগুনে ঘি ঢালার কাজ করেছে। এ বিষয়ে আমার "নিযামে ইফফাত ও ইছমাত" গ্রন্থে আমি আলোচনা করেছি যে, সমকামিতাকে বৈধ প্রমাণ করা বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনার শামিল। এভাবে তারা ইসলামের নাম খারাপ করছে। শিয়াদের এ উপদলের মন্দ আকীদার (বিশ্বাস) কারণে সুন্নীদের কাছে তারা মুসলিম বলে গণ্য হয় না।[৪]

---

[৩] মাওলানা মওদূদী তাঁর 'সফর আরদ্বুল কুরআন' গ্রন্থে এ বিষয়ে আশ্চর্যজনক উক্তি করেছেন। "এ অভিশপ্ত কর্মের সাথে বাহরাইনের যে কথা বর্ণিত হয়েছে তা আমি বর্ণনা করতেও লজ্জা পাচ্ছি। সামগ্রিকভাবে সমাজের দিক থেকে বলতে গেলে মুসলিম বিশ্বে বাহরাইন-ই একমাত্র দেশ যেখানে নারী পতিতার মত বালকদের পতিতাবৃত্তি করার আনুষ্ঠানিক লাইসেন্স ইস্যু করা আছে। কয়েক বছর আগে আমার কিছু ফিলিস্তিনী বন্ধু আমাকে এ বিষয়ে জানায়। কিন্তু এখন বাহরাইনের কিছু অধিবাসীই আমাকে এ ব্যাপারে জানিয়েছে।" (তুলুয়ে ইসলাম এর বরাতে তারজুমানুল কুরআন ১৯৬০, পৃ-৫৫)

[৪] সুন্নী দ্বারা এখানে আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ্ উদ্দেশ্য। সাহাবী-তাবিয়ীগনের যুগ থেকেই ইসলামের নামে বিভিন্ন বিভ্রান্ত ফিরকা বা দলের উৎপত্তি শুরু হয়, তাদের মধ্যে শিয়ারা অন্যতম। তখন মুসলিমগন বিভ্রান্তদের থেকে নিজেদের পৃথক করতে আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ এর ব্যবহার শুরু করেন। শিয়ারা সাধারণত কাফির, কেননা ইসলামের অগনিত মৌলিক আক্বীদাহ (বিশ্বাস) ও বিধানকে তারা অস্বীকার করে। শুধুমাত্র যাইদি শিয়াদের ব্যাপারে শিথিলতা রয়েছে। [শারঈ সম্পাদক]

সমকামিতা ও ইসলামে এর নিষিদ্ধতাঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম বাড়াবাড়ি মুক্ত দ্বীন। ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সর্বশেষ ধর্ম, যা পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ইসলাম সূচনা থেকেই মানবীয় কুপ্রবৃত্তি সৃষ্ট সকল বিকৃতি ও অকল্যাণকে সংশোধন করেছে। আকীদা-বিশ্বাস, লেনদেন, মানবীয় আচার, আচরণ ও ব্যবহার সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম বিকৃতিকে সংশোধন করেছে। মানুষের অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক অনুভূতির দিকে ইসলামের রয়েছে পূর্ণমাত্রায় খেয়াল। ইসলাম না নিজের যৌনতা ও যৌন চাহিদার দাসত্ব স্বীকার করে যা খুশি তাই করে নিজেকে তুষ্ট করার জন্য বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দিয়েছে, আর না আত্মহত্যা কিংবা নবাগত বংশধরদের মারার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করার মত সীমাবদ্ধতা তৈরী করেছে।

মানবীয় অনুভুতির বিবেচনাঃ

আল্লাহ্ একইসাথে মানুষের যৌন চাহিদা এবং মানবীয় চরিত্র ও আচার-ব্যবহারের পরিশুদ্ধিতা উভয় দিকেই লক্ষ্য রেখেছেন। আর তাই আল্লাহ্ আদমকে (আলাইহিস সালাম) অনুভূতি, যৌন চাহিদা দিয়ে সৃষ্টি করার পরেও তাকে সেভাবেই ছেড়ে দেন নি, বরং তিনি তার জন্য তাঁরই পাঁজর থেকে হাওয়াকে (আলাইহিস সালাম) সৃষ্টি করেছেন। তারপরে সকল মানুষের স্বাধীনতা ছিলো সে নারীজাতি থেকে ইচ্ছামত কারো সাথে জীবন অতিবাহিত করার ও তার চাহিদা নিবারণ করার জন্য বেছে নিতে পারে। সে তার কাছ থেকে ধর্মীয় সীমার ভেতরে থেকে সবভাবেই আনন্দ পেতে পারে। সবার সাথে সম ইনসাফপূর্ণ আচরণের শর্তে ইসলাম তাকে একইসাথে চারজন স্ত্রী রাখারও সুযোগ দিয়েছে। স্ত্রীর মাসিকের সময়, রমযান মাসে সিয়াম রাখা অবস্থায় ও সন্তান হওয়ার পরে কিছুদিন ব্যতীত যেকোনো স্ত্রীর সাথে যেকোনো সময় মেলামেশা করার পূর্ণ সুযোগ ইসলাম তাকে দিয়েছে।

নিষিদ্ধ মেলামেশাঃ

তবে এদিকেও জোর দেওয়া হয়েছে যে, পুরুষ যাতে স্ত্রীর সেসকল অঙ্গ থেকেই যৌন তৃপ্তি হাসিল করে যা নারীর যৌন চাহিদাও পূরণ করে এবং সর্বাবস্থায় নোংরা অঙ্গ থেকে আনন্দ নেওয়া থেকে বিরত থাকে যা আদৌ যৌনতার সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এখন নিজেরাই ভাবুন ইসলাম যে কাজ নিজের স্ত্রীর সাথে করতেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে তা কীভাবে বালক ও পুরুষদের সাথে করা যেতে পারে? ইসলাম এর প্ররোচক, কামনা ও এর দিকে নিয়ে যেতে পারে এমন সকল কিছুর পথ বন্ধ করে দিয়েছে। ইসলাম এ বিষয়ে অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কার্যকরণের দিকেও লক্ষ রেখেছে।

লূতের জাতির শাস্তি ও তা থেকে গৃহীত শিক্ষাঃ

কুরআনের দশটি আয়াতে লূতের জাতির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনাভঙ্গি থেকে এর ঘৃণ্যার্হতা ফুটে উঠে। নৈতিক ও যৌক্তিকভাবে তাদের কর্মকান্ড ও পাশাপাশি তাদের উপর পতিত আল্লাহর শাস্তির কথার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ভাবার কথা হলো, কেন কুরআনে তাদের ব্যাপারে এত কঠিন শব্দ সম্বলিত বর্ণনা এসেছে? কেন লুত ও তার জাতির মধ্যকার কথাবার্তা তুলে ধরা হয়েছে? কেনইবা তাদের নির্লজ্জতা ও নৈতিক অধঃপতনের কথা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে?

সমকামিতার কুপ্রভাবঃ

সমকামিতার ভয়াবহতা ও ফলাফল তুলে ধরার অর্থ হলো সমকামীরা নৈতিকতার সর্বশেষ স্তরে পৌছে গেছে, তাদের হিম্মত টুটে গেছে, আত্মসম্মান নষ্ট হয়ে গেছে, চরিত্রের পবিত্রতা একেবারে গায়েব হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে লজ্জা, ধার্মিকতার লেশমাত্র নেই, তারা একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেছে।

আমাদের দায়িত্বঃ

এরুপ পরিস্থিতিতে কি আমাদের জন্য শিক্ষা নেই? আমাদের শিক্ষা হলো যারা উপদেশ শোনে, অপকর্ম থেকে দূরে থাকে, না নিজেরা দুষ্কর্মের ধারেকাছে যায় আর না অন্য কাউকে সেদিকে যেতে দেয়, তারাই হলো প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান। কাউকে এ বিষয়ে পথভ্রষ্ট হতে দেখলে তার উচিত পথভ্রষ্ট ব্যক্তিকে লূতের ঘটনাসমূহ বর্ণনা করা, এর সামগ্রিক কুফল, এর ফলে ঘটিত শারিরীক দুর্বলতা, অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরে সতর্ক করা। সমকামিতার ফলে পুরুষাঙ্গ কখনো কখনো অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। লজ্জাহীনতা ও নির্লজ্জতা তাদের উপর ভর করে, তারা অযোগ্য হয়ে পড়ে, আল্লাহর ক্রোধ তাদের ঘিরে ফেলে, তাদের স্ত্রীরাও ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ে, তারা নিজেরাই তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলে।

পাঠ ৩।। ইসলামি দর্পনে

সমকামিতার ইসলামি প্রতিরোধঃ

লূত (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর জাতির আলোচনায় কুরআনে বেশ কয়েকবার সমকামিতার উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলের (আলাইহিস সালাম) হাদীছে এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এসেছে। কুরআনে সমকামিতার মত নির্লজ্জতার অভিশাপকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে নির্দেশ এসেছে এভাবে,

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا

"আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কোনো দুইজন এ নির্লজ্জতার কাজ করবে, তাদের উভয়কেই শাস্তি প্রদান করো......" (সূরা নিসা, ৪:১৬)

কুরআনের আদেশঃ

কুরআনে এই একটি আয়াতেই কেবলমাত্র এ ধরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যখন একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষের মাধ্যমে নিজের যৌন চাহিদা পূর্ণ করবে তখন তাদের উভয়কেই শাস্তি দিতে হবে। এরপরে এ সম্পর্কে আর কোনো আয়াত নাযিল হয় নি, কেননা আরবদের অনেক খারাপ গুণ থাকলেও তারা সমকামিতার অভিশাপ থেকে মুক্ত ছিলো। তবে পরবর্তীতে দেখবো যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যাতে করে তাঁর উম্মাত এ ঘৃণ্য কাজে কোনোভাবেই জড়াতে না পারে, পৃথিবীর যে স্থানেই তারা বসবাস করুক না কেন।

মুফাসসিরদের মতামতঃ

কোনো কোনো মুফাসসিরের মত হচ্ছে এ আয়াত সমকামিতা বিষয়ক নয় বরং ব্যভিচার সম্পর্কিত। তবে এর প্রেক্ষাপট প্রমাণ করে যে আয়াতটি সমকামিতা সম্পর্কেই। আল্লাহর শোকর যে, গবেষণায় দেখা গেছে এরকমটা কেবলমাত্র আমারই নয় বরং পূর্বেকার কিছু আলিমদেরও মত।

শাহ ওয়ালিউল্লাহর মতামতঃ

ভারতের বিখ্যাত আলিম শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহি) লিখেছেন,

"অনুবাদকরা বলেন মুফাসিরগণ এই আয়াতের ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেন। কেউ কেউ

একে ব্যভিচারের সাথে সম্পর্কিত ভাবেন এবং একে মানসূখ বলে মনে করেন। তবে অধিকতর বিশুদ্ধ মত হলো আয়াতটি সমকামিতার সাথে সম্বন্ধিত। এর কারণ হলো ওয়াল্লাযীনা বিধেয় এবং 'মিনকুম' এর 'কুম' পুরুষবাচক সর্বনাম, আর নারীদের ব্যভিচার বিষয়ক আয়াত পূর্বেই গত হয়েছে।"

তাছাড়া ইমাম মালিক তাঁর মুওয়াত্তা কিতাবে একে সমকামিতার সাথে সম্পর্কিত বলেছেন। এটাই এর মূল কারণ।

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথীর মতামতঃ

"ওয়াল্লাযীনা ইয়া'তিনা' অর্থ যখন একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হয়, মুজাহিদ একে সমর্থন করেছেন, এরপরে আর কোনো সন্দেহ বাকী থাকে না।" (তাফসীরে মাযহারী, মাতবুআ ক্বাদীম, পৃ- ৫৪৯, খ-২)

আশা করি উপরোক্ত আয়াতটিকে সমকামিতা বিষয়ে মেনে নিতে আলিমগণের আর কোনো দ্বিধা থাকবে না।

সমকামিতা ও সরকারের দায়িত্বঃ

যেহেতু প্রমাণ হলো কুরআনের আদেশ রয়েছে সমকামিতার ব্যাপারে তবে এর একমাত্র অর্থ হলো ইসলামি সরকারের দায়িত্ব হলো এ ধরণের লোকদের শাস্তি দেওয়া। সকল মুমিনদের এ ধরণের ঘৃণ্য কাজ থেকে পরিপূর্ণ বিরত থাকা চাই। এটি প্রাথমিক আদেশ, তবে এ বিষয়ে আরো গবেষণার পরে দেখা যায় যে, নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ধরণের লোকদের হত্যা করতে আদেশ দিয়েছেন যাতে পৃথিবী তাদের অপবিত্র অস্তিত্ব থেকে মুক্তি পায়। যদিও ইমাম আবু হানিফার মত হলো সমকামীদের শাস্তি ইসলামি রাষ্ট্রের সরকার বা ইমামের উপর নির্ভর করে, তিনি ইচ্ছা করলে পুড়িয়ে, পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে, শিরশ্ছেদ করে কিংবা অন্য যেকোনো মাধ্যমে সমকামীদের শাস্তি দিতে পারেন।

"শরীয়তে (সমকামিতার) শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়নি বরং তা ইমামের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে যেমনটা ইমাম আবু হানিফা বলেছেন উভয়কেই উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।" (তাফসীরে মাযহারী, পৃ-৫৪৯, খ-২)

তবে ইমাম শাফিঈ ও হানাফিদের মাঝে ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফের মত হলো সমকামিতার শাস্তি ব্যভিচারের মতই।

নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামিতাঃ

আমরা এতক্ষণ সমকামিতার ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিকোণ আলোচনা করলাম, এ পর্যায়ে হাদীছের কিছু আলোচনা করাও প্রয়োজন। হাদীছে আমরা দেখতে পাই যে,

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বভাববিরুদ্ধ এ ঘৃণ্য কাজকে প্রতিরোধ করার জন্য সর্বোত্তম উপায় অবলম্বন করেছেন, যাতে করে উম্মাতের মাঝে এর অসভ্যতা ও অশ্লীলতা ছড়িয়ে না পড়ে, আর তারা যাতে আল্লাহর ক্রোধের মুখোমুখি না হয়।

নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশঙ্কাঃ

নবীজীর কথা বলার ধরণের দিকে গভীর মনোযোগ দিন,

> *"নিশ্চয়ই আমি আমার উম্মাতের জন্য যে জিনিসটির সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হলো লূতের (আলাইহিস সালাম) জাতির কর্ম।"* [৫] (জামেউল ফাওয়ায়েদ, পৃ-২৮৯ খ-২)

সমকামিতা এতটাই ঘৃণ্য যে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মাতের ব্যাপারে এর আশঙ্কা করেছেন পাছে তারা না এই ব্যধির শিকার হয়ে যায়। যা একইসাথে ভীতি জাগানিয়া ও ঘৃণ্য।

শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী এ হাদীছের ব্যাপারে লিখেছেন,

> *"সমকামিতা অত্যন্ত কদর্য ও একইসাথে চরম অশোভন একটি কাজ। তাই এর নিষিদ্ধতার বিষয়টিতে জোরারোপ করা হয়েছে। আমি ভীত হচ্ছি যে আমরা এতে লিপ্ত হয়ে না পড়ি আর আল্লাহর ক্রোধের সম্মুখীন হই।"*

সমকামিতার পথরোধঃ

ইসলাম সমকামিতার দিকে চিন্তা জাগরণকারী ও কর্মে উদ্বুদ্ধকারী প্রতিটি গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়, এমন প্রতিটি রাস্তাই ইসলাম রুদ্ধ করতে চায় যার মাধ্যমে এ ব্যধি আমাদের সংস্পর্ষে আসতে পারে।

সমকামিতা ও কুফরঃ

এটা তো সর্বজনবিদিত যে ব্যক্তি তার জীবনসঙ্গিনী হওয়ার দরুন তার স্ত্রীর সাথেই সবচাইতে বেশী ঘনিষ্ঠ, একইসাথে তার সঙ্গীও বটে। এটাও স্বাভাবিক যে স্বামী তার স্ত্রীর প্রতিটি অঙ্গের মাধ্যমেই যৌন আনন্দ লাভ করার চেষ্টা করতে পারে, শয়তানের কুমন্ত্রণায় সে সকল অঙ্গও স্পর্শ করতে পারে যা থেকে সাধারণভাবে এমনটা প্রত্যাশা করা হয়না। অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার ফলে স্বামী স্বভাববিরুদ্ধ উপায়ে যৌন চাহিদা চরিতার্থ করতে উদ্যত হতে পারে, যেমনঃ উত্তেজনার সময় স্ত্রী মাসিক অবস্থায় থাকলেও মেলামেশা করা। ইসলাম ঘনিষ্ঠ মেলামেশার সময়েও কিছু বাধানিষেধ আরোপ করে

---

[৫] সুনানে তিরমিযী, হাঃ ১৪৫৭ ; সুনানে ইবন মাজাহ, হাঃ ২৫৬৩ ; মুসনাদে আহমাদ, হাঃ ১৫০৯৩ ; ইমাম হাকিম, আল-মুসতাদরাক, হাঃ ৮০৫৭। ইমাম হাকিম, ইমাম যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, আর শাইখ আলবানী হাসান বলেছেন।

দিয়েছে যাতে মানুষ এসব ভুল কাজে অভ্যস্ত হয়ে পরবর্তীতে পুরুষের সাথে করতে না পারে কিংবা এর চিন্তাও না করতে পারে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি স্ত্রীর পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে মেলামেশা করবে সে কুফর করলো।" (তাবারানি বর্ণনা করেছেন)

সমকামিতা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষাকে অস্বীকার করার শামিলঃ

আমরা মনে করি না নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি বিশ্বাসী কেউ এমন কাজের প্রতি আগ্রহী হতে পারে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্য একস্থানে বলেছেন,

"যে ব্যক্তি স্ত্রীর মাসিকের সময়ে কিংবা পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে মেলামেশা করবে অথবা কোনো গণকের কাছে গমণ করবে সে মুহাম্মাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করলো।" (তিরমিযী, মিশকাত, পৃ-৫৬)

এর থেকে স্পষ্ট কথা আর কি হতে পারে? এরূপ সতর্কতা থাকার পরেও যে সমকামিতায় লিপ্ত হবে সে ইসলামের গণ্ডী পেরিয়ে কুফরের দরজায় পদার্পণ করবে এবং সে সর্বশেষ নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর অবতীর্ণ হুকুমকে অমান্য করবে। এটা আমাদের অনুমান নয় বরং আমাদের বিশ্বাস যে, যার উপর বিশুদ্ধ ঈমানের ছায়া আছে সে এ ধরণের শয়তানি কর্মকান্ড থেকে সতর্ক হয়ে যাবে।

স্ত্রীর সাথে মেলামেশায় নিষিদ্ধতাঃ

এ কারণে এ ধরনের স্বভাববিরুদ্ধ কর্মকান্ডকে কিছু শিয়া ব্যতীত কেউই অনুমোদন করে না। বরং সকল আলিমদের ঐক্যমতে এ ধরণের যৌন কর্ম নিষিদ্ধ। ইমাম নববী বলেন,

"সকল নির্ভরযোগ্য আলিমরা একমত হয়েছেন যে, স্ত্রীর পেছন অংশ দিয়ে মেলামেশা করা হারাম, এর (নিষিদ্ধতা) বিষয়ে বেশ কিছু মাশহুর হাদীছ বিদ্যমান আছে।"

বিবেকবান মানুষের কাছে এর নিষিদ্ধতার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বরং নিশ্চিতভাবেই একজন বিকৃত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই এ উপায়ে নিজের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। কিন্তু চিন্তা করুন এ উপায়ে নারীর যৌন চাহিদা কীভাবে পূরণ হবে?

সমকামিতাঃ

যখন স্ত্রীর সাথে এ ধরণের অপ্রাকৃতিক কাজ করাই কুফরের এলাকায় প্রবেশের

শামিল, সেখানে সেই দ্বীন কীভাবে সহ্য করতে পারে যে, একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষের দিকে কামনার সহিত দৃষ্টিপাত করবে? যেখানে এ কাজ স্ত্রীর সাথে ঐরূপ মেলামেশার চাইতেও ভয়াবহ ও গুরুতর। কেননা সাধারণ বিবেকের সিদ্ধান্ত হচ্ছে পুরুষদেরকে আরেক পুরুষের যৌন সঙ্গী হওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয় নি।

ফকিহদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামিতায় বিশ্বাসীদের অবস্থানঃ

সিরাজ আহমাদ যথার্থই বলেছেন,

"পুরুষের সাথে পুরুষের মেলামেশা নিশ্চিতভাবেই অতি ঘৃণিত কাজ এবং নিঃসন্দেহে এর গ্রহণযোগ্যতা সবচাইতে কদর্য কুফর।"

আল্লামা শামী এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেন,

"যে ব্যক্তি স্ত্রীর মাসিকের সময় কিংবা স্ত্রীর পেছন পথ দিয়ে সহবাস হালাল মনে করে তবে সে কাফির [৬], তেমনি কাফির সে ব্যক্তিও যে বালকের সাথে সমকামিতাকে হালাল মনে করে, তার কুফরের ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। আমি বলি ব্যভিচারের চাইতেও সমকামিতা মন্দ, যেমনটা কিতাবুল ইকরাহতে এসেছে। একে কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া এটি অযৌক্তিকও বটে, কেননা জান্নাতেও এমনটা করা যাবে না।" (রাদ্দুল মুহতার)

সমকামীদের উপর আল্লাহর ক্রোধঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"আল্লাহ আযযা ওয়াযাল সেই ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করেন না যে কোনো পুরুষ কিংবা মহিলার পেছন দিক থেকে সহবাস করে।" [7]

এ হাদীছে মহিলার পূর্বের পুরুষের উল্লেখ থাকার কারণ বর্ণনা করতে যেয়ে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী লিখেছেন,

"এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পুরুষের সাথে সমকামিতা অধিক মন্দ ও কদর্য, তাই একে আগে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও দুটিই হারাম।"

মোদ্দাকথা হলো, এ ধরণের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ পুরুষ কিংবা নারী উভয়ের সাথে করাই হারাম। আর নিষিদ্ধতা আরো বেশি যখন তা পুরুষের সাথে করা হবে। যখন নারীর সাথে এহেন আচরণ করা কুফরের পর্যায়ভুক্ত তবে পুরুষের সাথে এমনটা করা

---

[৬] আক্বীদাহ-এর একটি মূলনীতি হলোঃ ইসলামী শারী'আহ যেই কাজকে হারাম করেছে, সে কাজকে যে ব্যক্তি হালাল মনে করবে সে ব্যক্তি ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যাবে। [শারঈ সম্পাদক]

[৭] সুনানে তিরমিযী, হাঃ ১১৬৫। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গরীব বলেছেন আর শাইখ আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

হলে তা কেমন পাপ হতে পারে আর তার ব্যাপারে ইসলামের কি অবস্থান হতে পারে?

আল্লাহর অভিশাপ সমকামীদের উপরঃ

এর কারণ হলো নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> *"আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মাঝে সাত ধরণের লোককে অভিশাপ দেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য একবার লানত দেওয়াই যথেষ্ট মনে করেন, তবে সমকামিদের ব্যতীত, আল্লাহ তাদেরকে একাধিকবার অভিশাপ দেন।" তিনি বলেছেন,*
>
> *"সে অভিশপ্ত যে লূতের জাতির মত কাজ করে, সে অভিশপ্ত যে লূতের জাতির মত কাজ করে, সে অভিশপ্ত যে লূতের জাতির মত কাজ করে।" (তাবারানি, তারগীব ওয়াত তারহীব)*

এ অভিশপ্ত কর্ম সম্পাদনকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে এখানে। আর এরা সত্যই এরই যোগ্য।

সমকামীরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিতঃ

জাবিরের (রাদি) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> *"যখন লোকদের মাঝে সমকামিতা বেড়ে যাবে তখন আল্লাহ তাঁর (সাহায্যের) হাত তাদের উপর থেকে উঠিয়ে নেন এবং তিনি পরোয়া করেন না যে তারা কোন উপত্যকায় ধ্বংস হয়ে পড়ে থাকবে।"*

ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করা উচিত যে, এ কাজ কতটা ঘৃণ্য আর তা আল্লাহকে কতটা অসন্তুষ্ট করে, কীভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ বন্ধ হয়ে যায় এর কারণে। যখন গোটা পরিবেশ এতটা বীভৎস হয় তখন ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবে মানুষদের অবস্থা কেমন হতে পারে?

আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও তাঁর ক্রোধঃ

আবু হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> *"চারজন ব্যক্তি এমন আছে তারা সকল সকালে ও সন্ধ্যায় উপনীত হয় আল্লাহ তাদের উপর রাগান্বিত থাকেন। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, 'তারা কারা?' তখন নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন, তাদের মধ্যে একশ্রেণী হলো যারা আরেক পুরুষের মাধ্যমে নিজের যৌনতুষ্টি করে।" (তারগীব ওয়াত তারহীব)*

সমকামীদের হত্যার নির্দেশঃ

একবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের বলেন,

> *"তোমরা যখন দেখো কেউ লূতের জাতির মত কর্মে লিপ্ত হয়েছে তাকে ও যার সাথে করা হয়েছে উভয়কেই হত্যা করো।"* [৮]

এসকল হাদীছ বারবার পড়ুন ও চিন্তা করুন নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিকট এ কাজ কতটা ঘৃণ্য ছিলো আর কত উপায়ে তিনি এ কাজকে বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন।

সাহাবীদের দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামিতাঃ

সমকামিতার ব্যাপারে সাহাবীদের দৃষ্টিভঙ্গি নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মতই ছিলো।

মৃত্যুর পরে সমকামীদের শুকরে পরিণত হওয়াঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদি) বলেন,

> *"যখন কোনো সমকামী তাওবাহ ব্যতিরেকেই মৃত্যুবরণ করে কবরে তার আকৃতি শুকরের চেহারার মত করে দেওয়া হয়।"* [৯]

চিন্তা করুন! কতটা নিকৃষ্ট শাস্তি সমকামীদের! তার চেহারা শুকরের চেহারা হওয়ার কারণ সম্ভবত প্রাণীকূলের মধ্যে শুকরই[১০] একমাত্র সমকামীতায় লিপ্ত হয়। আর মানুষের মাঝে যারা শুকরের এই গুণ ধারণ করে তাদেরকে শুকরের আকৃতিই দেওয়া হয়। আর এভাবেই তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি নির্ধারিত করে দেওয়া হয়।

নারীর সাদৃশ্যকরণে নিষিদ্ধতাঃ

ইসলাম অত্যন্ত কঠোরভাবে এমন কোনো আচার, আচরণ, ব্যবহার, ভঙ্গি অনুকরণ করতে নিষেধ করে যা আরেকজনকে সমকামিতার দিকে উদ্বুদ্ধ করে। যখন কোনো পুরুষ নারীর সাদৃশ্য অবলম্বন করে তখন অনেকেই তার দিকে কামনার দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করে, অনেক সময় নারী সদৃশ ব্যক্তির সাথে কামনা চরিতার্থ করা পর্যন্ত

---

[৮] সুনানে আবু দাউদ, হাঃ ৪৪৬২ ; সুনানে তিরমিযী, হাঃ ১৪৫৬ ; মুসনাদে আহমাদ, হাঃ ২৭৩২ ; সুনানে ইবন মাজাহ, হাঃ ২৫৬১। শাইখ আলবানী ও শাইখ আহমাদ শাকির হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৯] হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। [শারঈ সম্পাদক]

[১০] আল্লাহ তা'আলা কোনো মানুষকে বা প্রাণীকে 'সমকামী' করে সৃষ্টি করেন নি। কোনো প্রাণীর মাঝেই এই বিকৃত স্বভাব নেই, বরং সকল প্রাণী বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শুকর তার ব্যতিক্রম নয়, বরং শুকরও বিপরীত লিঙ্গের প্রতিই আকৃষ্ট হয়। যেহেতু প্রাণীরা মানুষের মতো বুদ্ধিমান নয়, সেহেতু কখনো কখনো যৌন সঙ্গী নির্বাচনে তাদের ভুল হয় ও ভুলবশত পুং লিঙ্গের প্রাণী অপর পুং লিঙ্গের প্রাণীর সাথে মিলিত হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে দশম পাঠে(আঁতশ কাচের নিচে) আসছে। [শারঈ সম্পাদক]

এমনটা চলতে থাকে।[১১]

নারীর সাদৃশ্যকরণের কুফলঃ

যে পুরুষ পোশাক-আশাক, ভাবভঙ্গিতে নারীদের অনুকরণ করে সে স্বাভাবিকভাবেই নারীসুলভ হয়ে যায়, তখন সে তার প্রকৃতিগত পুরুষালী কাজের পরিবর্তে নারীসুলভ কাজই করে থাকে। সে তখন আশা করে যে, মানুষজন তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করবে, তাকে তুষ্ট করবে, ভালোবাসা নিবেদন করবে। এমন পুরুষ যদি অন্য পুরুষ কর্তৃক উত্যক্ত হয় তবে তারা এতে খারাপ কিছুই মনে করে না, বরং তারা একে নিজের রূপের প্রশংসা বলে ভেবে নেয়, আর তার মেইকআপ সুন্দর করার দিকে নজর দেয়। এসব কারণে ও অন্যান্য বিভিন্ন কারণে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে চারজন যারা আল্লাহর ক্রোধের মাঝে দিনাতিপাত করে তাদের মধ্যে এমন পুরুষকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে নারীদের বেশ ধরে ও তাদের মত নিজেকে প্রদর্শন করতে চায়।

নারীর সাদৃশ্যকারীদের উপর অভিশাপঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদি.) বলেছেন,

> *"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেসকল পুরুষদের অভিশাপ করেছেন যারা নারীর সাথে সাদৃশ্য করে।"* [12]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে,

> *"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেয়েলি বেশ ধরা পুরুষের প্রতি অভিশাপ করেছেন।"*

পুরুষের নারীর সাথে সাদৃশ্য করার অর্থ হলো মেয়েদের মত মুখমন্ডলের রূপ বদলানো, হাবভাবে, ভঙ্গিমায় নারীর মত করা, এমন ভঙ্গিতে হাঁটাচলা করা যা যুবক ও সাহসী পুরুষদের মত নয়। কথাবার্তা মেয়েদের মত চিকন স্বরে বলা কিংবা এমন অভ্যাস পোষণ করা যা পুরুষালী স্বভাবের বিপরীত।

পুরুষের সাদৃশ্য নেওয়ার কুফলঃ

বর্তমানকালে এমন যুবকের অভাব নেই যারা নারীসুলভ গুণাবলী নিজের মাঝে গড়ে তুলেছে। তারা মেয়েদের মত উজ্জ্বল রঙের পোষাক পরিধান করে, মুখমন্ডলে

---

[১১] পুরুষ সমকামীদের মধ্যে নারীর সাদৃশ্য নেওয়ার প্রবণতা অত্যন্ত বেশী। মেইকআপ, লিপস্টিক দেওয়া, নিজেকে নারীসুলভ কমনীয় করে তোলার প্রচলন তাদের মাঝে বেশী দেখা যায়। আসলে এটা স্বাভাবিক ও মানুষের সাধারণ ফিতরাতের চাহিদা। পুরুষরা নারীর কমনীয়তার প্রতি দুর্বল। আর তাই নিষ্ক্রিয় পুরুষ সমকামীরা নারীদের বেশ ধারণ করে তার সঙ্গীদের আকর্ষিত করার চেষ্টা করে। [অনুবাদক]

[১২] সহীহ বুখারী, হাঃ ৫৪৩৫

মেইকআপ করে ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলে। এর ফলে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করা কিংবা দুষ্কৃতিকারীদের জন্য তাদের উত্যক্ত করা কি সহজ হয়ে যাবে না? এসকল কারণেই ইসলাম পুরুষদের পুরুষালী স্বভাবের পরিবর্তে দুর্বল নারীদের স্বভাবগত কোনো গুণাবলী গড়ে তোলার অনুমতি দেয় না।

কঠোর সতর্কবাণীঃ

নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী মনোযোগের সাথে পড়ুন, তিনি বলেছেন,

> *"নারীদের মধ্যে যারা পুরুষের সাদৃশ্য করে এবং পুরুষদের মধ্যে যারা নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"*

এটি ও অন্যান্য আরো অনেক বর্ণনা জোরদান করে যে, না পুরুষদের নারীসুলভ সাদৃশ্য অবলম্বন করা উচিত আর না নারীদের পুরুষদের ফ্যাশনের অনুকরণ করা উচিত। এর সর্বশেষ পরিণতি সমকামিতা ও ব্যভিচারের বিস্তৃতি। একটি বয়স থাকে যখন ছেলেরা নিজেদের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে এবং তারা নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা ও কামনার অনুভব করে থাকে। সত্য কথা হলো এমনটাই আলিমগণ বলেছেন, এটাই হলো বিপথে বিগড়ে যাওয়ার সময়। এসময় সন্তানদের ব্যাপারে বেখেয়াল না হওয়া অভিভাবকদের নৈতিক দায়িত্ব। তারা যেভাবে সিংহ ও বিষ থেকে সন্তানদের দূরে রাখেন তেমনি তাদের উচিত খারাপ সমাজ থেকে তাদের সন্তানকে দূরে রাখা।

পাঠ ৪।। সুড়সুড়ি

যৌন অনুভূতির প্রেষণাদায়ক ও উপরতিঃ

ইসলাম যেমন পুরুষদের নারীসুলভ হতে নিষেধ করে তেমনি এমনসব কাজ করতেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যা যৌন অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে ও সমকামিতার দিকে উদ্বুদ্ধ করে।

একসাথে শয়ন করাঃ[১৩]

ছেলেদের মাঝে অকপটতা ও অসঙ্কোচ ভাব কাজ করার কারণে তারা একসাথে শয়ন করে থাকে, যা কখনো কখনো মানবিক দুর্বলতায় পতিত হতে প্ররোচিত করে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> *"একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষের সাথে নগ্ন হয়ে শোবে না, আর না নারী আরেকজন নারীর সাথে নগ্ন হয়ে শয়ন করবে।" (আহমাদ)*

আবু যুবাঈর বর্ণনা করেছেন,

> *আমি জাবিরকে (রাদি.) এমন পুরুষের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে আরেকজন পুরুষের সাথে মুক্তভাবে ও অসঙ্কোচ রেখে চলাফেরা করে ও ঢাকা ফরয এমন অঙ্গ ঢেকে চলে না। তিনি বলেন, "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ব্যাপারে তিরস্কার করেছেন ও অত্যন্ত কঠোরভাবে এমনটা করতে নিষেধ করেছেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ)*

এ বর্ণনা থেকে জানা যায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যারা নিজেদের গুপ্ত অঙ্গ না ঢেকেই একে অপরের সাথে শয়ন করে তারা উভয়েই ব্যভিচারী বলে গণ্য হবে।

সামুরা ইবনু জুনদুব (রাদি.) বলেছেন,

> *"রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুজন নারীকে তাদের*

---

[১৩] আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোনো পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে এবং কোনো নারী অন্য নারীর সাথে একই বিছানায় ঘুমাবে না। [সুনানে আবু দাউদ, হাঃ ৪০১৯, শাইখ শু'আইব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।] শারী'আতের শিক্ষা হলো, কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রী একই বিছানায় একই চাদরের নীচে ঘুমাতে পারে, আর তাদের সাথে ঘুমাতে পারে তাদের অবুঝ শিশু। যখনই শিশুর বয়স ১০ বছরে পৌছবে তখন তার বিছানা আলাদা করে দিতে হবে। এই বয়সে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভাই-বোনেরাও আলাদা বিছানায় ঘুমাবে। ইমাম নববী বলেছেনঃ "কোনো পুরুষের জন্য কোনো পুরুষের সাথে অথবা কোনো নারীর জন্য কোনো নারীর সাথে একই বিছানায় ঘুমানো বৈধ নয়, যদিও তারা বিছানার দুই পাশে আলাদা থাকে।" [ইমাম নববী, রওদ্বাহ, ৭/২৮] এভাবেই ইসলাম অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন সুড়সুড়ি হতে আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছে। [শারঈ সম্পাদক]

মাঝে কোনো বিকার না থাকা অবস্থায় একে অপরের সাথে ও দুজন পুরুষকে তাদের মাঝে কোনো বস্ত্র না থাকা অবস্থায় একে অপরের সাথে শয়ন করতে নিষেধ করতেন।" (তাবারানী)

একই তোষকে দুজন পুরুষ কিংবা দুজন নারীর শোয়াও নিরাপদ নয়। এটা পরিত্যাগ করা উচিত। একটি হাদীছে এসেছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"কোনো পুরুষ আরেক পুরুষের গুপ্তাঙ্গের দিকে ও নারীর আরেক নারীর গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকাবে না; কোনো পুরুষ আরেক পুরুষের সাথে একই লেপের তলে শয়ন করবে না।" [১৪]

ঢাকা ফরয এমন অঙ্গঃ

নাভী থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষের জন্য ঢাকা ফরয। একজন পুরুষের জন্য আরেক পুরুষের এসকল অঙ্গ দেখা বৈধ নয়, নারীদেরকেও আরেক নারীর এ সকল অঙ্গের দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকা উচিত। একমাত্র স্বামীই স্ত্রীর এ সকল অঙ্গ এবং স্ত্রী স্বামীর এ সকল অঙ্গ দেখতে পারে।

পারস্পরিক নগ্নতার ফলাফলঃ

প্রথমত, এতে ধর্মীয় সীমালঙ্ঘন হয়, নিষিদ্ধ কাজ করা হয়। দ্বিতীয়ত, এটি স্বাভাবিক কামনার্ত। কেননা এর মাধ্যমে যৌন চাহিদা জাগ্রত হয় ও কামনাকে উদগ্র করে তোলে। ব্যক্তিভেদে, ব্যক্তির ভালো কিংবা খারাপ হওয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, এটি সবার ক্ষেত্রেই সত্য। এটি মানুষের স্বভাবজাত তাড়না। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

"আমি বলি (এর কারণ) এটাই যে, গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত যৌন চাহিদাকে জাগিয়ে তোলে।"

তিনি আরো বলেছেন,

"নারী একে অপরের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করে এবং একইভাবে পুরুষও একে অপরের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করে।"

এ বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। কেননা আমরা প্রতিনিয়তই এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি এবং এর কুফলও আমাদের থেকে গোপন নেই। ইউরোপের ইতিহাসে এমন শত শত ঘটনা সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে।

---

[১৪] সহীহ মুসলিম, হাঃ ৩৩৮

একত্রে শয়নের খারাপ প্রভাবঃ

একই লেপ কিংবা তোষকে শয়নের প্রভাবও দৃশ্যমান। এতে করেও যৌন চাহিদা জাগ্রত হয়। এতে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় এটি পুরুষে পুরুষে ও নারী নারীতে সমকামিতায় যেয়ে ঠেকে। শাহ ওয়ালি উল্লাহ (রাহ.) এর মন্দ প্রভাব চিহ্নিত করে দিয়েছেন।

একত্রে শয়নের নিষিদ্ধতাঃ

ইমাম রাযী লিখেছেন,

> *"দুজন পুরুষের একত্রে শয়ন করা বৈধ নয় যদিও বা তারা বিছানায় দূরত্ব বজায় রেখেও শয়ন করে।" (তাফসীরে কবির)*

আলিমরা এ কাজকে নিষিদ্ধ বলে মত দিয়েছেন এবং এর মন্দ প্রভাব বর্ণনা করেছেন। এ মতই মানুষের মনোস্তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাধা নিষেধ বিহীন মুক্তভাবে একে অপরের সাথে শয়ন বিপদের কারণ হতে পারে।

ইসলামি আহকামঃ

এগুলো তো প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য হুকুম, কিন্তু আশ্চর্যজনক হলো ইসলাম প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে কৈশোরদের জন্যও বিধান দিয়েছে। ইসলামের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> *"সাত বছর বয়সে তোমাদের সন্তানদের সালাত পড়তে আদেশ করো, দশ বছর হয়ে গেলে তাদের প্রহার করো এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।" [১৫]*

দশ বছর বয়সে বিছানা আলাদা করে দেওয়া হবেঃ

নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদেশকে মাথায় রাখুন এবং কেন তিনি এমন আদেশ দিলেন তা চিন্তা করুন। কেন তিনি সাত বছর বয়সে সালাত পড়ার, দশ বছর বয়সে সালাত ত্যাগ করলে শাসন করার ও এ সময় বিছানা আলাদা করে দিতে বললেন? এটা হতে পারে স্বাস্থ্যগত কারণে, কিন্তু এ থেকে এটাও বোঝা যায় যে, এ বয়সেই মানুষের মাঝে যৌন ও অন্যান্য অনুভূতি জাগ্রত হতে শুরু করে, তারা ধীরে ধীরে তাদের যৌন পরিপক্কতার দিকে এগুতে থাকে। তাই এই বয়সেই যদি তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দেওয়া হয় তবে তারা সহজেই অনৈতিকতা, যৌন রোগ ও

---

[১৫] সুনানে আবু দাউদ, হাঃ ৪৯৫। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ ও শাইখ শু'আইব আরনাইত হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন।

অন্যান্য এমন ব্যধিতে আক্রান্ত হতে পারে পরবর্তীতে যা থেকে উত্তরণ করাটা কঠিন হয়ে পড়বে।

এ হাদীছ মোতাবেক নিজেই ভেবে দেখুন, যখন সন্তান দশ বছর বয়সের হয়ে যায়, যখন তার আলাদা বিছানা থাকার কথা, তখন যদি দুজন নির্জনে একত্রে শয়ন করে তবে কি তা স্বাস্থ্য ও আচরণের জন্য ক্ষতিকারক হবে না? এর এটা যখন জানা কথাই যে, রাতের শেষাংশে যৌন তাড়না অধিক জাগ্রত হয়ে উঠে।

বিছানা পৃথক করার বিধানের ন্যায্যতা প্রতিপাদনঃ

মনে রাখতে হবে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেওয়া কোন বিধানই প্রজ্ঞামুক্ত নয়। ছেলে-মেয়ের ক্ষেত্রে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেওয়া এ আদেশকে এড়িয়ে যাওয়া মোটেই উচিত নয়। এ বিষয়ে আলিমগণ প্রণিধান দিয়েছেন। দশ বছর হলেই ছেলে-মেয়েদের বিছানা আলাদা করে দেওয়া জরুরী, এ বিষয়ে দুররে মুখতার গ্রন্থের রচয়িতা লেখেন,

> *"বালক ও বালিকা যখন দশ বছর বয়সে উপনীত হবে তখন বিছানা পৃথক করে দেওয়া ওয়াজিব (আবশ্যক) হয়ে দাঁড়ায়। ভাই, বোন, মা, বাবা সকলের থেকে বিছানা পৃথক করে দিতে হবে, যেমনটা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন 'তাদের বিছানা আলাদা করে দাও যখন তারা দশ বছরের হয়' এবং 'নাতাফ' এ আছে যে এমনটা (বিছানা পৃথক করার আবশ্যিকতা) ছয় বছরেই হয়ে যায়।" (রাদ্দুল মুখতার, পৃ-৩৩৬, খ-৫)*

দশ বছরের বাচ্চার সাথে শয়ন না করাঃ

আল্লামা শামী এ বিষয়ে লিখেছেন,

> *"আশ-শারিয়াহ' গ্রন্থে রয়েছে যে, (তাদের মাঝে) বিছানা পৃথক করে দেওয়া হবে যখন তারা দশ বছরের হয়ে যাবে। পৃথকতা হবে বালক ও মহিলাদের, বালক ও পুরুষদের; কেননা এদের একসাথে শয়ন করা ঝুঁকিপূর্ণ, দেরীতে হলেও তাদের মাঝে দুষ্কর্ম প্রভাব বিস্তার করতে পারে।" (রাদ্দুল মুখতার, পৃ-৩৩৬, খ-৫)*

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো পড়া উচিত, যাতে উপলব্ধি করা যায় আলিমগণ এ বিষয়ে কতটা সচেতন ছিলেন, এমনকি ছয় বছর বয়স থেকেই তারা বিছানা পৃথক করা বিষয়ে জোরারোপ করেছেন। তবে ছয় বছরেই বিছানা পৃথক করতে হবে কি না তাতে মতভিন্নতা থাকতে পারে। তবে ভাই, বোন, মা-বাবা কারো সাথেই শয়ন নিরাপদ নয়। ছেলে-মেয়ের কিংবা দুই মেয়ের বিছানা কাছাকাছি হতে পারবে না, আর না তারা কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কিংবা নারীর সাথে শয়ন করবে। এমনকি তাদের মা-বাবার

বিছানা থেকেও তাদের বিছানা দূরত্ব থাকতে হবে। এটি কেবলমাত্র অগ্রাধিকারযোগ্য বিধান নয় বরং জরুরী আদেশ। যে এর বিপরীত করবে সে বড় গুনাহগার বলে গণ্য হবে। এ আদেশ কুমন্ত্রণার প্ররোচনা থেকে বিরত রাখার জন্য।

বিছানা পৃথকের নেপথ্যে যুক্তিঃ

বিছানা পৃথকের পেছনে যুক্তি হিসেবে আলিমগণ বলেছেন,

“পৃথক করা বলতে ঘুমানোর সময় (বিছানা) আলাদা করা বোঝায়, কেননা এ সময় অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করা হয়। দশ বছর বয়সের সময় শিশুরা গোপন মেলামেশা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ শুরু করে, আর এ সময়ে নিজেকে নিবৃত্ত রাখার মত পর্যাপ্ত ভালো-মন্দের অনুভূতি তাদের থাকে না। ফলে কখনো বোন কিংবা কখনো মায়ের সাথে এ ধরণের কাজে জড়িয়ে যেতে পারে, কেননা ঘুমের সময় পূর্ণ বিশ্রামাবস্থায় থাকার কারণে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত থাকে, তাছাড়া উভয়দিকের কাপড়ও অগোছালো থাকে। একটি আদেশের লঙ্ঘন কখনো কখনো হারামের দিকে প্ররোচিত করে থাকে।”

বর্তমান যুগে সতর্কতাঃ

আল্লামা শামী তাঁর যুগের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন,

“বিশেষ করে এই যুগে এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন থাকা উচিত কেননা অপকর্ম, দুষ্কৃতি ও অব্যবস্থা দিন দিন বেড়েই চলছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনে আর রাতে। পূর্বেকার প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় বর্তমান যুগের শিশুরা অধিক অগ্রসর এক্ষেত্রে।” বিশেষ করে বালকদের মধ্যে এসব খারাবী ও নষ্টামীর জ্ঞান বেশি। তাছাড়া বাবা-মা যে বিছানায় একত্রে শয়ন ও মেলামেশা করেন সেখানে শিশুদের থাকা উচিত নয়। তারা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তাদের মা-বাবাকে একত্রে দেখে ফেলতে পারে।

অপরিচিতজনের সাথে শয়নের বিপদঃ

দশ বছর হয়ে যাওয়ার পর যখন শিশু তার বাবা ও ভাইয়ের সাথেই শোবার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত নয়, তখন কীভাবে সে অপরিচিত নারী কিংবা পুরুষের সাথে শয়ন করতে পারে? আমাদের আলিমগণ এ বিষয়ের আলোচনাও এড়িয়ে যান নি। তাদের মতে অপরিচিত কারো সাথে শয়ন করা অবৈধ। এত ছোট বিষয়টিও তারা স্পষ্টভাবেই আলোচনা করেছেন,

“অপরিচিত কোনো পুরুষ কিংবা মহিলার সাথে বালককে ঘুমাতে দেওয়া যাবে না, বিশেষত বালক যদি সুদর্শন হয়। যদিও এখানে তেমন কোনো বিড়ম্বনা নাও থাকতে পারে তবে পুরুষ কিংবা নারী সাধারণত এমন বাচ্চাদের প্রতি নিছক আকর্ষণ অনুভব করতে পারে যা পরবর্তীতে কোনো অপকর্মে রূপ নিতে পারে।”

শরীয়ত ও ফলাফলঃ

আলোচনার শেষে আল্লামা ইবনু আবিদীন শামী শরীয়তের প্রশংসা করেন যা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও অনুবর্তী ফলাফলের দিকে গভীর নজর রাখে। তিনি অত্যন্ত স্বতস্ফূর্তভাবে লিখেছেন,

> *"শরীয়ত এ ফাসাদের গোঁড়াই উপড়ে ফেলেছে। নিশ্চয়ই যারা এসব বিষয়ে যথাযথ সতর্ক হয় না তারাই এ নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়ে।"*

আল্লাহপ্রদত্ত বিবেক, বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম অনুভূতি যাদের আছে তাদের ইসলামি শরীয়তের দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞাকে স্বীকার করতেই হবে।

অবাধ্যতাঃ

যারা শরীয়তের এ হুকুমের অবাধ্য হয় তাদের ভেবে দেখা উচিত যে, তারা এ ঘৃণ্য কাজের পক্ষে কি বলবে? আল্লামা শামীর যুগ থেকে দেড়শত বছর পরে এ ঘৃণ্য কাজের বিস্তৃতি মোটেও কমে যায় নি, বরং তা নিত্য বেড়েই চলছে, এমতাবস্থায় কোনো ন্যায়বোধসম্পন্ন মানুষ এ সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না। সিনেমা, উপন্যাস ও ছোট গল্প যুবকদের নৈতিকতা ধ্বংস করে ছেড়েছে সাথে সাথে ধর্ম থেকে দূরত্বও বাড়ছে এতে অন্যরা বিস্ময়াভিভূত। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দয়া না থাকে তবে বর্তমান যুগে একজন বালক ও তুলনামূলক বয়স্ক দুজনের একত্রে শয়ন করা কতটুকু নিরাপদ?

আল্লামা ইবনু তাইমিয়্যাহর মতঃ

আল্লামা ইবনু তাইমিয়্যাহ লিখেছেন, সুদর্শন বালক অনেক দিক থেকেই নারীর মতই এবং তাদের সাথে একই বিছানায় শোয়ার ক্ষেত্রেও একই বিধান। তিনি বলেছেন এটি এমন গুনাহ যা নতুন করে স্পষ্ট করে বলার আর কিছুই নেই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দশ বছরের শিশুর সাথে একত্রে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন। কোনো প্রকার দ্বিধা-সংশয় ছাড়া বোঝা উচিত যে, তাদের (বালকদের) সাথে একান্ত দেখা-সাক্ষাত ও নির্জনতা অবলম্বন করা হারাম।

মানুষের জীবনের বিভিন্ন স্তরঃ

যৌন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ লিখেছেন মানুষ শৈশব থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর পার করে আসে। একটি পর্যায়ে মানুষ নিজেকে ভালোবাসে, তার সকল অঙ্গই তার কাছে অতীব প্রিয় থাকে। সে নিজেকে সুসজ্জিত রাখে, সে নিজেকে সুদর্শন মনে করতে থাকে। এ সময়ে যে তার সৌন্দর্য ও রূপের প্রশংসা করে সে তাকেই

নিজের শুভাকাঙ্খী বলে মনে করতে থাকে। এরপর এমন একটি সময় আসে যখন মানুষ নিজের মত আরেকজনের প্রতি আকর্ষিত হয়, পুরুষ পুরুষের প্রতি, নারী নারীর প্রতি।

নির্দিষ্ট বয়সে অভিভাবকের সতর্কতাঃ

এ বয়সে নিজ সন্তানের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা মা-বাবার দায়িত্ব। অনৈতিক কোনো সমাজের সাথে সন্তানকে চলাফেরা করতে দেওয়া উচিত নয়। সন্তান যখন খারাপ কোনো সমাজের সংস্পর্শে আসে ও তার বাবা-মাও অবহেলা প্রদর্শন করে তখন তারা সমকামিতার রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সক্রিয় সঙ্গীর আনন্দ একটি পর্যায়ে কিছুটা বোধগম্য হলেও নিষ্ক্রিয় সঙ্গীর বিষয়টি চিন্তার বাহিরে। যে অল্প বয়স্ক ছেলে সমকামিতার ব্যধিতে এই বয়সে আক্রান্ত হয়ে যায় এবং কিছুসময় এভাবেই অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন পরবর্তীতে তার জন্য এ থেকে উত্তরণ পাওয়া মুশকিল হয়ে ওঠে।

হাইস্কুলের বয়স ও বন্ধুর পথঃ

পূর্বে বর্ণিত ফ্রান্স ও অ্যামেরিকার পরিসংখ্যান আমাদেরকে জানায় সমকামিতার এই ব্যাধি হাইস্কুল পড়ুয়াদের মাঝেই সবচেয়ে বেশী প্রসারণশীল, কেননা এ বয়সটি অত্যন্ত বিপদসংকুল। (এর অর্থ দাঁড়ায় যৌন চাহিদা একটি নির্দিষ্ট বয়সে জাগ্রত হয়, এর সাথে স্থানের কোন সম্পর্ক নেই, সে হাইস্কুলের ছাত্র হোক কিংবা দরসগাহের তালিবে ইলম হোক।)

কেউ যদি নিরাপদে এ বয়সসীমা পার করতে পারে তবে সে বিপদের বেশিরভাগ অংশই পার করে ফেললো। এ সময়ে মানুষ সাধারণত বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত হয়, ছেলে মেয়ের প্রতি ও মেয়ে ছেলের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে থাকে। এ বয়সেই যদি বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায় তবে ব্যভিচারের সম্ভাবনাও অনেকাংশে কমে আসে। ইসলামি শরিয়াহর নির্দেশ হলো সন্তান বালেগ হলেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া, ইসলামের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> *"যার সন্তান আছে তার উচিত সন্তানকে সুন্দর নাম দেওয়া ও উত্তম আদব শিক্ষা দেওয়া। সে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তার উচিত সন্তানের বিয়ে দিয়ে দেওয়া। যদি তাকে বালেগ হওয়ার পরেও বিয়ে দেওয়া না হয় আর সন্তান কোন পাপকাজে জড়িয়ে পড়ে তবে এর দায়ভার বাবার উপর বর্তাবে।"*

যে বয়সে মানুষ নিজ শরীর ও স্বীয় লিঙ্গের কাউকে ভালোবাসে সে বয়সে তার প্রতি গভীর খেয়াল রাখা উচিত। যে নিজেকে কিংবা তার পরবর্তী বংশধরকে এ সমকামিতার

অভিশাপ থেকে বাঁচাতে ইচ্ছা করে তার উচিত সচেতন হওয়া। বিশেষত সে সময়ে যখন এ ব্যাধি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, আল্লাহর ভয় ও আত্মমর্যাদা কমে যাচ্ছে।

একজন মনোবিজ্ঞানীর সতর্কবাণীঃ

মনোবিজ্ঞানী ড. রিয়াজ মুহাম্মাদ আসকার যথার্থই লিখেছেন,

"আমরা অল্পবয়স্কদের পিতা-মাতা, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সতর্ক করে বলতে চাই যৌন চাহিদার সাধারণ অভিমুখ হচ্ছে বিপরীত লিঙ্গের দিকে, কিন্তু যখন সাধারণ এই চাহিদা অপূর্ণ থেকে যায় তখন বিকার ও বিকৃতি জন্ম নেয়। কখনো কখনো ব্যক্তি নিজ লিঙ্গের কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে, ছেলে ছেলের সাথে, মেয়ে মেয়ের সাথে। এমনটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হয়ে থাকে। এসকল প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।"

স্থায়ী রোষানলঃ

সমকামিতায় আক্রান্তরা বিশেষত নিষ্ক্রিয় ভঙ্গিতে (যেখানে তার নিজের কোনো প্রকার যৌন আনন্দ বা তৃপ্তি হয় না) ভালোবাসার অভাববোধের কারণেই এমনটা হয়। ধনী ঘরের ছেলেপেলেরা সাধারণত সকলের কাছ থেকেই আদর-ভালোবাসা পেয়ে থাকে, ফলে তারা নিজেদের শরীর ও নিজ সত্তার প্রতি ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়ে, আর এভাবেই তারা কোনো দুর্বৃত্তের ভালোবাসার ফাঁদে পড়ে যায়। যেমনটা আগেই বলা হয়েছে যদি তারা এ অবস্থায় কিছুদিন অতিবাহিত করে তবে তাদের মাঝে ভয়ানক প্রাণঘাতী জীবাণু বাসা বাঁধতে থাকে, যেমনটা বাঁধে তার সঙ্গীর মাঝেও। এই জীবাণু তৃপ্তি কামনা করে যতক্ষণ না জীবননাশ হচ্ছে। সে এর কারণে বিকৃতকাম হতে বাধ্য হয় এবং সর্বোত্তম চিকিৎসাও তার কোনো কাজে আসে না।

শরীয়াহর প্রমাণঃ

এতক্ষণ সম্পূর্ণ আলোচনায় যৌনতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামতের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, তবে মুসলিম আলিমদের লেখালেখি ও সাহাবীদের উক্তি উপরোক্ত বিষয়ের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়, যা কোনো অযুহাত দিয়েই ফেলে দেওয়া যায় না। খলিফায়ে রাশিদ আলী (রাদি) বলেছেন,

"যে পুরুষ যৌনবস্তু হিসেবে নিজেকে আত্মসমর্পণ করে দেয় আল্লাহ তাকে মহিলাদের মত যৌন চাহিদা দিয়ে দেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে অভিশপ্ত শয়তান রূপেই বিদ্যমান থাকে।"

সমকামিতার ফলাফলঃ

আলীর (রাদি) উক্তি থেকে স্পষ্ট হলো যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজেকে যৌনবস্তু হিসেবে সমর্পণ করে এবং কিছুসময় নিজেকে এ অবস্থাতেই পছন্দ করে, আল্লাহ তাকে শাস্তিস্বরূপ মহিলাদের মত যৌন চাহিদা দিয়ে দেন, কেননা মহিলারা নিজেদের যৌন চাহিদা পুরুষদের দিয়ে পূরণ করাতে চায়, ঠিক একইভাবে যে স্বেচ্ছায় নিজেকে আরেকজনের খেলার পুতুল হিসেবে যে সমর্পণ করে দিয়েছে সে স্থায়ীভাবে এমন অনুভূতির অধিকারী হয়ে যায়, যদিও যৌক্তিকভাবে সে এমনটা ঘৃণা করে। মেডিক্যাল জার্নালে লিখিত ঘটনাসমূহ এর সাক্ষ্য। 'রিসালা হামদার্দ সেহাত দিল্লী' তে এরকম অনেক ঘটনাবলী এসেছে। যখন কেউ যৌনবস্তু হয়েও এ ধরণের অনুভূতি কামনা করে, যা তার জন্য আনন্দাদয়ক তো নয়ই বরং কষ্টদায়ক, তবে যে এ ধরণের কাজ থেকে যৌন আনন্দ পাচ্ছে সে কীভাবে সমকামিতাকে পরিত্যাগ করতে পারে? এর জন্য খুব বেশি যুক্তির প্রয়োজন পড়ে না।

সমকামীরা নপুংসকদের মতঃ

আমরা দারুল ইফতায় এমন চিঠি পাই যারা স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক যৌন আচরণের বদলে এ অস্বাভাবিক যৌনকর্ম (পায়ুপথে কাম) করতে স্ত্রীকে বাধ্য করে, যার অনুমতি সাধারণ অবস্থায় স্ত্রীরা দেন না। আলিমগণ এ বিষয়ে লিখেছেন যে, যদি কেউ এহেন দুষ্কর্মে লিপ্ত হওয়ার দরুন স্বাভাবিক যৌনকর্মে একেবারে অক্ষম হয়ে যায় তাদেরকে নপুংসক বলে বিবেচনা করা হবে এবং তার বাকী হুকুম সেভাবেই দেওয়া হবে। 'কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন। এ ধরণের লোকেরা সারাজীবন দুষ্কর্মের জীবাণু বয়ে নিয়ে বেড়ায়, তারা এদিকেই আকর্ষণ বোধ করতে থাকে। আল্লাহ যেন সকল মানুষকে এ ব্যাধি থেকে রক্ষা করেন, আমীন।

ফকীহদের সূক্ষ্মদৃষ্টিঃ

ফকীহগণ সাধারণত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাঁরা শিশুদের ক্ষেত্রে এমন প্রতিটি কার্যকরণের দিকেই মনোযোগ দিয়েছেন যাতে লোভ, জোরজবরদস্তি কিংবা কোমলমতি হওয়ার কারণে তারা অন্য কারো দ্বারা এরূপ কার্যে প্ররোচিত হতে পারে। হজ্জের গুরুত্ব কে অস্বীকার করতে পারে? কিন্তু যে বালকের দাঁড়ি নেই এমন ক্ষেত্রে ফকীহগণ বলেছেন (কোমলমতি হওয়ার কারণে) তার বাবা ইচ্ছা করলে তাকে বাধা দিতে পারেন।

"যদি ছেলে সুদর্শন হয় তবে বাবার অধিকার আছে তিনি তাকে বাধা দিতে পারেন, যতদিন দাঁড়ি না উঠছে।" (রাদ্দুল মুহতার)

দাড়িবিহীন বালক ও হজ্জঃ

উদ্দেশ্য হলো যদি বালক সুদর্শন হয় এবং সে একা হজ্জে যেতে চায় তবে বাবা যদি মনে করেন সে এতে কারো ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারে তবে তিনি চাইলে ছেলেকে বাধা দিতে পারেন, হজ্জে যাওয়া থেকে রুখতে পারেন। ফকীহদের মতামত থেকে এও প্রমাণিত হয় বাবার দায়িত্ব হলো দাঁড়িবিহীন ছেলেকে নজরে রাখা যাতে খারাপ সমাজের হাতে সে না পড়ে যায়, যদিও এরূপ সতর্কতার ফলে কিছুটা ক্ষতিও হয়।

দাড়িবিহীন বালক ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভ্রমণঃ

একইভাবে দাঁড়িবিহীন ছেলেরা বাবার অনুমতি ছাড়া দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যেও ভ্রমণ করতে পারবে না, কিন্তু শশ্রুওয়ালা পুরুষরা ইচ্ছা করলে বাবার ইচ্ছা ছাড়াও শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতে পারবে।

"যদি (দাঁড়ি) গজায় তবে ছেলে তার বাবার অনুমতি ছাড়াই দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে যেতে পারবে।"

'দুররে মুখতার' গ্রন্থের লেখক উপরোক্ত অংশ উদ্ধৃত করার পর 'দার' নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে বলেন এর বাকী অংশ আছে সেই গ্রন্থে। তাহতাবী এর বাকী অংশটুকু উদ্ধৃত করেছেন 'দার' গ্রন্থ থেকে,

"যদি ছেলে তখন পর্যন্ত শশ্রুবিহীন থাকে তবে ছেলেকে বাধা প্রদানের অধিকার বাবার আছে।"

বাবার দায়িত্ব ও এর কারণঃ

এখান থেকে পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে, যদি ছেলের মুখে দাঁড়ি না থাকে তবে বাবা তাকে বাধা দিতে পারে এবং ছেলের দায়িত্ব হলো বাবার কথা মান্য করা ও ভ্রমণ না করা। আল্লামা শামী 'আমারদ' শব্দের ব্যাখ্যা ও এর গুপ্ত প্রজ্ঞা বর্ণনা করে বলেন,

"'দার' গ্রন্থে উল্লেখিত 'আমারদ' শব্দের অর্থ হলো সেই বালক যার পূর্ণ দাঁড়ি উঠেনি, কেননা যদি নতুন নতুন দাঁড়ি গজায় অর্থাৎ, মাত্র দাঁড়ি উঠা শুরু করে তবে এটা কুপ্রবৃত্তি থেকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট নয়। কিছু পাপাচারী লোক আছে যারা দাঁড়িবিহীন বালক থেকে হালকা হালকা শশ্রুযুক্ত ছেলেদেরকে (পাপাচারের ক্ষেত্রে) অগ্রাধিকার দেয়।"

ফকীহদের নিকট সতর্কতার প্রয়োজনীয়তাঃ

আপনারা লক্ষ্য করেছেন ফকীহরা দাঁড়িবিহীন বালকদের ক্ষেত্রে কোনমাত্রায় সচেতনতা অবলম্বন করেছেন, কেননা দাঁড়িবিহীন বালকরা দুষ্কর্ম ও অনৈতিক লোকদের কামনার শিকার হতে পারে। অনেক সময়ই বাহ্যিকভাবে অনেককে নিষ্পাপ ও কলুষতামুক্ত দেখা গেলেও ভেতরে ভেতরে তারা আবিল মানসিকতার অধিকারী, তারা শিশুদের দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকায়। বর্তমান যুগে এমন চরিত্রের লোক দিয়েই সমাজ ভরপুর। এমনকি নাম মাত্র আলিম ও সম্মানিত লোকজনও সবাই সাধু নয়। পরিষ্কারভাবে বলতে হয় এ ধরণের অনৈতিক মানসিকতার লোকজন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আছে। তাদের বাহ্যিক দিকটি খুব সুন্দর ও পরিপাটি, যদিও তার ভেতরটা প্রতারণা আর অসুস্থতায় ভরা, তাদের অভিপ্রায়ে কলুষতা লেগে আছে। আমরা বলি স্টাফ ও ছাত্রদের মাঝে ভালো লোকজনের এখনো আকাল পড়ে যায়নি। তবে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মাদ্রাসায় পাঠানোর সময়ে বাবা-মায়ের দায়িত্ব হলো তারা যেন এ বিষয়টিকে এড়িয়ে না যান।

সতর্কতা না অবলম্বনের ফলাফলঃ

যেসব ব্যক্তি এসব বিষয়ে যথাযথ সচেতন নয় তারা অবশ্যই নিজেদের ও পরবর্তী বংশধরদের সাথে অন্যায় করছেন। আর এর ফলাফল হচ্ছে এ ধরণের অপকর্ম বেড়েই চলছে আর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খারাপ হচ্ছে। উপরে যা যা কিছু বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য ছিলো যাতে বাবা-মায়েরা তাদের কোমলমতি শিশুদের পরিচর্যায় আরো বেশি সচেতন হন। বালকদেরও উচিত সমাজের খারাবী থেকে বিরত থাকা। শিশুদের বেড়ে তোলা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বাবা-মা যেমন দায়িত্বশীল এবং আত্মমর্যাদা ও ধর্মীয় বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদেরও এ বিষয়ে দায়িত্ব রয়েছে, তারাও যাতে ইসলাম কর্তৃক আদেশ-নিষেধ ও সতকর্তাসমূহ যথাযথভাবে অবলম্বন করেন।

পাঠ ৫।। লাগে তারে ভালো

বালকদের দিকে তাকানো হারামঃ [১৬]

মানুষের প্রকৃতিতে যৌন তাড়না অত্যন্ত গভীরভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছে, এটা সুবিদিত বিষয়। মানুষ সেসব প্রত্যেকটি উপায়-উপকরণের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে যা তাকে যৌন তাড়না পূরণ করতে সহায়তা করে, হোক তা বৈধ কিংবা অবৈধ। এটা ভিন্ন কথা যে মানুষ সাধারণত সকল উপায়ের দিকে অগ্রসর হয় না বা সবসময় তা সম্ভবপর বলেও মনে করে না। হতে পারে তা ধর্মীয় অনুভূতির কারণে অথবা ভদ্রতা ও নৈতিকতার বাঁধনের ফলে কিংবা হতে পারে নিছক সাধারণ বিবেকের কারণে। আমাদের এমন প্রতিটি উপায়-উপকরণকেই পরিত্যাগ করা উচিত যা আমাদেরকে বিপথে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, ইসলাম আমাদের প্রত্যেকটি বিষয়ই চিহ্নিত করে দিয়েছে, এমন প্রতিটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলেছে যা পাপের পথে নিয়ে যেতে পারে কিংবা অপরকে পাপের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে।

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করাঃ

পাপের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার অন্যতম মাধ্যম হলো দৃষ্টি। যদি মানুষ যথাযথভাবে একে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে তবে তা তার জন্য অনেক বড় দুর্বলতা হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"হে নবী! মু'মিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য বেশী পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন।" (সূরা নূর, ২৪ঃ২৯)

মাওলানা থানভী এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

"মুসলিম পুরুষদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে অর্থাৎ তারা এমন কোন অঙ্গের দিকে না তাকায় যা তাদের জন্য দেখা বৈধ নয়। আর যা তাদের জন্য দেখা বৈধ তাও যাতে কামনার দৃষ্টি নিয়ে না দেখা হয়। তাদের উচিত তারা যেন

---

[১৬] বালকদের দিকে তাকানো হারাম বলতে এখানে 'যৌন লালসার' সাথে তাকানো উদ্দেশ্য। [শারঈ সম্পাদক]

নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে, তা যাতে অপব্যবহার না করে (ব্যভিচার ও সমকামিতার মাধ্যমে)। এটিই (তাকওয়া) তাদের জন্য অধিক উত্তম। এর লঙ্ঘন করলে তা শাস্তির উপযুক্ত হবে।" (বয়ানুল কুরআন)

কুরআনের বলার ধরণ থেকেই বোঝা যায় যে, চোখ (দৃষ্টির পবিত্রতা) ও লজ্জাস্থানের হেফাজত পরস্পর গভীর সম্পর্কযুক্ত। দৃষ্টির উপর নিয়ন্ত্রণ নিজের পবিত্রতার জন্য বৃহৎ ঢালস্বরুপ। এর অযত্ন ব্যবহার মুক্তাসদৃশ পবিত্রতাকে নষ্ট করে দেয়। এর মুক্ত-স্বাধীন ও কামনাযুক্ত ব্যবহার ব্যভিচার ঘটায়। যার শেষ পরিণতি হতে পারে সমকামিতাও।

অপাঙ্গদৃষ্টি ও হাদীছঃ

এ বিষয়ে হাদীছ ইতিমধ্যেই আমার গ্রন্থ "নিযামে ইফফাত ও ইছমাত" এ উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এর পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয় বলে মনে হচ্ছে, তবে সমকামিতা বিষয়ক হাদীছসমূহ উল্লেখ করা হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষদেরকে আদেশ দিয়েছেন মহিলাদের দিকে না তাকাতে, তেমনি তিনি আদেশ দিয়েছেন ইচ্ছাকরে বালকদের দিকে না তাকাতে। আবু হুরায়রা বলেন,

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বালকদের দিকে (কামনার) দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করেছেন।" (রাওদ্বাতুল মুহিব্বীন, পৃ-১১৫)

কামনাসহ দৃষ্টিপাতের অসৎ ফলাফলঃ

বালক যদিও মহিলা নয় তবুও বালক যেহেতু অপকর্মের উৎস হতে পারে এ কারণে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকানোর অনুমতি দেন নি বরং নিষেধ করেছেন। সত্য কথা হলো মানুষ দৃষ্টির মাধ্যমেই কারো প্রতি আকর্ষিত হয়। দৃষ্টির পথ হয়েই অপরের সৌন্দর্য, মোহন, চালচলন ও হাসি মন কেড়ে নেয়, হৃদয় ছুঁয়ে যায়। তার আকর্ষণ চিন্তাতেও তাকে আন্দোলিত ও উত্তেজিত করে। আর মানুষ মানুষই, সে ফেরেশতা হতে পারে না। শয়তান প্রতিমূহুর্তে তাকে সুযোগমত পথভ্রষ্ট করার দিকে ধাবিত করে যাচ্ছে। শশ্রুবিহীন বালক আকর্ষণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। কেননা বালক বয়সে তাদের মাঝে অদ্ভূত এক সরলতা বিরাজমান থাকে। কখনো কখনো সুদর্শন বালকদের সংস্পর্ষে আসাটা খুবই বিপজ্জনক হতে পারে।

নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে সতর্কতাঃ

হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম ও ইবনু তাইমিয়্যাহ একটি মুরসাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন, একবার বনু কায়েস থেকে প্রতিনিধিদল তাঁর (নবীর) সামনে উপস্থাপন করলেন, এর মধ্যে একজন দাঁড়িবিহীন বালকও ছিলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবসময়কার মতই লোকজনকে তার সামনে বসতে বললেন, তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বালকটিকে তাঁর সামনে বসতে দেন নি, তাঁকে পেছনে বসতে

অনুপ্রবেশ ঘটায়। শয়তান যখন এতেও সক্ষম হয় তখন শয়তান সরাসরি অপকর্ম করতে ব্যক্তিকে উত্তেজিত করে। তাঁর ভাষা হলো

"শয়তান মানুষকে তিনভাবে আক্রমণ করে। প্রথমত, দৃষ্টি দিয়ে; দ্বিতীয়ত, অন্তর দিয়ে ও তৃতীয়ত, লজ্জাস্থানের মাধ্যমে।"

দৃষ্টিপাতের কুফলঃ

দাঁড়িবিহীন বালকদের বিষয়টিও এরকমটাই। যদি কেউ বালকদের বিষয়েও দৃষ্টি সংযত না করে তবে আজ হোক বা কাল, সে সমকামিতার ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রথমদিকে সে এ ব্যাপারে কিছু চিন্তা করে না অথবা তেমন কিছু অনুভবও করে না। তবে একসময় যৌন চাহিদা তাকে অপকর্মের দিকে প্ররোচিত করে।

আলিমদের নিষেধাজ্ঞাঃ

সাহাবীদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ধর্মবেত্তাগণ ও হাদীছের বর্ণনাকারীগণ শশ্রুবিহীন বালকের দিকে দৃষ্টিপাত না করা ও যৌন তাড়নার সময় অধিক সতর্ক থাকার দিকে জোরারোপ করেছেন।

দাড়িবিহীন বালক সালাত পড়াবে না ও এর কারণঃ

এমনকি আলিমগণ দাড়িবিহীন বালকদের সালাতে ইমামতি করতেও পর্যন্ত নিষেধ করেছেন, তারা একে মাকরূহ[১৮] বলে সাব্যস্ত করেছেন। এর অর্থ হলো দাঁড়িবিহীন বালককে সালাতের ইমামতি করতে বলা উচিত নয়, আর আলিমরা এর কারণে বলেছেন যে, এতে করে অনৈতিকতা এড়িয়ে চলা যাবে, যা খুব জরুরী। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব বলেন,

"তোমরা যখন কোনো পুরুষকে দাঁড়িবিহীন বালকের দিকে তাকাতে দেখবে তাকে দোষী ভেবে নাও।"

বালকদের দিকে বারেবারে তাকানো আকর্ষণের বহিঃপ্রকাশঃ

যাদের অন্তরে ব্যধি আছে, যারা বালকদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে তারাই বালকদের দিকে তাকায়। আল্লামা ইবনু তাইমিয়্যাহ এ বিষয়ে চরম সত্য লিখেছেন যে, যে বারেবারে দাঁড়িবিহীন বালকদের দিকে তাকায়, তাকাতেই থাকে আর বলে এ তাকানোতে কামনা নেই, সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তিনি লিখেছেন,

"যে বালকদের দিকে পুনঃপুনঃ তাকাতেই থাকে আর দাবী করে তার দৃষ্টিতে কামনা নেই সে একজন মিথ্যাবাদী। কেননা যদি তার মাঝে সত্যিই এমন কিছু না থাকত যা তাকে বারবার তাকাতে বাধ্য করছে তবে সে এমনটা কখনোই করত না। এ ধরণের

[১৮] সমস্ত আলিমগন এ বিষয়ে একমত নন। [শারঈ সম্পাদক]

পুনঃপুনঃ দৃষ্টিপাত এই কারণেই হয় কেননা তার অন্তর এর মাধ্যমে আনন্দ পাচ্ছে।"

এতে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হলো।

সাহাবীদের দৃষ্টিতেঃ

বাকিয়্যাহ ইবনু ওয়ালিদ বলেছেন,

> *"কোনো কোনো তাবিঈন সুদর্শন বালকদের দিকে মনোযোগের সাথে তাকানোকে অত্যন্ত মন্দ বলে বিবেচনা করতেন। তারা এ ধরণের কাজকে অনেক বেশি অপছন্দ করতেন।"*

দাড়িবিহীন বালকরা আগে বসবে নাঃ

ইয়াহইয়া ইবনু মাঈনের একজন ছাত্র ছিলো মুহাম্মাদ বিন হাসান নামে, তার সম্পর্কে বলা হয় তিনি চল্লিশ বছর উপরের দিকে দৃষ্টি তোলেন নি, তিনি এভাবে কুরআনের 'দৃষ্টি অবনত' করার আদেশ অনুসরণ করেছেন। একবার একজন বালক এসে তাঁর পাশে বসতে চাইলো, তিনি বালকটিকে নিষেধ করলেন এবং পিছনের দিকে বসতে বললেন, যাতে তাঁর দৃষ্টি বালকটির দিকে না পড়তে পারে। তিনি এমনটা করাকে নিজের তাকওয়ার খেলাফ মনে করেছেন এবং তিনি সঠিক কাজই করেছেন, যা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ধরণের বালকদের পিছনে বসতে দেওয়াই অধিক নিরাপদ। আলিম ও মাশাইখরা এমনটাই করে আসছেন। পূর্বেকার যুগের লোকেরা এ বিষয়টির প্রতি খুব বেশি জোরারোপ করতেন, তারা এমন বিষয়েও মোটেই খামখেয়ালী হয়ে যেতেন না, যা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

বালকদের দিকে তাকানোর ব্যাপারে শাফিঈ আলিমদের মতামতঃ

সহীহ মুসলিমের পরিচিত ও বিখ্যাত ভাষ্যকার, মুহাদ্দিছ ইমাম নববী লিখেছেন,

> *"সুদর্শন বালকদের দিকে তাকানো নিষিদ্ধ, তা আকর্ষণ তৈরী করুক বা না করুক। উভয় অবস্থাতেই আলিমগণের মতামত এরকমটাই। ইমাম শাফিঈ ও তাঁর সঙ্গীগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।"*

দাড়িবিহীন বালকরা প্রলুব্ধকরঃ

এর কারণ বর্ণনা করতে যেয়ে তিনি (ইমাম নববী) লিখেছেন,

> *"এরুপ নিষিদ্ধতার কারণ হলো, যেহেতু তারা আকর্ষণীয় এ কারণে তাদের বিধান মহিলাদের মতই হবে। সৌন্দর্যের দিক থেকে বালকের মুখমন্ডল নারীদের মুখমন্ডলের মতই। অনেক সময় কিছু কিছু বালক দেখতে নারীদের থেকেও অধিক সুন্দর হয়ে থাকে। তাদের দিকে তাকানো অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাছাড়া মহিলাদের থেকে সুশ্রী বালকরা অধিক সুপ্রাপ্য।"*

ইমাম শাফিঈ ও অন্যান্য শাফিঈ আলিমগণ, কামনা তৈরী হোক আর না হোক উভয় অবস্থাতেই বালকদের দিকে তাকানো নিষিদ্ধ বলেছেন। উভয় অবস্থাতেই দৃষ্টি সংযত করতে হবে। এর স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে, আর বর্তমান যুগে এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়।

হানাফী মাযহাবঃ

মোল্লা আলী কারী ইমাম নববীর উপরোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করার পর হানাফীদের অবস্থা বলতে যেয়ে লিখেছেন,

> *"আমাদের (হানাফীদের) মাযহাব হলো দাঁড়িবিহীন বালকের দিকে কামনা সহকারে তাকানো হারাম। ইমাম নববী অবস্থাগত যে নিষিদ্ধতার কথা বলেছেন তা দ্বীনের সতর্কতার বিধানের উপর নির্ভরশীল, কেননা যে তার ছাগলকে তৃণক্ষেত্রে চরিয়ে বেড়ায় সে সীমালঙ্ঘন করতে পারে।"*

সতর্কতার বিধানঃ

মোল্লা আলী কারী সত্যই বলেছেন, "ইমাম নববীর মতামত দ্বীনের ক্ষেত্রে সতর্কতার মূলনীতি উপর ভিত্তিশীল।"

ছাগল মাঠে চরে বেড়াবে কিন্তু ঘাস খাবে না এটা একেবারেই অবাস্তবিক। ইমাম নববীর মতামত একেবারেই বাস্তবিক ও প্রয়োগযোগ্য। বর্তমান সমাজ উত্তম চরিত্রের ছোঁয়া থেকে বহুদূরে। এখনকার সময়ে আত্মনিয়ন্ত্রণসম্পন্ন ও উত্তম চরিত্রের লোক খুঁজে পাওয়া অতীব দুষ্কর।

বৈকৃতকাম ব্যক্তিদের প্রকারভেদঃ

তাবিঈ ও আলিমগণ বৈকৃতকাম ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকারভেদ উল্লেখ করেছেন, এদের মধ্যে একটি প্রকার হলো, যারা অন্তরের তুষ্টির জন্য বালক ও শশ্রুবিহীন বালকদের দিকে তাকায়,

> *"কোনো কোনো তাবিঈ বলেছেন বিকৃত ব্যক্তিরা চার প্রকারের হয়ে থাকে; কেউ শুধু দৃষ্টিপাত করে, কেউ করমর্দন করতে পছন্দ করে, আর তৃতীয় প্রকারের ব্যক্তি হলো যারা সমকামিতায় লিপ্ত হয়।"*

আল্লামা শামীর মতামতঃ

আল্লামা শামীও একই ধরণের কথা বলেছেন। তার মতামত নিম্নরূপঃ

> *"এতে ইশারা আছে যে, যদি (অন্তরে লুক্কায়িত) কামনার ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত হয় কিংবা সন্দেহে থাকে অথবা চিন্তাতেও আসে তবে তার জন্য দৃষ্টিপাত হারাম।"*

বর্তমান যুগ ও পরিবেশ-পরিস্থিতির দিকে দৃকপাত করলে যে কেউই সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে, বালকদের দিকে তাকানো কতটা ভালো বা খারাপ। এখানের বেশিরভাগ আলোচনাই দাড়িহীন বালকদের দিকে কামনা সহকারে তাকানো বিষয়ে। তবে যদি এমন কোনো আশা-আকাঙ্খা, কামনা না থাকে তবে তাতে সমস্যা নেই, অন্যথায় তা বৈধ নয়।

একটি ভুল ধারণা ও এর প্রতিষেধকঃ

কেউ কেউ এই ভুলে নিমজ্জিত আছে যে, সমকামিতা হারাম ও নিষিদ্ধ হলেও বালকদের দিকে তাকানোর মাধ্যমে তৃপ্তি হাসিলে মনে হয় কোনো সমস্যা নেই। তাদের আল্লামা শামীর আলোচনাটুকু পড়ে নিয়ে তারপর এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা উচিত,

"ইবনুল কাত্তান বলেছেনঃ আলিমগণ এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, তৃপ্তি হাসিলের জন্য কিংবা সৌন্দর্য উপভোগের জন্য, উভয় অবস্থাতেই দাড়িহীন বালকের দিকে তাকানো হারাম। তবে যদি পরিস্থিতি এমন না হয় ও দুষ্কর্মের কোনো সুযোগ নেই তবে এর বৈধতার ব্যাপারে সবাই-ই একমত।"

বালকদের সৌন্দর্য দেখে সুখানুভব করাঃ

যারা বালকদের সৌন্দর্য দেখে পুলকানুভব করে ও কেবলমাত্র এ কারণেই তাদের দিকে দৃকপাত করে সবার ঐক্যমতে এমনটা অবৈধ। তবে যদি জরুরীবস্থায় এহেন কোনোপ্রকার উদ্দেশ্য ও কামনার ইচ্ছা ছাড়াই তাকানো হয় তবে তাতে সমস্যা নেই। হাফিজ ইবনু তাইমিয়্যাহ লিখেছেন,

> *"তাই বালকদের দিকে তাকানো সকলের মতেই হারাম, তবে যদি কোনো কারণে ও উদ্দেশ্যে তাকাতেই হয় তবে তা প্রয়োজনের সময় মহিলাদের দিকে তাকানোর মতই।" (ফতোয়ায়ে ইবনু তাইমিয়্যাহ)*

শুধুমাত্র প্রয়োজনের সময়ই তাকানোঃ

বোঝা গেলো কোনো প্রকার কামনার উদ্দেশ্য ছাড়া বালকদের দিকে তাকানো তেমনই অবৈধ যেমন মহিলাদের দিকে তাকানো অবৈধ। তবে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে, অসাবধানতাবশত কিংবা অসুন্দর কোনো ব্যক্তির থেকে সুন্দর ব্যক্তির সৌন্দর্য যদি প্রাকৃতিকভাবেই আকর্ষণ করে তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই। আল্লামা শামী লিখেছেন,

> *"আমি বলি চূড়ান্ত কথা হলো কোনো বালকের দিকে কেবলই দৃষ্টিপাত কিংবা তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে তাকে অসুন্দর কারো থেকে অগ্রাধিকারদান করা মূল্যবান বস্তুর প্রশংসার মতই, এতে সমস্যাযুক্ত কিছু নেই। মানুষের স্বভাব এভাবেই সৃষ্টি করা*

হয়েছে।”

মৌলিক সমস্যার আলোচনার পরে একটি বিষয় ভালোমত বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে, তাকওয়া ও সতর্কতার দাবী হলো অপ্রয়োজনে বালকদের দিকে না তাকানো। কোনো প্রকার উদ্দেশ্য ছাড়া আসক্তিতে জড়িয়ে যাওয়া মোটেই প্রজ্ঞাপূর্ণ নয়। বিশেষত বর্তমান যুগের বাজে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে এমনটা মোটেও উচিত নয়।

যৌন উত্তেজনার সংজ্ঞাঃ

“কামনার সাথে তাকানো” এর অর্থ কি এর কিছুটা ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত। ধর্মতত্ত্ববিদগণ অভ্যন্তরীন তাড়নাকে যৌন উত্তেজনা এবং অনুভূতিগত চিন্তা-ভাবনা ও অঙ্গাদির অনুভূতি বৃদ্ধি পাওয়াকে কামনা বলে অভিহিত করেন। আল্লামা শামী শায়খ আব্দুল গনির উদ্ধৃতি দিয়ে এ বিষয়ের চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং আমাদের জানা মতে এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও পরিব্যাপ্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি লিখেন,

“যৌন উত্তেজনা –যা সকল নিষিদ্ধতার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের মূল ভিত্তি- হলো যখন ব্যক্তির অন্তর (যৌনভাবে) উত্তপ্ত ও স্বক্রিয় থাকে এবং কোনো বিষয়ে আনন্দ লাভের জন্য অভিমুখী হয়ে যায়। আর যখন এ চাহিদা বৃদ্ধি পায় তখন যৌন অঙ্গের আকার বৃদ্ধি পায়। যৌন উত্তেজনার অভাব অর্থ হলো অন্তর উপরোক্ত কোনো প্রকার জিনিসের সাথে যুক্ত থাকে না। এর উদাহরণ হলো যখন বাবা তার সুন্দরী মেয়ে অথবা সুশ্রী ছেলের দিকে কোনো প্রকার চাহিদা ব্যতিরেকেই দৃষ্টিপাত করেন।”

আমাদের পূর্বপুরুষগণের কর্মপদ্ধতিঃ

আমাদের পূর্বপুরুষরা সবসময়ই এরুপ গুনাহের পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তারা নিজেদের ঈমানী বলের অযুহাত দেখিয়ে গুনাহ হতে পারে এরকম কোনো পরিস্থিতের সাথেই জড়ান নি। ইমাম আবু হানিফা শশ্রু উঠা পর্যন্ত ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানকে পিছনে বসিয়েছেন, যদিও তিনি আবু হানিফার অন্যতম বিখ্যাত ও মেধাবী ছাত্রদের একজন ছিলেন। (রাদ্দুল মুহতার)

আমাদের পূর্বপুরুষগণ এভাবেই সুন্নাহের অনুসরণ করেছেন, তাদের অন্তরের পবিত্রতা ও তাকওয়ার অবস্থা ছিলো এমনই। তাদের যুগে এতটা নোংরামী ও অশ্লীলতা ছিলো না, যেমনটা বর্তমান যুগে বেহায়াপন ছড়িয়ে পড়ছে, তবুও তারা যে পরিমাণ সতর্কতা দেখিয়েছেন ও তাকওয়ার নজরানা পেশ করেছেন তা সত্যিই বিস্ময় জাগানিয়া। হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম লিখেছেন, আসক্তি ও অপকর্মের দিকে প্ররোচিত করতে পারে এমন অবস্থা ও পরিস্থিতি অবশ্যই পরিত্যাজ্য, যেমনঃ সুদর্শন ও তরুন বালকদের দিকে তাকানো গরলতুল্য ও মরণব্যাধি।

বালকদের দিকে তাকানো, স্পর্শ করা ও নির্জনবাসঃ

ইবনু হাজার হাইছামি লিখেছেন,

"আমি বালকদের দিকে তাকানো, স্পর্শ করা ও তাদের সাথে নির্জনবাস করাকে কবীরা গুনাহ বলে গণ্য করি। কেননা এতে ফিতনার ভয় ও আশঙ্কা আছে। এটা জানা কথা যে, সমকামিতা ও ব্যভিচার কবিরা গুনাহ, আর তাই এদের দিকে প্ররোচকদের বিধানও একই রকম হবে।"

তিনি বালক ও মহিলাদের দিকে কামনা সহকারে তাকানোকে ব্যভিচারের শামিল করেছেন। মহিলা ও বালকদের দিকে কামনা সহকারে দৃকপাত করা ব্যভিচার কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কামনা সহকারে দৃষ্টিপাত করাকে ব্যভিচার বলেছেন।

বালকদের দিকে দৃষ্টিপাতঃ

হাফিজ ইবনু তাইমিয়্যাহ এ বিষয়ে লিখেছেন যে, বালকদের মুখশ্রীর দিকে তাকানো গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকানোর মতই হারাম। ইমাম গাযালী লিখেছেন,

"যুবক বালকদের দিকে তাকানো একটি বড় পরীক্ষা, যার ফলাফল সাংঘাতিক ও ভয়াবহ।"

সারমর্মঃ

বালকদের দিকে কামনা ব্যতিরেকে ও কামনা সহকারে দৃষ্টিপাতের ব্যাপারে নবুওয়্যাতের যুগ, তার পরের যুগ, সাহাবীদের উক্তি, এ বিষয়ে তাদের আচরণ, ধর্মতত্ত্বের নির্দেশ, এর সাথে সম্পৃক্ত বিপদ ও মুসলিমদের করণীয় সবই আপনাদের সামনে রয়েছে। এর আলোকে বলা যায় এসবগুলোই ইসলামেরই বিধান, সত্যই এমনটা। এরপরেও কার্যকর ও বাস্তবিক সমাধান কেন প্রয়োগ করা হবে না? কেন প্রবৃত্তির সামনে লোহার দেয়াল তুলে এর অকল্যাণকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হবে না?

ফকীহদের দূরদৃষ্টিঃ

ক্ষীণ নশ্বর দুনিয়ার আনন্দের জন্য অনন্তকালের আখিরাতকে বিপদোন্মুখ করা জ্ঞানীদের কাজ নয়। এমনকি আলিমগণ বালকদের মত চুল কাটতেও মানা করেছেন যদি সে এতে আনন্দ পেয়ে থাকে। আল্লামা শামী লিখেছেন,

"আমাদের শায়খগণ বলেছেন বালকদের মত চুল কাটা পরিত্যাগ করাই উত্তম, যদি সে এতে সুখানুভব করে।" (রাদ্দুল মুহতার)

পাঠ ৬।। কি করব আমি

বালকদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও নির্জনবাস নিষিদ্ধঃ

ইসলাম যেখানে অপ্রয়োজনেই বালকদের দিকে তাকানোর অনুমতি দেয় নি সেখানে তাদের নৈকট্যে যাওয়া ও তাদের সাথে অবাধে মেলামেশার অনুমতি কীভাবে দিতে পারে?

সুদর্শন বালকরা মহিলাদের মতইঃ

'ফতোয়ায়ে আলমগিরী' গ্রন্থে 'মুলতাফাত' থেকে বর্ণিত আছে, যদি বালক বিমোহিত করার মত হয় তবে তার বিধান মহিলাদের মতই হবে।

> *"যদি কোনো বালক পুরুষত্বের বয়সে পৌছায় এবং সে সুদর্শন না হয় তবে তার বিধান পুরুষের মতই, তবে যদি সে সুশ্রী হয়, এমতাবস্থায় তার আওরাহ মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত হবে, তার দিকে তাকানো বৈধ হবে না।"*

দেখতে সুন্দর ও সুশ্রী বালকরা অধিকাংশ সময়ই বিপদের কারণ হয়ে থাকে। এরা মানুষকে নিজেদের পবিত্রতার স্থান থেকে নামিয়ে ছাড়ে, বিশেষত তারা যদি সুখবর্ধক ও ঘনিষ্ঠ হয়। তাই বালক কি পুরুষ, কারো জন্যই তাদেরকে সঙ্গী বানানো উচিত নয়। আর আগেই আলোচিত হয়েছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে সামনে বসতে অনুমতি দিতেন না, পিছনে বসতে বলতেন।

বালকদের সঙ্গে ঝুঁকিঃ

ইমাম গাযালী তাঁর 'ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন' ও ইবনুল হাজ্জ তাঁর 'আল-মাদখাল' গ্রন্থে তাবিঈদের উক্তি বর্ণনা করেছেন,

> *"কিছু তাবিঈ বলেছেন যে তাঁরা হিংস্র জন্তুর সাথে থেকে এতটা ভীত হতেন না যেভাবে ভীত হতেন একজন তরুন ইবাদাতকারীর সাথে ইবাদাত করতে, যেভাবে ভীত হতেন তাদের সঙ্গে অবস্থানকারী বালকদের থেকে।"*

আলিমদের ইজমাঃ

আমাদের পূর্বপুরুষরা কীভাবে এ ধরণের কাজকে ভয় পেতেন, কীভাবে এ ধরণের পরিস্থিতি এড়িয়ে যেতেন এখান থেকেই বোঝা যায়। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বর্ণনা করেছেন, ইব্রাহিম নাখঈ, সুফিয়ান ছাওরী ও অন্যান্য নেককার পূর্বপুরুষগণ বালকদের সঙ্গে বসতে কিংবা তাদের মজলিসে ও আশেপাশে তাদের বসার অনুমতি দিতে নিষেধ

করতেন। তাঁরা বলতেনঃ "তারা অপরাধের জন্য উসকানি দেয়।"

তাঁরা লিখেছেন,

ইমাম ইব্রাহিম নাখঈ বলেছেন, "এদের সঙ্গ পরীক্ষা, তাদের সাথে মহিলাদের মতই আচরণ করা হবে।"

বালকদের প্রতি আকর্ষণের ব্যাপারে সুফিয়ান ছাওরীর মতঃ

সুফিয়ান ছাওরী বলেছেন, "তুমি যদি কাউকে কোনো বালকের পদাঙ্গুলী নিয়ে খেলতে এবং এ থেকে সুখানুভব করতে দেখো তবে নিশ্চিত থাক সে সমকামী, আর সে এর মাধ্যমে বালকটিকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে। এ ধরণের লোক থেকে দূরে থাক।"

হাসান বিন জাকওয়ান বলেছেন,

> *"ধনী বালকদের সঙ্গে বোসো না, কেননা তাদের মুখমন্ডল স্ত্রীজনোচিত আর এরা কুমারী মেয়েদের থেকেও অধিক বিপজ্জনক।"*

ধনী বালকদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকাঃ

হাসান বিন জাকওয়ানের কথা মোটেও ভুল নয়, বর্তমান যুগের ক্ষেত্রে শতভাগ সঠিক কথা এটি। ধনীদের ছেলেরা বাহ্যিকভাবে ও কাপড়-চোপড়ের দিক থেকে অধিক সুশ্রী হয়ে থাকে। তাদের কথাবার্তা প্রলুব্ধ করার মত। ধনীর ছেলেদের যে প্রকার কোমলতা ও আবেদন থাকে তা গরীবের সুশ্রী ছেলেদেরও থাকে না। একেবারেই হয় না এমন নয়, তবে তুলনামূলক বেশ কম। উভয় শ্রেণী থেকেই সতর্কতা বজায় রাখা প্রয়োজন।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের সতর্কতাঃ

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল এ বিষয়ে এতটাই সতর্ক ছিলেন যে, একবার তাঁর নিকট একজন লোক এলো, সাথে ছিলো তার সুদর্শন বালক। ইমাম আহমাদ সেই লোকটিকে আর কখনো তার এ ছেলেকে সঙ্গে করে তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করে দিলেন। লোকজন বললো, "সে তার ছেলে!" তিনি উত্তরে বলেন, "তা সত্য বটে, তবে আমি পূর্বপুরুষদের মত আমল করলাম।"

এটাই হলো অতীব উচ্চ মর্যাদার মুহাদ্দিছদের আচরণ, যাদের তাকওয়া ছিলো দৃষ্টান্তস্বরুপ। ভেবে দেখুন! এই যদি তাঁদের অবস্থা হয় তবে বর্তমান যুগে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত, কেমন হওয়া দরকার আমাদের সতর্কতা!

ইবনু হাজারের মতামতঃ

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী বলেছেন, "ধনী ঘরের ছেলেদের সাথে চলাফেরায় সতর্কতা বজায় রাখা প্রয়োজন। এমনিতেই তারা তাদের সুদৃশ্য চেহারা ও পরিধেয় বস্ত্রের কারণে আকর্ষণীয় হয়, তার উপর তারা মাঝে মাঝে মহিলাদের থেকেও বেশি মনোহরক হয়, ফলে এদের সামনে মানুষ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে।"

দাড়িবিহীন বালকের সাথে শয়তানের উপস্থিতিঃ

হাফিজ ইবনু হাজার সুফিয়ান ছাওরীর ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন এভাবে যে, সুফিয়ান ছাওরী (রাহি.) একবার হাম্মামখানায় গোসল করতে প্রবেশ করেন, আকস্মিকভাবে সে সময়ই একজন বালকও সেখানে গোসল করতে প্রবেশ করে। যেইমাত্র তিনি ছেলেটিকে দেখলেন তিনি বলে উঠলেন, "একে এখান থেকে বের করে দাও, কেননা আমি মনে করি মহিলার সাথে থাকে একটি শয়তান আর এদের সাথে থাকে দশটি শয়তান।"

মানহানিকর পরিস্থিতি থেকে বিরত থাকাঃ

এরকমটাই ছিলো আমাদের সালাফে সালিহীনের কর্মপন্থা। এ বিষয়ে কোনোপ্রকার শৈথিল্যকে তারা প্রশ্রয় দিতেন না। যেমনটা ইমাম আহমাদের ব্যাপারে আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে এরকম যে, একজন লোক ইমাম আহমাদের কাছে এলো সাথে একজন বালককে নিয়ে। ইমাম আহমাদ ছেলেটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলো। লোকটি বললো, "এ আমার বোনের ছেলে।" ইমাম আহমাদ লোকটিকে উপদেশের ভঙ্গিতে বললেন, "ভাই আমার! পরবর্তীতে একে নিয়ে বাজারে ঘুরাফিরা কোরো না, পাছে না মানুষ তোমার ব্যাপারে সন্দেহ করে বসে!"

নিজেদের গোটা জীবনকে ইলম অর্জন, আদব, তাকওয়া ও নফসের প্রতি কঠোরতায় কাটিয়েছেন সেই সকল বড়দের এমনই ছিলো আমল। তাদের থেকে আমাদের যুগের বড় ও দায়িত্বশীলদের শেখার অনেক কিছুই আছে, যারা বালকদের সাথে নির্জনে থাকেন। আমরা মোটেই বলতে চাই না যে, তাদের নিয়্যাত খারাপ, তাদের মনমানসিকতায় গলদ আছে, তবে পদে পদে ধোঁকা ও পরীক্ষা ভরা এই যুগে সতর্ক থাকাই বাঞ্চনীয়। যদি নেতিবাচক কিছু নাও ঘটে তবে শত্রুরা এতে দোষ দেওয়ার সুযোগ পাবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"অপবাদের পরিস্থিতি থেকে বেঁচে থাকো!"

ইমাম আবু ইউসুফের প্রতি ইমাম আযমের উপদেশঃ

ইমাম আযম আবু হানিফা তাঁর প্রিয় ছাত্র আবু ইউসুফের উদ্দেশ্যে যে উপদেশবাণী রেখে গিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলো তরুন যুবকদের সাথে কথা না বলা কেননা তারা প্ররোচনাদায়ক। তিনি বলেন,

> *"দাড়িবিহীন বালকদের সাথে কথা বোলো না, কেননা তারা ফিতনা সমতুল্য। তবে আদর করে ছোট বাচ্চাদের পিঠে হাত বুলাতে পারো, এতে কোনো সমস্যা নেই।"*

ইমাম মালিকের সচেতনতাঃ

ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত আছে তিনি তাঁর মাদ্রাসার মজলিসে বালকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, ফলে বালকরা সেখানে যেতে পারত না। হিশাম নামের একজন অল্পবয়স্ক শশ্রুবিহীন ছেলে তাঁর নিকট শিক্ষা নিতে আগ্রহী ছিলো। কোনো উপায় না দেখে সে অন্যান্যদের মাঝে নিজেকে লুকিয়ে রাখলো। এভাবে সে ১৬টির মত হাদীছ শুনেছিলো। যখন ইমাম মালিক এ ব্যাপারে জানতে পারলেন তখন তিনি হিশামকে ১৬টি বেত্রাঘাত করলেন তাঁর মজলিসের নিয়মভঙ্গের জন্য।

বিশর আল হাফীর ঘটনাঃ

আল্লামা ইবনু তাইমিয়্যাহ বিশর আল হাফীর ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার তাঁর নিকট একজন দাসী এসে প্রশ্ন করলো, তিনি দাসীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এরপর দাড়িবিহীন একটি ছেলে এসে তাঁকে প্রশ্ন করলো, তিনি কোনো উত্তর দিলেন না, এরপর ছেলেটি আবার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তিনি নিজের চোখ বন্ধ করে নিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনি দাসীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন কিন্তু বালকটির কথার উত্তর দিলেন না, কেন?" তিনি উত্তরে বললেন, "আমি তার অভ্যন্তরের শয়তানকে ভয় পাচ্ছিলাম।"

বালকদের দিকে তাকানোর শাস্তিঃ

ইবনুল জাওযীর বরাতে ইবনু তাইমিয়্যাহ একটি দুর্বল হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে,

> *"যে একাধারে কোনো বালকের দিকে তাকাতে থাকবে আল্লাহ তাকে চল্লিশ বছর জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবেন।"*

খতীবের বরাতে একটি মুনকার হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এরকমভাবে,

> *"রাজপুত্রদের সঙ্গ দিয়ো না, কেননা তারা মেয়েদের থেকেও বেশী আকর্ষণীয় হয়ে থাকে।"*

বালকদের সাথে নির্জনবাসের ব্যাপারে তিরস্কারঃ

ইবনু হাজার হাইছামী লিখেছেন যে, "সুশ্রী বালকদের সাথে নির্জনবাস করা কবীরা গুনাহ, কেননা পূর্বেকার নেককার লোকেরা তাদের সাথে দেখা করা, কথা বলা ও চলাফেরা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।" এ কারণে কাউকেই নিজের সাথে বালকদের বসতে দেওয়া উচিত নয়, তেমনি সঠিক নয় তাদের সাথে একাকী থাকা, বরং এরকমটা করা নিষিদ্ধ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> *"তোমাদের কেউ যেন অপরিচিত মহিলার সাথে নির্জনে বাস না করে কেননা এ দুজনের মাঝে তৃতীয়জন হচ্ছে শয়তান।"*

বালকের সাথে রাত্রি অতিবাহিত করা যাবে নাঃ

এটি ও এ ধরণের আরো কিছু হাদীছ থেকে আলিমগণ লিখেছেন যে, দাড়িবিহীন বালকদের সাথে নির্জনতায় কাটানো নিষিদ্ধ, কেননা এতে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা মানুষকে পাপের দিকে প্রলুব্ধ করতে পারে। আর যখন বালক নারীদের থেকেও অধিক সুশ্রী হয় তখন তা আরো বেশি ভয়ানক। তাছাড়া এক্ষেত্রে মহিলাদের তুলনায় পাপের সুযোগ অধিক। ইবনু হাজার হাইছামী লিখেছেন,

> *"কোনো কোনো তাবিঈ বলেছেন কারো জন্যই বালকদের সাথে রাত অতিবাহিত করা উচিত নয়।"*

রাতের নীরবতায় যৌন চাহিদা জেগে উঠার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অপরিচিত বালকের সাথে রাত কাটানো, যেখানে অন্য কেউই নেই, তা অতিব সাংঘাতিক ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতার খেলাফ। যদিও সকল পুরুষ এ ধরণের নোংরা মানসিকতা রাখে না আর না সকলের বালকদের প্রতি আকর্ষণ কাজ করে।

ন্যায্যতা প্রতিপাদনঃ

আলিমগণ এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং এ কারণেই তারা বালকদের সাথে নির্জনবাসকে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন।

"অসংখ্য আলিম বালকদের সাথে নির্জনবাসকে হারাম বলেছেন, হোক তা কোনো ঘরে অথবা কোনো দোকানে। এ বিধানের ভিত্তি হলো নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীছ 'যখনই কেউ কোনো নারীর সাথে নির্জনবাস করে তখন তাদের দুজনের মাঝে তৃতীয়জন হয় শয়তান।"

চিন্তা করে দেখুন! হাদীছে উল্লেখিত বিষয়টি বালকদের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। যদি কোনো যুবক কোনো বালকের সাথে নির্জনবাস করে এবং তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা

থাকে আর এদের কেউই এ ধরণের নির্জনবাসকে অবৈধ মনে না করে তবে হতে পারে শয়তান এদের একজনকে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে পারে, কেননা শয়তান প্রতিটি মূহুর্তেই মানুষকে বিভ্রান্ত করতেই ব্যস্ত আছে। তবে যদি তাদের সাথে অন্য কেউ থাকে তবে তাতে সমস্যা নেই। তবে আমাদের মতে দুজন বালকের জন্যও পরস্পর রাত্রি যাপন করা উচিত নয়। সেখানে কমপক্ষে তিনজন থাকা উচিত। দুজনের একত্রে অবস্থান সবসময়ই বিপজ্জনক।

বালকদের থেকে সম্পূর্ণরুপে দূরে অবস্থানঃ

ইবনু হাজার হাইছামী সঠিকই বলেছেন যে, বালকদের দিকে তাকানো, স্পর্শ করা, তাদের সাথে একত্রে অবস্থান সবই নিষিদ্ধ কেননা সবগুলো অবস্থাই গুনাহের দিকে প্ররোচনা দেয়। যদিও তাতে কামনা যুক্ত থাকুক আর নাই-বা থাকুক, তারা আকর্ষণীয় হোক আর নাই-বা হোক। গুনাহের প্রতিটি সম্ভাব্য উপাদানকেই গোঁড়া থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। যদি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এগুলোকে বৈধ করে দেওয়া হয় তবে প্রলুব্ধকর পরিস্থিতে তা ব্যক্তিকে লজ্জাহীনতা ও গুনাহের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে, এতে করে সমকামিতা থেকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। আর তাই দ্বীনের যথার্থতার দাবী তো এই-ই যে, এসকল কাজকেই পরিত্যাগ করা হবে যাতে গুনাহের দিকে নিয়ে যেতে পারে এমন সকল দরজা শক্তহাতে বন্ধ করে দেওয়া যায়। যারা তাকওয়াবান, স্বাস্থ্যসচেতন, নিজের সুনাম বজায় রাখার ক্ষেত্রে সচেষ্ট, কর্তব্যপরায়ণ তাদেরকে অবশ্যই এ ধরণের প্রলুব্ধি থেকে সম্পূর্ণরুপে বিরত থাকতে হবে, সাথে সাথে সবসময় আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে যাতে তিনি আমাদেরকে এ ধরণের আকর্ষণ থেকে হেফাজত করেন।

বালকের কোনো অঙ্গকে চুম্বনঃ

বালককে চুম্বন নিষিদ্ধ, এর কারণ সহজেই বোধগম্য। যেখানে দৃষ্টিপাত, স্পর্শ, নির্জনবাস নিষিদ্ধ তখন চুম্বন কীভাবে বৈধ হতে পারে? কীভাবে কেউ এ ধরণের কাজের নিষিদ্ধতা ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে পারে? শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ লিখেছেন,

> *"সুদর্শন বালক অনেক দিক থেকে নারীদের মতই। তৃপ্তি হাসিলের উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের চুম্বন করা উচিত নয়, তবে তার বাবা ও ভাই ব্যতিরেকে, তাদের এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ আছে, তারা বালককে চুম্বন করতে পারে।"*

বাবা ও ভাই এ ধরণের মানসিকতা থেকে মুক্ত, বরং রক্ত সম্পর্ক এমনই সম্পর্ক যে এ ধরণের আত্মীয়তা একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহের দাবী রাখে। তাই

এদের ক্ষেত্রে চুম্বন ভালোবাসা ও স্নেহেরই নিদর্শন। তবে অপরিচিতের জন্য হাতে, চিবুকে, মুখ কিংবা ঠোঁটে অথবা অন্য যেকোনো অঙ্গে আনন্দ নেওয়ার জন্য চুম্বন করা বৈধ নয়।

চুম্বন বৈধ নয়ঃ

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদ এ ধরণের কাজকে সম্পূর্ণ হারাম বলেছেন,

> *"হিদায়াহ কিতাবে এসেছে, একজন পুরুষের জন্য আরেকজন পুরুষের মুখ, হাত ও অন্যান্য অঙ্গে চুম্বন দেওয়া পছন্দনীয় নয়। একটি হাদীছ মোতাবেক নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চুম্বন ও আলিঙ্গন করতে নিষেধ করেছেন।"*

কামনাপূর্ণ চুম্বন নিষিদ্ধঃ

যৌন উত্তেজনার কারণে কিংবা আনন্দ নেওয়ার উদ্দেশ্যে চিবুক, হাত অথবা অন্য কোনো অঙ্গ চুম্বন করা সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ, বিশেষত যদি হয় সুদর্শন কোনো বালকের। কামনা সহকারে এক পুরুষের জন্য আরেক পুরুষের মুখ, হাত ও শরীরের অন্য কোনো অংশের চুম্বন বৈধ নয়। আল্লামা তাহতাবী লিখেছেন যে, কামনা সহকারে চুম্বন করা সকলের ঐক্যমতে হারাম।

সুখানুভবের উদ্দেশ্যে করমর্দন নিষিদ্ধঃ

কামনা নিয়ে চুম্বন যেমন হারাম তেমনি তৃপ্তি হাসিলের জন্য করমর্দনও হারাম। বালকরা এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সৃষ্ট হয়নি। যেসব নারীদের জন্য বিবাহ করা হয়েছে কিংবা যাদের বিবাহ করা যায় তারা এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। করমর্দন কিংবা স্পর্শের মাধ্যমে বালকদের থেকে আনন্দ নেওয়া সকল মুসলিম আলিমগণের মতে হারাম, ঠিক যেভাবে অপরিচিত নারীর আওরাহ স্পর্শের মাধ্যমে আনন্দ নেওয়া হারাম। বরংঞ্চ বেশিরভাগ আলিমই বলেছেন বালকদের মাধ্যমে এমন করাটা অপরিচিত নারীর সাথে করার তুলনায় অধিক গুনাহের।

বালকদের চুম্বনে ক্ষতিঃ

আপনি হয়ত খেয়াল করেছেন কেমন মাত্রায় এর নিষিদ্ধতার বর্ণনা করা হয়েছে। কেনইবা হবে না? এটিই সকল সমস্যার মূল ও অন্যান্যদের তুলনায় এর ক্ষতিও বেশি। অপরিচিত নারী কিংবা বালককে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। তবে বালককে স্পর্শ করা অধিক ক্ষতিকর ও অধিকতর গুনাহের কাজ। এ কারণেই ইমাম গাযালী তাঁর 'ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন' গ্রন্থে লিখেছেন,

> *"বালকদের সাথে যৌন সম্পর্কে জড়ানো অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ। কেননা কোনো নারীকে ভালোবাসলে তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব, কিন্তু কোনো বালককে*

ভালোবাসলে তার সাথে নিষিদ্ধ কাজে জড়ানো ছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকে না, কেননা বালকের মাধ্যমে যৌন তৃপ্তি পাওয়ার বৈধ কোনো উপায় নেই।"

ইমাম গাযালীর উক্তি অনুযায়ী বালকদের দিকে কামনা সহকারে দৃষ্টিপাত করা অপরিচিত মহিলাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকেও অধিক নিষিদ্ধ। কেননা মহিলাকে বিয়ে করা সম্ভব কিন্তু বালকরা এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টই নয়, তাদের সাথে প্রণয়জ্ঞাপন হারাম কাজের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

বালকদের চুম্বন করার ব্যাপারে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মতঃ

এ আলোচনার সমাপ্তি হতে পারে নিম্নোক্ত উক্তির মাধ্যমে,

"সমকামিতা অত্যন্ত গর্হিত পাপ। তাই এ পাপের প্রতি প্ররোচনা দেয় যেমনঃ স্পর্শ, চুম্বন থেকে দূরে থাকা ও তা পরিত্যাগ করাও জরুরী। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কামনাবশত যে কোনো বালককে চুম্বন করলো সে যেন তার মায়ের সাথে সত্তর বার ব্যভিচার করলো।"[১৯]

এ হাদীছটি 'মান্বা' গ্রন্থের লেখক মুখতাসারুল কুদূরীর বরাতে উল্লেখ করেছেন। হাদীছটি সনদ জানা যায় না, তবে আলী জাদার মত লেখক এ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন যাতে বোঝা যায় বর্ণনাসূত্রের দিক থেকে হাদীছটি দুর্বল। চিন্তা করে দেখুন এ হাদীছ মোতাবেক দাড়িবিহীন বালককে চুম্বন করা কতবড় গুনাহ, যা সাগর সমপরিমাণ পানি দিয়েও ধোয়া সম্ভব নয়। যে এ ধরণের সতর্কবাণী জানে তার জন্য কোনো পরিস্থিতিতেই বালকদের নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব নয়, যদি তার মধ্যে সামান্য আত্মসম্মানবোধও থাকে তবে সে এর দিকে প্ররোচনা দিতে পারে এমন সকল কার্যকরণ থেকেই দূরে থাকবে।

সৌন্দর্যের মানদণ্ডঃ

এ অধ্যায় শেষ করার পূর্বে অনেক আলিমগণ কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দ 'সাবিহ ওয়া মালিহ' এর তাৎপর্য বর্ণনা করা প্রয়োজন। সৌন্দর্য ও লাবণ্য কি মুখবর্ণে, রঙে, নাকি বৈশিষ্ট্যে? পূর্ববর্তী আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে এ বয়সে ছেলেদের মাঝে এক ধরণের আকর্ষণীয়তা থাকে তা সে সাদা হোক বা কালো, মামুলি হোক বা জমকালো। মূলকথা হলো সুশ্রী বলতে এমন কাউকে বোঝানো হচ্ছে যে দর্শককে মুগ্ধ করে ও তার কাছে তাকে সুদর্শন মনে হয়। এটি স্বভাব-প্রকৃতি ও রুচির বিষয়। কেউ এক ধরণের লোকদের পছন্দ করে আরেকজন আরেক ধরণের। এ বিষয়ে আলিমগণ লিখেছেন,

"কোনো বালকের 'সাবীহ' হওয়া অর্থ হচ্ছে সে তার দর্শকের কাছে সুশ্রী হবে, যদিও সে বর্ণে কালোই হয়। সৌন্দর্যের সংজ্ঞা ব্যক্তির রুচির উপর নির্ভর করে ও ভিন্ন হয়।"

---

[১৯] আমি হাদীসটির 'গ্রহনযোগ্য' কোনো সনদ খুজে পাইনি। [শারঈ সম্পাদক]

পাঠ ৭।। অর্জন নাকি ধ্বংস

সমকামিতার ফলে ধর্মীয় ও পার্থিব ক্ষতিঃ

পূর্ববর্তী আলোচনায় আপনারা বুঝে গেছেন ইসলাম সমকামিতার ব্যাধিকে কোন পর্যায়ে উপড়ে ফেলেছে। যদি কোনো জনপদে সত্যিই ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রয়োগ করা হত, লোকজন এর উপর পরিপূর্ণভাবে আমল করত তবে মানবীয় স্বভাববোধের উপর এমন বাধা নিষেধের বিশ্বাস ও প্রয়োগের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারত।

ধর্মীয় ও পার্থিব ক্ষতিঃ

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, যখন কোনো ক্ষতিকর কিছুকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তখন সর্বপ্রথম এর প্রারম্ভিক ও প্রাথমিক অবস্থার উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। এরপর সেই ক্ষতিকর বস্তুর অপকারিতা ও কুফল বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। তখন যেয়ে এর কুপ্রভাব ও অসুবিধাসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়। এর প্রারম্ভিক ও প্রাথমিক অবস্থার ব্যাপারে পূর্ববর্তী আলোচনাতে আপনারা যথেষ্ট ধারণা পেয়েছেন। এটি এমনই ব্যাধি যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একে অভিশপ্ত বলেছেন, এছাড়া এ অভিশাপের পর্যায়ও পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। এখন এর ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষতিসমূহ বর্ণনা করা উচিত, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া উচিত এ অভিশপ্ত কাজের বদপ্রভাব কতটা নোংরা ও লজ্জাহীন।

সমকামিতা মানবজাতির প্রতি বড় অবিচারঃ

মনে রাখা দরকার যে বা যারা সমকামিতায় লিপ্ত হয় তারা মানবজাতির প্রতি অনেক বড় অনাচারে লিপ্ত হয়। এ ধরণের কর্ম মানবতার সম্পূর্ণ বিপরীত, বরং তা পশুবৃত্তি থেকেও নিকৃষ্ট। প্রত্যেকেরই জানা আছে আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টিই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, আর তাকে আল্লাহর ইচ্ছার বাহিরে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপঃ যে পশুর গোশত ভক্ষণ করা জায়েজ তার দুধ ও পশমও জায়েজ। কিন্তু কেউ যদি তা যৌন চাহিদা পূরণে তা ব্যবহার করে তবে তাকে কি বলা যায়? কোনো সুস্থ মানুষ এর পক্ষে কি বলতে পারে?

সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ঃ

পুরুষকে যেভাবে তার নারী সঙ্গীর সাথে যৌন চাহিদা পূরণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, প্রকৃতি তাদের উভয়কেই উভয়ের মেলামেশার মাধ্যমে যৌনসুখ দান করেছে

ও মানবজাতির বিস্তারকে নিশ্চিত করেছে। কিন্তু যদি কেউ এর উল্টোটা করে তখন? তখন কেবল একপক্ষ যৌন তৃপ্তি ভোগ করবে আরেকপক্ষ অতৃপ্ত থাকবে, তখন কি তা বৃহদার্থে উভয়ের বিস্তারকে রুখে দেবে না? এতে করে মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। এভাবে তারা তাদের সত্ত্বাগত স্বকীয় আচার-আচরণ, চরিত্র ও তাদের জন্য রব্বানী পরিকল্পনাকে মিথ্যা জ্ঞান করবে।

আল্লাহ্প্রদত্ত নিয়ম-শৃঙ্খলার লঙ্ঘনঃ

প্রাকৃতিক নিয়ম ও মানবসৃষ্টি বন্ধ হোক আর নাই-বা হোক যদি কেউ পুরুষকে নিজের যৌনতার বিষয়বস্তু বানিয়ে নেয় এবং কিছু পুরুষ আত্ম-সম্মানবোধের অভাবে তাতে রাজীও হয়, তবুও মানতেই হয় পুরুষ এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়নি। পুরুষ উদ্দেশ্য হোক কিংবা বিধেয় উভয় অবস্থাতেই সে বিপর্যস্থ হবে, তার জন্য রব্বানী পরিকল্পনা নষ্ট হবে। এহেন কলুষময় কর্মের বিনিময়ে সে এক অভিশাপময় জীবনের অধিকারী হবে।

রব্বানী প্রজ্ঞার ঝলকঃ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী খুব চমৎকার বলেছেন,

> *"পুরুষ ও নারীর সাথে লাওয়াতাতের (পায়ুপথে মেলামেশা) চর্চা আল্লাহর দেওয়া নিয়মের ব্যতয়, এর নিকৃষ্টতম পর্যায় হলো বালকের সাথে মেলামেশা করে যৌনসুখ পাওয়া। কেননা এতে করে উভয় পক্ষেরই সাধারণ নিয়ম থেকে বিচ্যুতি ঘটে। নারীর স্থলে পুরুষকে নিয়ে আসা সবচাইতে নিকৃষ্ট কাজ।"*

আল্লাহর দেওয়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা ও এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যে কতবড় গুনাহ তা তো সবাই-ই বুঝতে পারে। অভিশাপ পড়ুক তাদের উপর! যারা তাদের কাজের মাধ্যমে আল্লাহর দেওয়া রীতি-নীতিকে বদলে ফেলার চেষ্টা করে ও মানবতাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যেতে চায়।

মানুষ যখন শুকর ও গাধার পর্যায়ে নেমে আসেঃ

কতটা নির্লজ্জ সে ব্যক্তি যে কিনা এ ধরণের বিকৃতকাজ করতে রাজী হয় ও এতে আসক্ত হয়ে পড়ে। নিকৃষ্ট জানোয়ারদের মধ্যেও পুরুষে পুরুষে মেলামেশা করার নিয়ম নেই, এমনকি কুকুরও এই কাজে অভ্যস্ত নয়। 'শারহ শিরাতুল ইসলাম' এ আছে,

> *"ইবনু সিরীন বলেছেন কোনো পশুর মাঝে সমকামিতার অভ্যাস নেই একমাত্র শুকর ব্যতীত' 'মাসাবীহ' ও 'শারহ মাশারিক' এও একই ধরণের উক্তি এসেছে।"*

শুকরের মত কৃপণঃ

অন্যকথায়, যে পুরুষ সমকামিতায় আসক্ত হয়ে পড়ে তারা শুকর ও গাধার মত বিকৃত অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যায়। 'মাজালিসুল আবরার' গ্রন্থের লেখক লিখেছেন,

> *"সমকামিতার প্রতি যার চিত্তবৃত্তি রয়েছে সে অধঃপতন, হীনতা, মূর্খতা ও দুর্নামের দিক থেকে শুকর ও গাধা সদৃশ হয়ে যায়।"*

কুরআনে লূতের (আলাইহিস সালাম) জাতি সম্পর্কিত যে বর্ণনা এসেছে তাতে বোঝা যায় সমকামীরা বেহায়া শুকর ও মূর্খ গাধার চাইতেও নিম্নস্তরের। তাদের দুষ্কর্মের কারণে মানবজাতির সম্মান ও মর্যাদা যেরূপ হীনতার শিকার হয়েছে তার দ্বিতীয় আরেকটি দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

বারযাখের জীবনে সমকামীদের শুকরের রূপ পাওয়াঃ

সম্ভবত এই কারণেই আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদি.) বলেছেন, যা আগেও বর্ণনা করা হয়েছে, যদি সমকামী তাওবাহ না করেই মৃত্যুবরণ করে তবে কবরে তার চেহারা শুকরে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে।[২০] যদিও আলিমদের কেউ কেউ এ মতকে দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন। ফাতাওয়া হাদিছিয়্যাহ'তে একই রকম হাদীছ নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণিত হয়েছে,

> *"সমকামীদের চেহারা শুকরের চেহারায় পরিবর্তন করে দেওয়া হবে।"*[21]

এ হাদীছ আবুল ফাতাহ আজদী তার 'কিতাবুদ্ব দ্বুআফা' তে বর্ণনা করেছেন ও ইমাম ইবনুল জাওযী একে অনির্ভরযোগ্য বলে মত দিয়েছেন।

কিয়ামতের দিন লূতের (আলাইহিস সালাম) জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়াঃ

একটি হাদীছ মোতাবেক সমকামীদের লূতের (আলাইহিস সালাম) জাতির সাথে একত্রিত করে হিসাব নেওয়া হবে। এটাই হওয়া যুক্তিসংগত, কেননা দুনিয়ার জীবনে তারা লূতের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাতির পথই অনুসরণ করেছে, তাদের কাজকারবারই তাদের পছন্দ ছিলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> *"আমার উম্মতের যে ব্যক্তি লূতের জাতির মত কাজে লিপ্ত থেকে মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ তাকে তাদের দিকেই স্থানান্তরিত করবেন যতক্ষণ না তাদের সাথে তাকে একত্রিত করছেন।"*

যখন জিজ্ঞেস করা হলো এ হাদীছের বর্ণনাকারী সম্পর্কে তখন উত্তর দেওয়া হলো,

---

[২০] এই বর্ননাটি গ্রহণযোগ্য নয়। [শারঈ সম্পাদক]

[২১] এই বর্ননাটিও পূর্বের বর্ননার ন্যায় অগ্রহণযোগ্য। [শারঈ সম্পাদক]

"খতীব তার 'তারিখ' গ্রন্থে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং স্বীকার করেছেন এর মধ্যে এমন একজন বর্ণনাকারী আছে যে হাদীছে অবিশ্বাসী ছিলো। তবে এ হাদীছটি ওয়াকী'র সূত্রে ইবনু আসাকির বর্ণিত বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন, আমার এ হাদীছ শুনেছি 'যে সমকামীরুপে মৃত্যুবরণ করবে তাকে কবরে লূতের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাতির লোকদের সাথে নেওয়া হবে এবং সে কিয়ামতের দিনও তাদের মতই ভাগ্যবরণ করবে।"

হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিমের ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত ফেরেশতারা যখন তাদের আত্মা কবজ করতে আসবে তখন তাদের আত্মা তাদের সমমনা সমকামী ভাই ও লূত জাতির লোকদের শাস্তির স্থানে স্থানান্তরিত হবে। তারপর তাদের আত্মা লূতের (আলাইহিস সালাম) জাতির লোকেদের আত্মার সাথে অত্যন্ত সংকীর্ণ একটি স্থানে চলে যাবে, যার তীব্রতার দিক থেকে ব্যভিচারীদের চুল্লি থেকেও অধিক ভয়ানক।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার বলেছেন,

"লূতের (আলাইহিস সালাম) জাতির লোকেরা কিয়ামতের দিন বানর ও শুকরমুখো হয়ে উঠবে।"

যারা এ অভিশপ্ত কর্মের সাথে জড়িত আছে কোনো না কোনোভাবে তাদের একবার ভেবে দেখা উচিত কেন তারা নিজেদের আখিরাতের জীবনকে এভাবে নষ্ট করছে? কেন তারা লূতের (আলাইহিস সালাম) জাতির মত শাস্তি ভোগ করবে? সেই জাতি যাদেরকে প্রস্তরাঘাত করা হয়েছিলো, যাদের উল্টিয়ে ফেলা হয়েছিলো, তাদেরকে লাঞ্চনাস্বরুপ এমন এক দুর্গন্ধময় সাগরে ফেলা হলো যার বদবুর কারণে পরবর্তীতে এর পানি কিংবা এর আশেপাশের কোনো কিছুকেই কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়নি? (ফাতহুল বারী, পৃ-২৯৭, খ-৪)

কুরআনে লূতের (আলাইহিস সালাম) জাতির ঘটনা বারেবারে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যাতে এ জঘন্য কাজের সাথে জড়িত সকলে শিক্ষা নিতে পারে, যাতে কেউ ভুলের ঘোরেও এ কাজে জড়িত না হতে পারে, যার ভার না যমিন নিতে পারে না আসমান বহন করতে পারে, শেষমেষ আল্লাহর ক্রোধ যার উপর অবধারিত হয়ে পড়ে।

ভূপৃষ্ঠের রোদনঃ

সমকামিতা এমনই অভিশপ্ত কর্ম যে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত এর দুষ্কর্মতা ও এর জঘন্যতার দুর্গন্ধে চিৎকার করে বলে ওঠে, 'এ কেমন অমানবিক কাজ করা হচ্ছে আমার পৃষ্ঠে'

মুহাম্মাদ বিন মাদখাল বলেছেন যে, তিনি আব্বাস দুরীকে বলতে শুনেছেন,

> *"যখন একজন পুরুষ আরেক পুরুষের সাথে চড়াও হয় তখন পৃথিবী বিলাপ করে বলে তার উদরে এ কি হচ্ছে?"*

জাহান্নামে সমকামীদের নিয়ে ফেরেশতাদের মাঝে আলোড়নঃ

এ অপকর্মের ক্লেশ পৃথিবীকে বিশৃঙ্খল করে তোলে, যখন মানুষ শুকর ও গাধায় পরিবর্তিত হয়ে যায় ও মানবীয় সম্মানকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এখানেই শেষ নয়। এ শয়তানী দুষ্কর্ম আসমান ও জমিনে আলোড়ন তৈরী করে। ফেরেশতারা সচল হয় ও জাহান্নামের আগুন নিক্ষেপ করা হয় তাদের দিকে। হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম লিখেছেন,

> *"কোনো কোনো আলিমগণ বলেন, যখন কোনো পুরুষ আরেক পুরুষের সাথে শারিরীক সম্পর্ক স্থাপন করে তখন তাদের নিকট থেকে ফেরেশতারা পলায়ন করে, পৃথিবী তার রবের কাছে অভিযোগ পেশ করে, অনবরতভাবে তাদের উপর ক্রোধ বর্ষিত হতে থাকে। অভিশাপ তাদেরকে ঘিরে ফেলে ও শয়তান তাদেরকে ঢেকে রাখে। পৃথিবী তাদেরকে নিমজ্জিত করার জন্য তার রবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, আকাশ ভারী হয়ে ওঠে, জাহান্নামের আগুন নিক্ষেপ করা হয় তাদের দিকে।"*

সমকামীদের অপরিমেয় অপবিত্রতাঃ

মুজাহিদ বলেছেন, "এ অভিশপ্ত (সমকামী) ব্যক্তি সকল অপবিত্র বস্তু থেকেও অধিক অপবিত্র। তার অপবিত্রতার শেষ নেই।"

> *"যে পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে সে অপবিত্র থাকে যদিও তার পবিত্রতার জন্য পানির শেষ ফোঁটাও বিদ্যমান থাকে, যতক্ষণ না সে তাওবাহ করে।"*

ইবনুল জাওযী ফুদ্বাইল ইবনু জাওযীর উক্তি বর্ণনা করেছেন,

> *"যদি সমকামী সকল পানি নিজের শরীরে প্রবাহিতও করে দেয় তবুও সে তখন অপবিত্র থাকবে যখন সে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে।"*

আলকামা (রাহি.) আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের (রাদি.) উক্তি বর্ণনা করেছেন,

> *"যতক্ষণ পর্যন্ত গুনাহগার তাওবাহর সুযোগ না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত তার কলুষতা দূর হয় না।"*

সমকামিতা এমনই এক অভিশাপ যে, এর সাথে নোংরামী ও আবিলতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যা কোনোভাবেই দূর করা সম্ভব নয়। আর এ কারণেই লূতের (আলাইহিস সালাম) জাতির জনপদকে উল্টিয়ে ফেলা হয়েছিলো।

আখিরাতে সমকামীদের শাস্তিঃ

আবু হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস সূত্রে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি খুতবায় বলেছেন,

> *"যে কোনো মহিলা, বালক অথবা পুরুষকে অপব্যবহার করবে সে কিয়ামতের দিন দুর্গন্ধময় মৃত শরীর থেকেও অধিক দুর্গন্ধ নিয়ে উত্থিত হবে। মানুষজন সেই দুর্গন্ধে চরম দুর্ভোগে পড়ে যাবে যতক্ষণ না তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ তার সমস্ত নেক আমলকে সমূলে নাশ করে দেবেন, তার জন্য কোনো প্রকার সুপারিশ কবুল করবেন না। তাকে লোহার নখরযুক্ত এমন এক আগুনের বাক্সে রাখা হবে যা তার মুখমন্ডল ও শরীরে বিঁধবে।"*

আবু হুরায়রা বলেন,

> *"এমন শাস্তি তাদের হবে যারা তাওবাহ করেনি।"*

পূর্ববর্তী একজন নবীর ঘটনাঃ

ইবনু হাজার হাইছামী তার 'জাওয়াজির' কিতাবে ঈসার (আলাইহিস সালাম) বিষয়ে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, একদিন ঈসা (আলাইহিস সালাম) কোথাও যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে তিনি একটি জায়গায় উত্তপ্ত আগুন ও একজন মানুষকে তাতে জ্বলতে দেখলেন। তাঁর দয়া হলো। তিনি আগুনের উপর পানি ঢেলে দিলেন যাতে আগুন নিভে যায়। তিনি দেখলেন আগুন একটি সুদর্শন বালকে ও আগুন একজন পুরুষের রুপ নিলো। আল্লাহর নবী এতে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি আল্লাহর কাছে তাদের আসল রুপে ফেরত দেওয়ার দুআ করলেন যাতে তিনি আসল বিষয়টি বুঝতে পারেন। আল্লাহর দয়ায় তারা তাদের আসল রুপ ফেরত পেলো। সেই পুরুষ ও একটি সুদর্শন বালক বের হয়ে আসলো। তিনি তাদেরকে এরুপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। পুরুষ লোকটি বলা শুরু করলো। আমি এই ছেলেটিকে ভালোবাসতাম। কামনায় অন্ধ হয়ে আমি ছেলেটির সাথে যৌনকর্ম করে ফেলি। আমরা উভয়েই যখন মারা গেলাম আমাদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিলেন। এ কারণে আমি একবার আগুনে পরিণত হয়ে তাকে জ্বালাই, আরেকবার সে আগুন হয়ে আমাকে জ্বালায়। এভাবেই আমাদের শাস্তি চলতে থাকবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত। (রাওদ্বাতুল মুহিব্বীন)

চরম লজ্জাহীনতাঃ

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক হলো যে বালক অথবা পুরুষ যৌনবস্তুরুপে মহিলাদের অবস্থান গ্রহণ করতে সম্মত হয় তার স্বীয় মর্যাদা ও সম্মান কোথায় যে গায়েব হয় তা সে নিজেও

বুঝতে পারে না। সে মানবজাতি হিসেবে নিজের সম্মানের পোষাক শরীর থেকে খুলে ফেলে, শেষমেষ নৈতিকভাবে মৃততে পরিণত হয়, যদিও সে শারীরিকভাবে জীবিত থাকে। সে কীভাবে এ ধরণের কাজে সম্মত হতে পারে যেখানে তার নিজের যৌন চাহিদা নিবারণ হয় না, আর না সে কোনো প্রকার সুখানুভূতি পায়। আত্মমর্যাদার দাবী এ ধরণের অভিশপ্ত কাজে জড়ানোর চাইতে মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> *"চার ধরণের ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর স্থায়ী ক্রোধের মধ্যে বসবাস করে এবং ফেরেশতারা আমিন বলে। এদের মধ্যে একজন সে যে পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও নারীর বেশ ধারণ করে।"*

আবু আম্মা থেকে বর্ণিত, নবী (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

> *"চার ধরণের ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর স্থায়ী ক্রোধের মধ্যে বসবাস করে এবং ফেরেশতারা আমিন বলে। এদের মধ্যে একজন সে আল্লাহ যাকে পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করা সত্ত্বেও সে নারীর বেশ ধারণ করে এবং তার সঙ্গী হয়ে যায়।"*

সমকামিতা সম্পর্কে যা যা উল্লেখ করা হলো তা খুব মনোযোগের সাথে পাঠ করা চাই যাতে বুঝে আসে এটি মানবীয় সম্মানবোধের জন্য কতবড় হুমকি, আর সমাজে এ কাজের কেমন প্রভাব পড়ে। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এটি তখনই হবে যখন কেউ সমকামিতাকে হারাম মনে করে বিশ্বাস করে, কিন্তু যদি কেউ এ কাজকে হালাল বা বৈধ মনে করে তবে সে আর মুসলিম থাকতে পারে না।

দুনিয়াবী ক্ষতিঃ

ডাক্তার ও চিকিৎসকগণ সমকামিতার অপকারিতায় অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া এর কুফল এখন সকলের কাছে অতিব পরিষ্কার।

মানবজাতির সমাপ্তি ও স্বাস্থ্যভঙ্গঃ

সমকামিতার প্রথম কুপ্রভাব হলো এতে মানবজাতির স্বাভাবিক বংশবিস্তার প্রক্রিয়া লঙ্ঘিত হয়, যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এতে করে আল্লাহর দেওয়া অমূল্য উপহার সমূলে নষ্ট হয়ে যায়। যে কারণে আল্লাহ মানুষের মাঝে জোড়া সৃষ্টি করেছেন সে প্রজ্ঞা বাস্তবায়িত হতে পারে না। পাশাপাশি চিকিৎসকরা এ ধরণের কাজকে শরীরের জন্যও অত্যন্ত ক্ষতিকর বলেছেন। কেননা নারীর গুপ্তাঙ্গ পুরুষের লিঙ্গ ধারণের উপযোগী। তাই পুরুষ নারীর সাথে যৌন সম্পর্কের কারণে তৃপ্তি পায়। কিন্তু সমকামিতায় এমন বিষয় একেবারেই নেই। প্রকৃতির বিরোধী হওয়ায় এখানে সঙ্গীর

গুপ্তাঙ্গ আরেক সঙ্গীর লিঙ্গ ধারণ করতে পারে না। এ অভিশপ্ত কাজ বিরক্তি, অসুখ ও জড়তা নিয়ে আসে যা মানব শরীরের এত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে ধীরে ধীরে অকেজো করতে করতে একসময় পুরোপুরি নপুংশকতার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

অসুস্থতার ঝুঁকিঃ

নির্বাহকের শুক্র নির্গত হলেও অপর পুরুষ সঙ্গী তাকে শোষণ করতে পারে না। বীর্য সম্পূর্ণ নির্গত না হয়ে আটকে থাকে শরীরে। এর ফলে পচন ধরা শুরু করে যার চূড়ান্ত পরিণতি পুরুষের অসুস্থতায় যেয়ে ঠেকে।

অন্তর্বেদনাঃ

সমকামিতার মাধ্যমে কোনো সঙ্গীই পরিপূর্ণ যৌনসুখ সম্ভোগ করতে পারে না, বরং তা উভয়ের জন্য দুর্দশা ও পীড়নের কারণ হয়। তাদের মুখমন্ডলের কদর্যতা বৃদ্ধি পায় ও মানুষ তাদের অপছন্দ করা শুরু করে। অন্তর ও মুখমন্ডলের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পায়, হুরদয় কালিমায় ঢেকে যায়। ঘৃণাবোধ ও মানসিক অশান্তি হয় তাদের নিত্যসঙ্গী। উভয়ের মধ্যে কোনো প্রকার ভালোবাসা ও হৃদ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অভিশপ্ত অভ্যাস তাদের দুজনকেই বাধ্য করে কাছে আসতে।

নৈতিকতার অধঃপতনঃ

নৈতিকতার প্রভেদ আস্তে আস্তে মিটে যেতে থাকে। নৈতিক পীড়ন, নীচতা ও খলতা সেই স্থান দখল করে নেয়। ধার্মিকতা ও তাকওয়া বিদায় নিতে থাকে উভয় থেকেই, দুজনেই নৈতিক ক্ষয়িষ্ণুতার শিকার হয়। তারা ধার্মিকতার নাম শুনলেও ভীত হয়, এভাবেই তারা নিজেদেরকে এ শয়তানী অভ্যাসে অভ্যস্ত করে ফেলে। দ্বীনের নেয়ামত তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। ক্ষয় ও প্রতিশোধপরায়ণতা তাদের ঘিরে ধরে। আর এসকল কিছুর আলামত তাদের মাঝে দৃশ্যমান হয়। বিস্তারিত জানতে হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিমের 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থ দেখুন। সংক্ষেপে মানুষ যখন বাঁকা পথে ধরে তখন তার নিজের প্রকৃতিও বক্র হয়ে যায়, বিকৃত হয়ে যায় স্বাভাবিকতা, তা রূপ নেয় পশুবৃত্তিতে বরং তার চাইতেও নিকৃষ্ট কোনো কিছুতে।

অভিশাপের ফলঃ

পশুমূলক আচরণ কেনই বা প্রকাশ পাবে না যেখানে সমকামিতা সবচাইতে নিকৃষ্ট কাজ, বরং তা পশুর নিকৃষ্টতাকেও হার মানায়। উভয়কেই ভেবে দেখা উচিত তারা সামান্য আনন্দের জন্য যা করছে তা এতটাই ঘৃণ্য ও কলংকময় যে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সকল সাগরের পানিও তার পাপকে ধৌত করতে পারে না। এহেন নোংরা

কাজ তার স্বাভাবিক আচার-আচরণে দগদগে ঘা হয়ে রয়ে যাবে আজীবন। এ কারণেই ইমাম রাজী লিখেছেন, নির্বাহকের জন্য অপর সঙ্গীর মনে এতটাই ঘৃণার বিষবাষ্প থাকে যে যখনই সে তাকে দেখে সে ফুঁসে ওঠে। অনেক সময় সে তাকে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় দিয়ে দেওয়ার জন্য মেরে ফেলার চেষ্টা পর্যন্তও করে।

সমকামীদের স্ত্রীদের অবস্থাঃ

সমাজের এ অভিশপ্ত অংশ সমকামীদের কথা একবার চিন্তা করে দেখুন। একদিকে তারা নিজেরাই স্বাস্থ্যভঙ্গ করে ফেলে আরেকদিকে নিজেদের ও নিজেদের পরিবারের জন্য দুর্নাম কুড়িয়ে আনে। তারা কেবল সমকামিতাতেই নিজেদের তৃপ্তি পায়, স্বাভাবিকভাবে নারীদের প্রতি আকর্ষণ তাদের একেবারেই মৃত হয়ে যায়। যদি এভাবেই চলতে থাকে তাদের স্ত্রীরা ব্যভিচারের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাও সেসকল যুবকদের সাথেই যাদের সাথে তার স্বামী সমকামিতার অভিশাপে জড়িত হয়। সাধারণ প্রতিশোধ যা সে ভোগ করে। যদিও সে এসব জানে, তবুও তার নির্লজ্জতার কারণে তার আত্মমর্যাদা জেগে উঠতে পারে না। সে এমন এক ভূমিকা পালন করতে থাকে যার সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> *"দাইয়ুছ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"*[২২]

অপর সঙ্গীর অবস্থাঃ

এটা হলো সমকামিতার নির্বাহক ও তার স্ত্রীর অবস্থা। একই রকম অবস্থা হয় তারও যে সমকামিতার বিষয়বস্তু বলে গণ্য হয়, যার উপর এ চরম নির্লজ্জ কাজ প্রয়োগ করা হয়। এ নপুংশকও তার নির্বাহকের মতই অনুভূত করে। সে তার স্ত্রীর সাথে সেই আনন্দ পায় না যা সে এ নোংরা কাজ থেকে পায়। তার স্ত্রীও অন্য কোনো পুরুষের সান্নিধ্যে যেতে বাধ্য হয়। তবে আল্লাহ চাইলে তারাও এ পথ থেকে ফিরে আসতে পারে। পরিণতিতে স্বামীদের অসদ্ব্যবহারের কারণে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নপুংশকের সাথে বিয়েঃ

এসকল কারণেই আলিমগণ লিখেছেন নপুংশককে বিয়ে করা অনুচিত। সেই পুরুষের সাথে মহিলার বিয়ে কীভাবে হতে পারে যে পুরুষের স্বাভাবিক ও প্রকৃতিসিদ্ধ যৌন চাহিদার চিহ্ন মুছে গেছে, মহিলাদের মতই আরেক পুরুষের যৌনক্ষুধা মেটানো যার স্বভাবসিদ্ধ হয়ে গেছে! এ ধরণের লোকের কারণে তার পরিবারের সম্মান ও সুনাম নষ্ট হয়, এ কারণে বাগধারায় আছে,

---

[২২] সুনানে নাসাঈ, হাঃ ২৫৬২ ; ইমাম বাইহাক্বী, শু'আবুল ইমান, হাঃ ১০৩০৯। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

"তাকওয়া ও ধার্মিকতা দেখো যাতে তোমার স্ত্রী ও সন্তানরা ধার্মিকতার সাথে বাঁচতে পারে।"

ইসলামের দৃষ্টিতে সমকামীদের শাস্তিঃ

বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত সমকামিতায় লিপ্ত উভয় পক্ষের ব্যাপারে আলিমদের ইজমা হলো তাদেরকে হত্যা করা হবে, কেননা নির্লজ্জতার দিক থেকে সমকামিতা ব্যভিচারকে হার মানায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> *"যাদেরকেই তোমরা সমকামিতায় লিপ্ত হতে দেখো তাদের উভয়কেই হত্যা করো।"*[২৩]

হত্যা করাঃ

হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম লিখেছেন এ হাদীছটি বুখারীর শর্ত মোতাবেক সহীহ। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল এ হাদীছটিকে সমকামীদের হত্যা করার ব্যাপারে তার মতামতের প্রমাণ হিসেবে এনেছেন। আবু বকর সিদ্দীক, আলী, খালিদ ইবনু ওয়ালিদ, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাঈর, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, খালিদ ইবনু যাঈদ, আব্দুল্লাহ ইবনু মুআম্মার প্রত্যেকেই এ মতের সাথে একমত। রাবিআহ ইবনু আব্দুর রহমান, ইমাম মালিক, ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলও একমত। ইমাম শাফিঈর মতামতও এরকমই।

ব্যভিচারের শাস্তির সাথে সাদৃশ্যঃ

পূর্ববর্তী কারো কারো মত হলো সমকামীদের শাস্তি ব্যভিচারীদের মত একইরকম হবে। তাদের শাস্তিতে কোনো পার্থক্য নেই। যদি তারা অবিবাহিত হয় তবে একশত বেত্রাঘাত ও বিবাহিত হলে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। আতা ইবনু আবী রাবাহ, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, ইব্রাহীম নাখঈ, কাতাদাহ, ইমাম আওযাঈ, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ সহকারে ইমাম আহমাদ ও ইমাম শাফিঈ থেকে এ ধরণের মতামত পাওয়া যায়।

এহেন শাস্তি ও এর ন্যায্যতা প্রতিপাদনঃ

আবার আবার কেউ ব্যভিচারের শাস্তি ও সমকামীদের শাস্তির মাঝে প্রভেদ করেন। তারা ব্যভিচারের জন্য হাদ্দে বিশ্বাস করলেও সমকামিতার ব্যাপারে তারা কেবল সতর্ক করার পক্ষপাতী। তারা বলেন কুরআনে ব্যভিচারের শাস্তির কথা স্পষ্ট বর্ণিত হলেও

---

[২৩] সুনানে আবু দাউদ, হাঃ ৪৪৬২ ; সুনানে তিরমিযী, হাঃ ১৪৫৬ ; মুসনাদে আহমাদ, হাঃ ২৭৩২ ; সুনানে ইবন মাজাহ, হাঃ ২৫৬১। শাইখ আলবানী ও শাইখ আহমাদ শাকির হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

সমকামিতার শাস্তির ব্যাপারে স্পষ্ট বলা নেই, তাই এর শাস্তি শাসকদের উপর নির্ভর করে। শাসক চাইলে সমকামীকে হাতির নিচে পিষে, আগুনে পুড়িয়ে, পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে, দুর্গন্ধময় স্থানে বন্দী করে শাস্তি দিতে পারেন। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম হাকিমের মত এরকম।

সাহাবীদের ঐক্যমতঃ

তাই সংক্ষেপে বলা যায় যে, কেউই হত্যা করার বিরোধী নয়, তবে হত্যা করার পদ্ধতি বিষয়ে মতবিরোধ আছে। ইবনু হাজার হাইছামী লিখেছেন,

> *"সাহাবাগণ সমকামীর হত্যার ব্যাপারে একমত হয়েছেন, তাদের মাঝে হত্যা কীভাবে করা হবে তা নিয়ে মতবিরোধ হয়েছে।"*

হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম লিখেছেন,

> *"এ অপকর্মকারীর (সমকামীর) শাস্তি ব্যভিচার থেকেও বেশি কেননা সাহাবাগণ এ বিষয়ে একমত, এর নিষিদ্ধতার মাত্রা অধিক এবং এর ক্ষতি অধিক বিস্তৃত। এ কারণে লূতের জাতিকে কবরে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা অন্য কোনো জাতিকে এর পূর্বে দেওয়া হয়নি।"*

জাতির জন্য স্থায়ী অভিশাপঃ

সমকামীদের শাস্তি ভয়ানক হওয়াই স্বাভাবিক কেননা তারা আল্লাহর ক্রোধের মাঝেই জীবনাতিপাত করে এবং এ অভ্যাস অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত হয়ে যায়, হোক সে নির্বাহক কিংবা যার উপর নির্বাহকার্য চালানো হয়। এ ধরণের লোকেরা তার জাতি ও লোকেদের জন্য স্থায়ী আপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যদি এদেরকে যথাযথভাবে প্রতিরোধ না করা হয় তবে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সাহাবাদের যুগে সমকামীদের শাস্তিঃ

নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে সমকামীদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে এমন কোনো প্রায়োগিক নজির দেখা যায় না, কারণ তাঁর যুগে এমন কোনো ঘটনা ঘটে নি। সাহাবাদের যুগে সমকামী ও তাদের শাস্তির বিষয়টি উঠে আসে। সাহাবী খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাদি.) ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকরকে (রাদি.) চিঠি লিখে জানান যে, আরবে এমন একজন পুরুষকে পাওয়া গেছে যাকে মহিলাদের মত যৌনকাজে অর্থাৎ, সমকামিতার কাজে ব্যবহার করা হয়। ইসলামী জগতে এমন সমস্যা প্রথমবারের মত দেখা দেওয়ায় আবু বকর (রাদি.) অন্যান্য সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন সমকামিতার শাস্তি বিষয়ে। সেখানে আলী (রাদি.)ও উপস্থিত ছিলেন, তিনি

সমকামিতার অত্যন্ত কঠিন শাস্তি বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন, "সকল জাতির মাঝে একমাত্র লূতের (আলাইহিস সালাম) জাতিই এ ধরণের কাজে আসক্ত ছিলো, আল্লাহ তাদেরকে কি শাস্তি দিয়েছিলেন তা আপনার সামনেই আছে, তাই আমার মতে এদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হোক।" সকল সাহাবীই একমত পোষণ করলেন। আবু বকর (রাদি.) খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে (রাদি.) লিখে দিলেন তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার জন্য। খালিদ ইবনু ওয়ালিদ (রাদি.) চিঠি পেলে এ শাস্তি প্রয়োগ করলেন। ইবনু যুবাঈর ও হিশাম বিন আব্দুল মালিকের সময় এ ধরণের পরিস্থিতি উদ্ভূত হলে তারাও আগুনে পুড়িয়ে মারার শাস্তিই বহাল রেখেছিলেন।

ইমাম আযমের মতে সমকামিতার শাস্তিঃ

ইমাম আযম যেহেতু সমকামিতার শাস্তি হিসেবে তা'যিরের (সতর্কতা) কথা বলেছেন তাই এতে যাতে কেউ মনে না করে নেয় যে, তাঁর নিকট সমকামিতা কম খারাপ। তিনি পরিষ্কার বলেছেন সমকামিতার নিষিদ্ধতা ব্যভিচার থেকেও অধিক। তবে যেহেতু সমকামিতার শাস্তি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়নি তাই তিনি ব্যভিচার ও সমকামিতার মাঝে পার্থক্য করেন। ইমাম আযমের মতামত নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন। কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী লিখেছেন,

> *"ইবনুল হুমাম বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু হানিফার মতে লূতীদের (সমকামীদের) জন্য হদ্দ বা কোনো শাস্তি নির্ধারিত নেই, তবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত জেলে রাখতে হবে।"*

সমকামিতা পুনরাবৃত্তির শাস্তিঃ

ইমাম আবু হানিফা এ ধরণের কাজের শাস্তির কথাও এড়িয়ে যান নি। তিনি শাস্তি ঘোষণার পরপরই তাদেরকে বন্দী করার কথা বলেছে। যদি সে তার এ অভিশপ্ত অভ্যাস পরিত্যাগ না করে তখন ইমাম সাহেব মতামত দেনঃ

যদি সে সমকামিতার প্রতি আসক্ত হয় তবে ইমামের উচিত তাকে হত্যা করা। হত্যা করা বা না করা বিষয়ে উভয় পক্ষই একমত, সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত যেমনটা ইবনুল হুমাম ব্যাখ্যা করেছেন। যদি সে আসক্ত হয় তবে ইমামের উচিত তাকে হত্যা করা। আসক্তি স্থায়ী হওয়ার জন্য বছরকে বছর অপেক্ষা করার দরকার নেই, কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করাই যথেষ্ট। যখন কেউ বারবার সতর্ক সত্ত্বেও সমকামিতার প্রতি আসক্ত থাকে তবে যেকোনো উপায়ে তাকে হত্যা করা যেতে পারে।

পুনরাবৃত্তির শর্তঃ

ইমাম আবু হানিফার মাযহাব যুক্তিহীন নয়। বরং হত্যার প্রমাণ তিনি পূর্বে উল্লেখিত হাদীছ থেকেই গ্রহণ করেছেন। কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী লিখেন,

"হাদীছের শব্দ 'যে করে' শব্দ থেকেই পুনরাবৃত্তির যুক্তি নেওয়া হয়েছে, এতে অতীতসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়নি কেননা তা হলে এর দ্বারা এর সম্পাদন (একবারের জন্য) বুঝাত। ইমাম আবু হানিফা এহেন যুক্তি গ্রহণ করার পক্ষে।"

তাহলে বুঝা যাচ্ছে ইমাম আবু হানিফা সমকামীদের শাস্তি লঘু করার পক্ষে এই কারণে নন যে তাঁর কাছে সমকামিতা বড় কোনো অপরাধ নয়। বরং তিনি উক্ত হাদীছের উপর ভিত্তি করেই তাঁর মত দিয়েছেন। তাছাড়া কাযী সানাউল্লাহ নিজেই লিখেছেন সমকামিতা ব্যভিচার থেকেও নিকৃষ্ট গুনাহ। ব্যভিচার বিয়ে করার পর ঘুচে গেলেও সমকামিতা কোনোভাবেই নিবারিত হয়না।

বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিঃ

শাস্তির ভিন্নতার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক একটি যুক্তি আছে। ব্যভিচার সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য (যেহেতু নারী-পুরুষের মাঝে ব্যভিচার সংঘটিত হয়) হলেও ধর্মতত্ত্বে এর নিষিদ্ধতা আছে, আর যৌক্তিকভাবেও এর নিষিদ্ধতার সিদ্ধান্তই আসে। কিন্তু সমকামিতা ধর্মতাত্ত্বিক ও যৌক্তিক, কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং সমকামিতা ঘৃণা ও নোংরামীর অনুভূতি নিয়ে আসে। যা ব্যভিচারের ক্ষেত্রে ঘটে না। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝা যায়। মদ, প্রস্রাব ও মল খাওয়া অথবা পান করা নিষিদ্ধ। তবে মদ পান করার সময় মানুষ ততটা ঘৃণাবোধ করে না যতটা করে প্রস্রাব খাওয়ার সময়। এ কারণে শরীয়তে মদ পান করার নির্ধারিত শাস্তি থাকলেও প্রস্রাব পান ও মল ভক্ষণের কোনো নির্ধারিত শাস্তি নেই। তেমনি মানুষ নফসের তাড়নায় ব্যভিচারের প্রতি আসক্ত থাকলেও সমকামিতার প্রতি মানুষ আসক্ত হতে পারে না যতক্ষণ না সে পরিপূর্ণ বিকৃত মানসিকতার না হয়ে যাচ্ছে। হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম এ বিষয়ে লিখেছেন,

> *"কোনো কোনো আলিম সমকামিতার নির্ধারিত শাস্তির পক্ষপাতী নন। কারণ মানুষের মাঝে স্বাভাবিকভাবেই এসকল কাজের প্রতি বিতৃষ্ণা কাজ করে বিধায় প্রত্যেকেই এ কাজকে ঘৃণা করে। আর এ সকল বিষয়ের রোধের জন্য শরীয়ত শাস্তির প্রয়োজন বোধ করে না, যেমনটা ময়লা, মৃতদেহ ভক্ষণ কিংবা প্রস্রাব ও রক্ত পান, সেসব ক্ষেত্রে শরীয়ত কোনো শাস্তি নির্ধারণ করেনি।"*

আরেকটি যুক্তিঃ

শাস্তির ভিন্নতা বিষয়টি অনেক আলিমই ভিন্ন ভিন্নভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন ইমাম আবু হানিফা সমকামিতার শাস্তির কথা এ কারণেই বলেন নি, কেননা অপরাধের শাস্তি শাস্তিপ্রাপ্তকে পরিশুদ্ধ করে, শাস্তি দেওয়ার পর সে নিষ্পাপ হয়ে যায় এবং অধিক সম্ভাবনা আছে সে আখিরাতের শাস্তি থেকেও অনেকখানিই বেঁচে যাবে। যেহেতু সমকামিতা প্রকৃতিগতভাবেই ব্যভিচার থেকে নিকৃষ্ট তাই এর শাস্তি একমাত্র আখিরাতেই দেওয়া হবে, দুনিয়াতে এর শাস্তি দেওয়া অনুচিত। আল্লামা শামী লিখেছেন,

> *"'বাহরুর রায়িক' গ্রন্থে বলা আছে সমকামিতার পাপ ব্যভিচার থেকে বেশী। সমকামিতাকে প্রত্যেকেই এর প্রকৃতি, যুক্তি ও দ্বীনের দিক থেকে নিষিদ্ধ করেছে। অন্যদিকে ব্যভিচার মানবীয় প্রকৃতির দিক থেকে নিষিদ্ধ নয়। তাছাড়া ব্যভিচারের নিষিদ্ধতা বিবাহের মাধ্যমে কিংবা দাসী হিসেবে অর্থ পরিশোধ করলেই ঘুচে যায়। তবে সমকামিতার ক্ষেত্রে এমন কোনো সমাধান বিদ্যমান নেই। ইমাম আবু হানিফার মতে সমকামিতার শাস্তি নির্ধারণ না করার কারণ এমন নয় যে এটি লঘু পাপ, বরং এটি বেশী কদর্য। আর একটি মতানুযায়ী প্রাপ্ত শাস্তি অপরাধীকে পবিত্র করে।"*

হানাফীদের একটি মূলনীতিঃ

উপরে যা কিছু বলা হয়েছে ও যুক্তির আলোকে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সে বিষয়গুলো সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন। তবে সমকামিতার শাস্তির বিষয়টি বর্তমানের আলোকে বুঝতে হবে। ব্যভিচার ও সমকামিতার মধ্যকার অন্যান্য পার্থক্যও আলোচিত হয়েছে, তবে এ বিষয়ের গভীরে যাওয়া এ মূহুর্তে অনুচিত। এ বিষয়ে হানাফীদের একটি মূলনীতি স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যে অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদন্ড নয় সে অপরাধ যদি বারবার করা হয় তবে ইমামের অধিকার আছে সে অপরাধীকে হত্যা করতে পারেন। এর উদাহরণ হিসেবে হত্যার বদলে হত্যা ও নারীদের সাথে অস্বাভাবিক উপায়ে মেলামেশা করাকে উপস্থাপন করা যায়, কেননা এ উভয় ক্ষেত্রেই শাস্তি মৃত্যুদন্ড নয়, তবে যদি বারবার এ অপরাধ করা হয় অপরাধীর রক্ত ঝরানো হালাল হয়ে যাবে, ইমাম তার মৃত্যুদন্ড জারি করতে পারেন।

সমস্যা ও তার উত্তরঃ

সমাপ্তিতে এসে কুরআনের (মা মালাকাত আইমানুহুম) অর্থাৎ, তোমাদের অধীনস্তদের সাথে যৌন সম্ভোগ হাসিল করা বৈধ করা হয়েছে, আয়াতটি ব্যাখ্যা করা দরকার। এখানে অধীনস্তদের বলতে কেবল নারী দাসীদের কথাই বোঝানো হয়েছে,

এতে পুরুষ দাসরা অন্তর্ভুক্ত হবে না। এ আয়াত যাতে কাউকেই বিভ্রান্ত না করে।

"(মালিক কর্তৃক) পুরুষ দাসের সাথে শারীরিক মেলামেশা করা বৈধ হবে না।"

স্বাভাবিক পন্থা বহির্ভূত অন্য কোনো উপায়ে যেহেতু সহবাস স্বামী-স্ত্রীর মাঝেও অবৈধ, সুতরাং দাসী কিংবা দাসের সাথেও এমনটা করা নিষিদ্ধ। দাসের সাথে সমকামিতার শাস্তি অন্য পুরুষের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার মত একইরকম হবে।

পাঠ ৮।। উপদেশ

সূফীদের নিকট বালকদের সংশ্রবঃ

সূফী ও আত্মশুদ্ধিতে পরিপক্কতা অর্জন বিষয়ে প্রাজ্ঞ আলিমগণ লিখেছেন যে, সালিকের (আত্মশুদ্ধির পথের পথিক) জন্য বালকদের সংশ্রব অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাদেরকে অবশ্যই বালক ও দাড়িবিহীন যুবকদের থেকে দূরে থাকতে হবে। তাদেরকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যাতে তারা বালকদের প্রতি আকর্ষিত না হন আর না তারা বালকদের নিজেদের কাছে ভিড়তে দিবে। অন্যথায় তারা আত্মশুদ্ধির পথে উন্নতি লাভ করতে পারবে না। 'ইহইয়াউ উলূমুদ্দিন' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারক লিখেন,

> *"শাইখ সুহরাওয়ার্দি তাঁর 'মাআরিফ' গ্রন্থে ও আল্লামা কুশাইরি তাঁর 'রিসালাহ' গ্রন্থে লিখেছেন আত্মশুদ্ধির পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো বালকদের সঙ্গ।"*

আহদাছদের সংশ্রবে থাকার কুফলঃ

এ ধরণের সঙ্গে থাকার ফলাফল কি হতে পারে তা জেনে নিন, এ বিষয়ে আল্লামা কুশাইরি লিখেছেন,

> *"যে ব্যক্তি বালকদের সংস্পর্শে আসে, আল্লাহর কসম! তার জন্য অমর্যাদা ও আল্লাহর ক্রোধের সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। এ বিষয়ে পূর্ববর্তীগণ একমত।"*

বালকদের সংস্পর্শ অভ্যন্তরীন আত্মশুদ্ধি ও সংস্কারের পথে বাধা। বালকদের সঙ্গে থেকে এ বাধাকে অতিক্রম করে যাওয়া অসম্ভব। কেননা সকল পূর্ববর্তীরা একমত যে, এ ধরণের লোকেরা স্থায়ীভাবে অমর্যাদার অধিকারী হয় ও আল্লাহ তাদেরকে ঘৃণা করেন। এমতাবস্থায় বিশুদ্ধ অন্তর লাভ করা অনেক দূরের বিষয়, সে ধোঁয়াশার মাঝেই অবস্থান করে।

অপমান ও অমর্যাদাঃ

শাইখ ওয়াসতি বলেছেন,

> *আল্লাহ তাকে মৃতের মত দুর্গন্ধময় আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেন,*যদি সে নিজেই নিজের নীচতা ও কুখ্যাতির ব্যবস্থা করে

উপরোল্লেখিত শাইখ শশ্রুবিহীন বালকদের 'আনতান' বলে উল্লেখ করেছেন, যারা দুষ্কর্মকারীদের হাতিয়ার হয়ে কাজ করে, যারা কারো প্রিয় হতে লজ্জিত হয়,

বরং নিজেদের মোহন দ্বারা তার প্রেমিকদের নিকট উপস্থাপন করে। এমনভাবে তারা অভিশাপ ও আল্লাহর ক্রোধকে ডেকে নিয়ে আসে।

নির্লজ্জতাঃ

তাদেরকে 'আন্তান' বলা হয়েছে তাদের আচরণের হীনতার কারণে, যেহেতু তারা নীচতার দিক থেকে যমীনের নিচে চলে গেছে। মানবজাতির সকল সম্মান, আত্মমর্যাদা ও মহত্ত্ব তারা খুইয়ে বসেছে। তাদেরকে 'দ্বইফ'ও বলা হয়েছে, কেননা তারা মানসিকভাবে মৃত। তাদেরকে জীবিত বলে দাবী করার মত কোনো আলামত নেই। যখনই তারা পুরুষ হওয়া পরও অস্বাভাবিক উপায়ে মহিলাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সম্মত হয়েছে তখনই তারা জীবন হারিয়েছে। আর যে এ ধরণের মৃত ও দুর্গন্ধময় আবর্জনাকে ব্যবহার করে নিজের যৌন চাহিদা মিটায় সে কীভাবে মানুষ বলে গণ্য হতে পারে? তাকে কীভাবে পুরুষদের কাতারে ফেলা যেতে পারে? তার মাঝে লজ্জা-শরমের লেশমাত্রও থাকে না। নিশ্চিভাবে আল্লাহর ক্রোধই হয় তার ঠিকানা।

আবদালদের পরামর্শঃ

ফাতেহ মুসিলী বলেছেন, "আমি জীবনে ত্রিশজন আবদালের সাথে সাক্ষাত করেছি, তাদের থেকে উপকৃত হয়েছি, প্রত্যেকেই বিদায়বেলায় দাড়িবিহীন বালকদের থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন।"

সূফী ও সূফীবাদের নেতৃস্থানীয়দের মতে এ ধরণের কাজ অতীব ভয়াবহ তাই এ থেকে দূরে থাকতে তারা কঠোরভাবে সতর্ক করতেন।

চিন্তার খোরাকঃ

আমরা এই মূহুর্তে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যাদের পেশা দাড়িবিহীন বালকদের শিক্ষাদান করা। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকমন্ডলী। তারা সাধারণত বালক ও যুবকদের সাথে ঘনিষ্ঠ ও বাঁধাধরাহীন হয়ে থাকেন। তাদেরও সতর্ক হওয়া চাই। তারা যাতে কোনো সময়ই কামনার দৃষ্টিতে যুবকদের দিকে না তাকান। কোনো কারণেই তাদের সাথে নির্জন ও একাকী অবস্থান করা উচিত নয়। আর তাদের সাথে খুব বেশী ঘনিষ্ঠ হওয়াও উচিত নয়। যারা সতর্কতা অবলম্বন করে না ও তাদের সাথে নির্জনবাস করে তারা সবসময়ই জাহান্নামের আগুনের কিনারে বসে আছেন। কোনসময় যে পা পিছলে আগুনে পড়ে যেতে হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানেনা।

নির্জনে বালকদের নিকট থেকে খেদমত নেওয়া অপছন্দনীয়ঃ

মাদ্রাসায় প্রচলিত অপরিচিত বালকদেরকে দিয়ে শিক্ষকের শরীর টেপার নিয়ম বিপজ্জনক, বিশেষত যখন খেয়াল রাখা হয় না যে, উরু থেকে শ্রোণী পর্যন্ত অংশে কাপড় সহকারে টেপাও অপছন্দনীয়। আবার যদি তা হয় নির্জনে তবে তা আশু বিপদের সংকেত। যখন দাড়িবিহীন বালক দিয়ে চুল কাটা অপছন্দনীয় তখন বাথরুমে বালককে দিয়ে শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা কিংবা তাদের দিয়ে শরীর টেপানো নিষিদ্ধ হবে। এটা তো জানা কথাই যে, আলিমগণ সম্পূর্ণ অপছন্দনীয় (মুতলাকান মাকরুহ) দ্বারা নিষিদ্ধ বিষয়কেই বুঝিয়ে থাকেন। এর মাধ্যমেও শরীর টেপানোর অপছন্দনীয়তা উপলব্ধি করা যায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ

এটা সুপ্রসিদ্ধ সত্য যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই সমকামিতার ব্যাধি অধিকহারে লক্ষ করা যায়। যদি এখনই সতর্ক না হওয়া যায় তবে আগত প্রজন্ম ধ্বংসোন্মুখ। এসকল প্রতিষ্ঠানে অবিবাহিত ছেলেরাই সংখ্যায় বেশি, যদি পরিবেশ সঠিক না হয় তবে শয়তানের প্ররোচনায় তারা সহজেই বিপথে চলে যেতে পারে।

আগের দিন শেষঃ

আত্মার পবিত্রতা ও ধার্মিকতার শিক্ষা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। বস্তুবাদের এ যুগে আত্মার পরিশুদ্ধি ও তাকওয়া কোনো প্রকার গুরুত্ব রাখে না। গুরুত্বই যদি না থাকে তবে এদিকে মনোযোগ কীভাবে দেওয়া যাবে? প্রত্যেকেরই নিজস্ব আত্মা রয়েছে, আত্মার পরিশুদ্ধির অভাবেই মানুষ গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। এছাড়া দ্বিমুখী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও এ কাজে হাতে হাত লাগান! এখন শিক্ষক ও ছাত্রের মাঝে সেই সম্পর্ক নেই যেমনটা হওয়া উচিত। একই কথা প্রযোজ্য ছাত্রদের ক্ষেত্রেও। না শিক্ষক ছাত্রকে নিজের ছেলে মনে করেন, আর না ছাত্র শিক্ষককে বাবার মতন দেখে। এমতাবস্থায় উভয়ের মাঝে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্কে কীভাবে জাগ্রত হতে পারে? একইভাবে ছাত্ররাও আরেক ছাত্রকে নিজের ভাই বলে ভাবে না, তাহলে কীভাবে একে অপরের মাঝে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সম্পর্ক তৈরী হতে পারে!

বালকদের মাঝে সাজসজ্জার প্রবণতাঃ

শহরের বাসিন্দাদের মাঝে এ জঘন্য কর্মের অভিরুচি তুলনামূলক বেশি কাজ করে থাকে। স্কুলের ছেলেরা নতুন নতুন স্টাইলের জন্ম দেয়। তারা ফুল মেইকআপ করে বাসা থেকে বের হয়। মেয়েদেরকেও ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা যেন তাদের!

প্রকৃতিগতভাবেই তারা স্বাধীন ও লাগামছাড়া। হাফিজ ইবনু তাইমিয়্যাহ সঠিকই বলেছেন,

"যুবক ও সুদর্শন বালকদের এমনস্থানে ঘোরাফেরা করা উচিত নয় যেখানে এ ব্যাধি আক্রমিত হয়ে আছে, বিশেষত যখন সমকামিতা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। যদি চলাফেরা করাটা একান্ত জরুরী হয় তবে তা কমিয়ে দেওয়া উচিত। তাদের জন্য সাজসজ্জা করে জায়গায় জায়গায় ঘোরাফেরা করা ও অপরিচিত লোকদের সাথে মেলামেশা করা অপছন্দনীয়। তারা এমন কোনো অঙ্গভঙ্গি করবে না যা অন্যদের তাদের দিকে তাকাতে প্ররোচিত করে।"

অর্থাৎ, বালকদেরকেও সতর্ক থাকতে হবে যাতে তাদের মর্যাদা ও সম্মান যাতে নিরাপদ ও অক্ষুন্ন থাকে, যাতে কোনো দুষ্কর্মক তাদের দিকে নোংরা পদক্ষেপ নেওয়ার সাহসও করতে না পারে।

আত্মরক্ষায় সাহসিকতার প্রদর্শনঃ

কোনো কোনো বালক এমন পরিস্থিতিতে বিপরীত পক্ষকে দূরে সরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ ও ইতস্তত বোধ করে। কিন্তু শরীয়তে এ ধরণের কোনো অযুহাতের স্থান নেই। এ ব্যাপারে তাদের কোনো প্রকার লজ্জা ও ইতস্তত করা চলবে না। এ ধরণের নোংরা পদক্ষেপকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করা ও সম্ভাব্য সকল উপায়ে নিজেকে এ ধরণের ব্যাধিগ্রস্তদের থেকে বাঁচানো উচিত, এসব ব্যাধিগ্রস্তদের মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়া উচিত যাতে তারা অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়। আলিমগণ লিখেছেন যদি কোনো বিকৃতকাম ব্যক্তি বালকদেরকে এ ব্যাপারে জোরজবরদস্তি করার চেষ্টা করে তবে তার উচিত সর্বশক্তি দিয়ে নিজেকে বাঁচানো। প্রয়োজনে চিৎকার-চেঁচামেচিও করা যেতে পারে, তার সামর্থ্যে থাকা সবকিছুই তাকে করতে হবে। এরপরেও যদি সে বিরত না হয় তবে বালকদের উচিত লোকটিকে মেরে ফেলা। আলিমগণ লিখেছেন এমতাবস্থায় সে অপরাধী হবে না। এমন ব্যক্তির রক্তের ক্ষতিপূরণও দেওয়া হবে না।

"যদি কোনো পুরুষ কোনো নারীকে ব্যভিচারের প্রতি বাধ্য করে তবে তার জন্য অনুমতি আছে সে লোকটিকে মেরে ফেলতে পারে। একইভাবে যদি কেউ কোনো বালককে বাধ্য করার চেষ্টা করে এবং তাকে বিরত করার আর কোনো উপায়ন্তর না থাকলে তাকে মেরে ফেলা জায়েজ।"

বড়দের সঙ্গে বালকরাঃ

যেসব বালকরা অন্য পুরুষদের সঙ্গ দেয়, তারা একে অপরে বন্ধুত্বপূর্ণ, তারা একত্রে খাওয়া-দাওয়া করে এরা বিপদসীমার মধ্যে আছে। এরা হয়ত জানেও না নিষ্পাপতা,

ভদ্রতা ও দয়ার্দ্রতার পোষাকের তলে কি লুকিয়ে আছে, তারা জানেও না কীভাবে তাদেরকে এ পথে বাধ্য করা হবে। তারা গল্প-মজাক ছলে শুরু করে যার চূড়ান্ত ফলাফল অনাকাঙ্খিত কোনো ঘটনায় রুপ নেয়, আজ অথবা কাল।

আল্লাহর দিকে ফিরে আসাঃ

যারা এ সংক্রামক ব্যাধিতে জড়িয়ে গেছেন তাদের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবাহ করা, অশ্রুসজল চোখে প্রার্থনা করা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো পথ খোলা নেই। যদি ফিরে আসার দৃঢ় ইচ্ছা থাকে ও এ পাপকাজ থেকে বিরত থাকার নিয়্যাত করা হয় তবে আল্লাহর দয়া তাদের উপর বর্ষিত হবে, তাদের দুআ আল্লাহ্ শুনবেন, তাদেরকে এ ব্যাধি থেকে মুক্ত করবেন। তিনি যেভাবে চান সেভাবেই অন্তর পরিবর্তন করে দিতে পারেন।

মৃত্যুচিন্তাঃ

এমতাবস্থায় কোনো ভালো ডাক্তারের নিকট যাওয়া যায়। যদি কেউ অবিবাহিত হয়ে থাকে তবে তার দ্রুতই বিয়ে করে নেওয়া উচিত। এ জাতীয় কোনো কিছু পড়া, লেখা কিংবা অন্য কোনোভাবে এর সাথে জড়িত না থেকে অন্তরকে এ জাতীয় চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত করা উচিত। বিবাহিতদের অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক উপায়ে যৌন চাহিদা চরিতার্থ না করে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক উপায়ে যৌন চাহিদা হাসিল করা উচিত, যেমনটা দ্বীনে নির্দেশ করা হয়েছে। আল্লাহর ক্রোধ, মৃত্যু ও আখিরাতে নিজের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত। আমরা নিজেদের খারাপ ও মন্দ আমল যতই লুকানোর চেষ্টা করি না কেন তা একদিন না একদিন সকলের কাছে তা উন্মুক্ত হবেই, এমনকি শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও সাক্ষ্য দেবে, তখন আমাদের আল্লাহর ক্রোধ থেকে বাঁচানোর মত কেউই থাকবে না। যদি আল্লাহওয়ালা কারো সন্ধান পাওয়া যায় তবে তার সাথে সময় কাটানোর মাধ্যমে নিজের অন্তরের কলুষতা দূর করার চেষ্টা করা উচিত। যদি সে ছাত্র না হয়ে থাকে তবে সূফীদের আযকার ও আশগালে যুক্ত হতে পারে, এতে তাদের বারাকাহ্ তার উপর বর্ষিত হবে, আর এতে করে আল্লাহ্ চাইলে সে পাপের পথ থেকে শীঘ্রই সঠিক পথে ফেরত আসতে পারে।

পাঠ ৯।। মনের খোরাক

মানবীয় চাহিদাঃ

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানুষ সেদিকেই আকর্ষিত হয় যা তার সত্তার চাহিদা পূর্ণ করে। যদি এরকমটা না হত তবে মানুষ পানাহার, বিবাহ-শাদী করা পরিত্যাগ করত, যদিও এসকল কিছুই মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দরকারী। আর এ কারণেই আল্লাহ্ মানুষের স্বভাবেই এসকল জিনিসের প্রতি চাহিদা গেঁথে দিয়েছেন।

কুপ্রবৃত্তিঃ

এতদসত্ত্বেও এসকল চাহিদার প্রতি বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে ও নিয়ন্ত্রিতভাবে এসকল চাহিদা পূর্ণ করার প্রতি জোরারোপ করা হয়েছে। যদি মানুষ নিয়ন্ত্রণের সীমা পরিত্যাগ করে লাগামছাড়া হয়ে যায় তবে তা ইসলামের দৃষ্টিতে সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হয়। আর ইসলাম তা কখনোই সহন করতে পারে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> *"তোমাদের মধ্যে কেউই মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষন পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার অনুসারী হবে।"*

যৌন চাহিদা ও মানুষের দায়িত্বঃ

মুমিনের দায়িত্ব হলো সে প্রবৃত্তির স্রোতে ভেসে যাবে না। সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে তা যাচাই করে নেওয়া উচিত। যদি তার পদক্ষেপ কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে বৈধ না হয় তবে তার পদক্ষেপ গুটিয়ে নেওয়া কর্তব্য, সীমালঙ্ঘনের সাহস তার কোনোমতেই করা উচিত নয়। যুক্তি-বুদ্ধি বিবর্জিত যৌন চাহিদার দাবী হলো যেকোনো উপায়েই হোক না কেন তাৎক্ষনিক তৃপ্তি পাওয়া, সুযোগের সদ্ব্যবহার করা, কোনো প্রকার হালাল-হারামের প্রভেদ না করা। এ ধরণের চাহিদা মানুষকে অন্ধ, বধির ও বোবা বানাতে চায়। ফলাফলের চিন্তা করতে দেয় না। আর মানুষের বিবেক, প্রজ্ঞা, দয়ার্দ্রতা ও দ্বীন এমন কাজ থেকে রুখতে চায় যা আখিরাতে তার জন্য লজ্জা, বেদনা, পীড়ন ও ক্ষতিতে রুপ নেবে। সুস্থ বিবেক ও অনিয়ন্ত্রিত যৌন চাহিদার মাঝে সবসময়ই দ্বন্দ্ব চলে আসছে। কেউ যৌন চাহিদার কাছে নতি স্বীকার করে আর কেউ বিবেক দ্বারা নির্দেশিত হয়। যদি কেউ এমন দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়ে তবে তার উচিত দ্বীনের আদালতের রায় নিঃসঙ্কোচে

মেনে নিয়ে সন্দেহমুক্তভাবে তার উপর আমল করা। মনে রাখতে হবে এ রায় সুস্থ বিবেকের মোটেও বিরোধী নয়।

অসুস্থ অভ্যাসের পরিণতিঃ

যখনই কেউ তাৎক্ষণিক তৃপ্তিতে লিপ্ত হয় সে-ই আসক্ত হয়ে যায়, তার আনন্দানুভূতি পুরোপুরি শয়তানের দখলে চলে যায়। তার উদাহরণ হয় এমন পাখির মত যে খাবারের লোভে শিকারীর ফাঁদে পা দেয়। শেষমেষ না সে খাবার পায় আর না পায় বের হওয়ার জায়গা। তেমনিভাবে যে সমকামিতায় আসক্ত হয়ে পড়ে সে না তার কাঙ্খিত তৃপ্তি পায় আর না সে এ দুষ্ট চক্র থেকে বের হতে পারে, যদি না আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত না আসে।

অসুস্থ আসক্তি থেকে মুক্তিঃ

এ অসুস্থ আসক্তি থেকে বের হয়ে আসার একটিই পথ, তা হলো মৃত বিবেককে জাগিয়ে তোলা ও ধৈর্য্যের চর্চা করা। যখনই কুপ্রবৃত্তি তার উপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে তখন তাকে দৃঢ়তার সাথে তা হজম করতে হবে, চিন্তা করতে হবে এর চূড়ান্ত পরিণতি। নিজের দুর্বলতার স্মরণ করে স্বীয় নফসকে উপদেশ দিতে হবে। ভাবতে হবে আল্লাহর ও মানুষের দৃষ্টিতে তাকওয়া-ধার্মিকতা অধিক মূল্যবান নাকি তার বাজে আসক্তি? সামান্য কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে যদি এ আসক্তির উপর বিজয়ী হওয়া যায় তবে সে ও তার সন্তানাদি কি অর্জন করতে পারে তা ভাবা উচিত। তার উপলব্ধি করা উচিত এর কারণে সে আল্লাহর কাছে কতটা সম্মানিত হবে, দুনিয়ার জীবনে কতবড় বিপদ থেকে সে মুক্তি পাবে আর আখিরাতে এর বিনিময়ে কেমন পুরস্কার মিলবে।

সৃষ্টির উদ্দেশ্যের দিকে নজর দেওয়াঃ

মানুষের দৃষ্টিপাত করা দরকার তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের দিকে, সে কি বৈধ-অবৈধ সকল চাহিদা ভোগ করার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে নাকি তার সৃষ্টির পেছনে আছে মহৎ কোনো উদ্দেশ্য? প্রাকৃতিক এ তাড়নার ব্যাপারেও ভেবে দেখা দরকার, একে কি এমন কোনো কাজে ব্যয় করা উচিত যাকে না তাকে, তার সঙ্গীকে, তার পরিবার, গোত্র, জাতি ও দেশকে উপকৃত করে না? আল্লাহ কি এ চাহিদা তার নিজের ও অন্যের উপকারের জন্য দান করেছেন? যদি আল্লাহপ্রদত্ত যৌন চাহিদার যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায় তবে প্রকৃত তৃপ্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়, তখন সন্তানাদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বৃদ্ধ বয়সে আশ্রয় হতে পারে। পরিবার উপকৃত হবে, বংশধারার ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন ঘটবে না, এর সদস্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। জাতি ও দেশ এর জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবে। হতে পারে এ সন্তানদের কেউই জাতীয় বীর, বড় আলিম ও ধর্মীয় নেতা হবে।

যে জানোয়ার নিজের লাভ-ক্ষতি বিবেচনা করে সে অবিবেচক মানুষ থেকে উত্তম। মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিজের অসুস্থ চাহিদা চরিতার্থ করার স্বার্থে স্বীয় মর্যাদা, সম্মান, সুখ্যাতি, জনপ্রিয়তা ও প্রিয় দ্বীন হারানো উচিত নয়, যেভাবে উচিত নয় নিজের সুবৃত্তিকে শয়তানী বাসনা ও হীনতা পূরণ করতে যেয়ে তিলে তিলে নষ্ট করে ফেলা।

নফসের অবাধ্যতাঃ

স্মরণে রাখতে হবে, যৌনতার বিকৃতি সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ। নিয়ন্ত্রণ না হারিয়ে প্রতিটি মূহুর্তে এর বিরোধিতা করা ছাড়া এর অন্য কোনো প্রতিষেধক নেই। যদি কেউ এ অসুস্থ অভিলাসের প্রতি সমর্পণ করে বসে তবে সে নিজেকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করলো এবং নিজ হাতেই আল্লাহর রহমতের দুয়ার বন্ধ করে দিলো। তাওহিদে বিশ্বাস করার পরও নফসের হাতে সমর্পণ করার বিষয়টি সত্যিই অবাক করার মত। নিজের যৌনতাকে রব হিসেবে গ্রহণ করে আসল রবের আদেশ-নিষেধ লংঘন করার কোনো সুযোগ কি ইসলামে আছে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> *"তিনটি জিনিস মুক্তি দানকারী ও তিনটি জিনিস ধ্বংসকারী। মুক্তি দানকারী হলোঃ তাকওয়া, সত্য কথা বলা, ভারসাম্য অবলম্বন করা। আর তিনটি ধ্বংসকারী জিনিস হলোঃ প্রবৃত্তির আনুগত্য, কৃপণতা যার অনুসরণ করা হয় ও অহংকার।" (রাওদ্বাতুল মুহিব্বীন)*

প্রবৃত্তির প্রলোভনঃ

মানুষকে অবশ্যই বিবেক-বিবেচনা করে কাজ করা চাই, অন্যথায় তা হবে সর্বনাশা। কেননা পাপ খুবই আকর্ষণীয় ও নেকীর রাস্তা কন্টকাকীর্ণ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই বলেছেন,

> *"জান্নাতকে দুঃখ-কষ্ট ও জাহান্নামকে আকর্ষণ দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)*

যৌন চাহিদা সবচাইতে বেশি আকর্ষণীয়। তা মানুষের অন্তরকে এমনভাবে মোহিত করে যে কেউই এর হাতছানিতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বসলে তা অগণিত বিপদ টেনে নিয়ে আসে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর শঙ্কা এভাবে তুলে ধরেছেন,

> *"উদরপূর্তি ও যৌনাকাঙ্খা পূরণের জন্য তোমাদের নফসের বশীভূত হওয়াকে আমি সবচেয়ে বেশী ভয় করি।" (রাওদ্বাতুল মুহিব্বীন)*

সমকামিতা যৌনতা বিকৃতির মধ্যে অন্যতম একটি, যাতে বিকৃতকাম ব্যক্তিদের অংশ রয়েছে, যার সাথে সুস্থ বিবেক ও সুবৃত্তির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এরকম ব্যক্তি তার স্বীয় প্রবৃত্তির অনুগামী মাত্র। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্যই

বলেছেন,

> *"নফসের চাইতে বড় ইলাহ আর কোনোটি নেই, যার অনুগত হওয়া হয় ও যার উপাসনা করা হয়।"*

যারা জান্নাতের অধিকারীঃ

এটা নিশ্চিত বিষয় যে, আখিরাতের শাস্তি তাদের জন্যই নির্ধারিত যারা নিজেদেরকে অবাধ যৌনতার ফাঁদে ফেলে না, যারা দুনিয়ার জীবনের জন্য আখিরাতের জীবনকে ভুলে যায় না, যারা নিশ্চিতভাবেই জানে দুনিয়ার জীবনের পরে যে জীবন আসতে চলেছে তা-ই আসল জীবন। আল্লাহর বাণীঃ

فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (٣٩) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (٤١)

> *"অনন্তর যে সীমালংঘন করে, এবং পার্থিব জীবনকে বেছে নেয়, জাহান্নামই হবে তার অবস্থান স্থল। পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার অবস্থিতি স্থান।" (সূরা নাযিআত, ৭৯:৩৭-৪১)*

যখন কেউ নিজের কামনা-বাসনার বশীভূত হয়ে যায় তার জন্য সকল তাকওয়া, ধার্মিকতার দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আলাহ মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেছেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ

> *"এদের অন্তরের উপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে।" (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭:১৬)*

এ কারণে আমাদের নফসের অনুসরণ পরিত্যাগ করা উচিত এবং নিজেদের আমল ও আখলাককে এ থেকে মুক্ত রাখা, যাতে আমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারি ও দুনিয়ার জীবনেও সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে পারি। নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণীর মর্মকথা হলো,

জাহান্নামকে কামনা-বাসনা দিয়ে ও জান্নাতকে কষ্ট-পীড়া দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, জান্নাত ততক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সেসকল নির্দেশকে মান্য করা হবে যা নফসের জন্য কষ্টদায়ক, যেমনঃ আল্লাহর আদেশ মোতাবেক ইবাদাত করার প্রচেষ্টা চালানো, পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তার আনুগত্য করা ও বিভিন্ন নেকআমল করা যদিও তা নফসের উপর এক ধরণের অস্বস্তি তৈরী করে, পাশাপাশি সেসকল নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা যা থেকে আনন্দ আসার কারণে

নফস তা থেকে বিরত থাকতে চায় না।

মানুষ জাহান্নামের জন্য নির্ধারিত হয়ে যায় যখন সে নফসের জন্য আকর্ষণীয় মদ্যপান, গীবত, ব্যভিচার ও সমকামিতার মত নিষিদ্ধ কাজসমূহ করতে কোনোপ্রকার লজ্জাবোধ না করে। এসকল কাজের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই নফসের তীব্র আকর্ষণ কাজ করে, সাথে সাথে তা আনন্দদায়কও বটে, যদিও সেই আনন্দ নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী।

সাফল্য ও পাপঃ

মানুষ যখন সফল হয় কিংবা ক্ষমতালাভ করে তখন তখন সে পাপের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও ক্ষমতা তার মাঝে বিলাসিতা সৃষ্টি করে। এ সময় অন্তর ভালো থেকে খারাপের দিকেই অধিক মাত্রায় মনোযোগী হয়। ধন-সম্পদের প্রতুলতা আনন্দলাভকে তার জন্য সহজ করে দেয়। দুঃখ-কষ্টের সময়গুলোতে নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর যোগাড় ও জীবিকা নির্বাহ করতে করতেই সারা সময় চলে যায়, তাই এ সময়ে পাপের কথা ভাবার সময়ও তার থাকে না। এ কারণে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

> *"আল্লাহর কসম ! আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের ভয় করি না, আমি ভয় করি তোমাদের জন্য দুনিয়াকে বিস্তৃত করে দেওয়া হবে, যেমনটা তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্যও বিস্তৃত করে দেওয়া হয়েছিলো।"*

তাই যারা ক্ষমতায় অধীষ্ঠিত আছে তাদের অবশ্যই নিজের আচার-ব্যবহারের প্রতি যত্নবান হওয়া ও সকল প্রকার পাপাচার থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন, পাপ মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। এর মধ্যে অবৈধ পন্থায় যৌন চাহিদা হাসিল করাও অন্তর্ভুক্ত, এতে মানুষ অবচেতনভাবেই জড়িয়ে যায়, যা দুনিয়া ও আখিরাতকে নষ্ট করে ছাড়ে।

নশ্বর জীবনের সাথে চিরন্তন জীবনের তুলনাঃ

প্রত্যেককেই মনে রাখতে হবে দুনিয়ার জীবন অল্প কয়েকদিনের আর আখিরাত চিরস্থায়ী। দুনিয়ার আনন্দ অস্থায়ী ও আখিরাতের শান্তি অফুরন্ত। তাই নিজের হাতে দুনিয়ার জীবনের বিনিময়ে পরকালকে নষ্ট করা অতীব দুঃখজনক। আমাদের অবশ্যই নিজেদেরকে এ ক্ষতি থেকে বাঁচাতে হবে। পরকালীন মুক্তির জন্য ইসলামের বিধি-বিধানকে মেনে চলতে হবে।

আমরা দুআ করি যাতে আল্লাহ আমাদের সুস্থ বিবেক ও উপলব্ধির নিয়ামত দান করেন, পাশাপাশি আমাদেরকে দ্বীন ও দ্বীনের বিধানের উপর অবিচল থাকার সামর্থ্য দান করেন। তিনি যাতে আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করেন ও আজীবন তাঁর পথেই

সীমাবদ্ধ থাকার তাওফীক দেন। তিনি আমাদেরকে পার্থিব দুর্নাম, লোভ-লালসা ও বিদ্রোহাত্মক আচরণ থেকে রক্ষা করেন, তিনি আমাদেরকে জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের অকল্যাণ থেকে হেফাজত করেন।

আল্লাহর রহমত অবশ্যই প্রয়োজনীয়। মানুষের দায়িত্ব হলো শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য এ সম্পর্কিত সকল উপায়-উপকরণের ব্যবহার থেকে বিরত থাকা।

মুহাম্মাদ জাফিরুদ্দীন

পুরা-নুদু-ইয়াহাবী
মুরাত্তাব ফাতওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ

পাঠ ৯০।। আঁতশ কাচের নিচে

সমকামিতা একটি বিকৃত যৌনাচার এবং জঘন্য পাপাচার। একটি মানুষ যেমন জন্মগত ভাবে চোর কিংবা ডাকাত হয়ে জন্মায় না ঠিক তেমনিভাবে কোনো মানুষই জন্মগত ভাবে সমকামী নয়। মহান স্রষ্টা কাউকেই সমকামী চরিত্র দিয়ে সৃষ্টি করেননি বরং সমকামী-রা স্রষ্টা নির্ধারিত স্বাভাবিক আচরণকে বাদ দিয়ে চাহিদা মেটাতে বেছে নেয় এক বিকৃত উপায়। যা মহান স্রস্টার নির্ধারিত পথের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ। কোনও বিবেকবান মানুষের পক্ষেই এই ঘৃণ্য অপকর্মকে সমর্থন করা সম্ভব নয়। এটি পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্য মর্যাদাহানিকর। সমকামিতা একজন পুরুষকে পুরুষত্ব থেকে এবং নারীকে তার নারীত্ব থেকে বঞ্চিত করে। এই অপ্রাকৃতিক জীবনাচরণে অভ্যস্ত হয়ে সমকামিরা শুধু নিজে নিজেই ধ্বংস হয় না, সমাজের সুস্থতাও নষ্ট করে। একটি সুন্দর সমাজ সেসব দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে সমকামিতার প্রসার সেই ভিত্তিমূলেই কুঠারাঘাত করে। তাই এখনই সমাজ থেকে এই পাপাচারের মূলোৎপাটন করা অত্যাবশ্যক।

এই বিকৃত থেকে বাঁচতে চাইলে মহান স্রষ্টার দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। এটা ভিন্ন অন্য কোন পথও নেই যা আমাদের সমাজকে এই অসভ্যতা থেকে বাঁচাতে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারে। কারণ, মহান স্রষ্টা প্রদত্ত জীবন বিধানই হল মানুষের নৈতিকতার প্রকৃত রক্ষক। ইসলামে সমকামিতা থেকে বেঁচে থাকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধি-বিধান ই শুধু নয়, এতে আরও আছে গোটা পৃথিবী থেকে এই কুকর্মের মূলোৎপাটনের সঠিক ও যথাযথ দিকনির্দেশনা। সূরা আল-কামার এর ৪৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানুওয়া তা'আলা বলেছেন-

"নিঃসন্দেহে অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত হবে"

সমকামিতা নামক এই ব্যাধি আজ মানুষের ঘরের দরজায় কড়া নাড়ছে। ঘরে প্রবেশ এর আগেই এঁকে ঝেটিয়ে বিদায় না করলে কেবল একটিই নয়, বরং একাধিক পরিবার, সমাজ, জাতি এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। সমকামিতার বিরূদ্ধে জনসচেতনতার তৈরিতে ইসলাম, বিজ্ঞান,দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্রের ছুঁড়ির নিচে সমকামিতাকে রেখে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি "অভিশপ্ত রঙধনু"।

নাটের গুরু

উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীতে মানুষ যখন সবকিছু দেখতে শুরু করলো বিজ্ঞান নামক চশমার ভেতর দিয়ে, তখন পুঁজিবাদী-ভোগবাদী সভ্যতার প্রয়োজন ছিল এমন কিছু সায়েন্টিফিক থিওরির যেগুলো অশ্লীলতা,বেহায়াপনা, বিকৃত যৌনাচারগুলোর পায়ের তলায় মাটি দাড় করিয়ে দেবে। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের হাত ধরে এমন কিছু থিওরি এসেছে, তবে মূল কাজটা করেছেন আলফ্রেড কিনসি সাহেব।

১৯৪৮ সালে বায়োলজি এবং পতঙ্গবিদ্যার এই অধ্যাপক বের করে তার প্রথম বই 'Sexual Behavior in the Human Male' ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় তার আরেকটি বই 'Sexual Behavior in the Human female'।

এই দুটি বই যেন ঝড় তোলে পাশ্চাত্যে; যৌনতা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন আনে। পাশ্চাত্যের ইতিহাসের অন্য কোন বই বা রিপোর্ট পাশ্চাত্যকে এতোটা বদলে দেয়নি যা এই দুইটি বই দিয়েছিল। আধুনিক 'সেক্স এডুকেশান' বা যৌনশিক্ষা এবং যৌনতা সম্পর্কে আধুনিক পশ্চিমা ধারণা, একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠেছে আলফ্রেড কিনসির এই দুই বিখ্যাত 'থিসিসের' উপর ভিত্তি করে।

এই দুটি বইয়ে কিনসি এমন কিছু কথা বলে যা মানুষেরা আগে কখনোই শোনেনি। কিনসি দাবি করে যে শিশুরা জন্মগত থেকেই সেক্সুয়ালি এক্টিভ,সাত মাস বয়সী এক শিশু এবং এক বছরের নিচের আরো পাঁচজন শিশুকে সে মাস্টারবেট করতে দেখেছে। [Sex education as bullying, page 7]। শিশুরা বয়স্ক সঙ্গী/সঙ্গীনীদের সঙ্গে আনন্দদায়ক এবং উপকারী যৌনমিলন করতেই পারে এবং করা উচিত। [Kinsey,Sex and Fraud, page 3] পিতামাতার উচিত ৬-৭ বয়স থেকে শুরু করে শিশুদের মাস্টারবেট করানো। এবং মিলেমিশে একসঙ্গে মাস্টারবেট করা।

কিনসি দাবি করে ৩৭% পুরুষ হোমোসেক্সুয়াল এক্সপেরিয়েন্সের সম্মুখীন হয় বয়ঃসন্ধিকাল থেকে বৃদ্ধ হবার সময়ের মধ্যে [Kinsey,Sex and Fraud, page 2]

কিনসি দাবী করে মানব যৌনতার ওপর কারো কোন কর্তৃত্ব ফলানো চলবে না। তার যা মন চাইবে সে তাই করতে পারবে, এটাই স্বাভাবিক, সমকামিতা স্বাভাবিক,শিশুকাম,মাস্টারবেশন স্বাভাবিক,স্বাভাবিক সব ধরণের বিকৃত যৌনাচার, বরং নারী-পুরুষের স্বাভাবিক অন্তরঙতাই অস্বাভাবিক [Kinsey,Sex and Fraud, page 2]

পরবর্তীতে এই 'মহান' বিজ্ঞানীর কাজগুলো রিফিউটেশানের শিকার হয়েছে

বিজ্ঞানীদের দ্বারাই। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন আলফ্রেড কিনসির দাবিগুলোর তেমন কোন সায়েন্টিফিক ভিত্তি নেয়, তার তথ্য উপাত্ত গুলো যথেষ্ট পরিমাণে গোঁজামিলে ভরপুর [Kinsey, Sex and Fraud, page 1]। এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য অনেক সময় সাবজেক্টের ওপর চরম যৌননির্যাতন চালানো হয়েছে, রেহায় দেওয়া হয়নি শিশুদেরকেও।

কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গিয়েছেই। কিনসি সব ধরণের বিকৃত যৌনাচারকে স্বাভাবিক করার যে দাবি তুলেছিল তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে দেরি করেনি পুঁজিবাদী-ভোগবাদী-বস্তুবাদী দুনিয়ার হর্তাকর্তারা। বস্তা বস্তা ডলার ঢেলে কিনসির ভুয়া দাবিগুলো বিজ্ঞানের সহিহ্ শুদ্ধ পোশাক পরিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে পুরো বিশ্বের সাধারণ মানুষ জনের কাছে। ক্রমাগত গুনগান গাওয়া হয়েছে সমকামিতার, শিশুকামের। সেক্স এডুকেশানের নামে বাচ্চাদেরকে ছোট থেকেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সমকামিতা, মাস্টারবেশন, এনাল সেক্সের মতো জঘন্য বিষয়গুলো।

২০০৫ সালের নভেম্বর মাসের ১২ তারিখ। Marina Del Rey Marriott Hotel-এ চলছে NARTH (National Association for Research & Therapy of Homosexuality) এর কনফারেন্স। প্রায় শতাধিক মনোচিকিৎসকের সামনে American Psychological Association (APA)-এর সাবেক প্রেসিডেন্ট Nicholas Cummings, Ph.D. উচ্চারণ করলেন কিছু অপ্রিয় সত্য।

- সমাজকর্মীরা American Psychological Association-কে বাধ্য করছে তাদের হয়ে কথা বলতে। এমন সামাজিক অবস্থান নিতে জোর করছে, যার পক্ষে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই।

- তখনই APA কোন রিসার্চ পরিচালনা করে, যখন তারা জানে যে রেজাল্ট কী হবে। সম্ভাব্য যে ফলাফল পক্ষে আসবে, তেমন রিসার্চই কেবল অনুমোদন দেয়া হয়।

- যখন Cummings সাহেব ও আরেক মনোবিদ Rogers Wright, Ph.D একটা বই লিখছিলেন Destructive Trends in Mental Health নামে, তখন তারা আরও কিছু সহকর্মীর সাহায্য চান। তারা কেউই সাহায্য করেনি বরখাস্ত হবার ভয়ে কিংবা পদোন্নতি বঞ্চিত হবার ভয়ে। বেশি ভয় পেত তারা 'gay lobby' বা 'সমকাম সমর্থক'দেরকে, যারা APA-তে খুবই শক্তিশালী।

- সমকাম কর্মীদের এজেন্ডার অমত করলেই তাকে থামিয়ে দেয়া হয় এ কথা বলে যে— 'সমকামীদের বিরোধিতা মানে কাপুরুষতা'।

- Cummings সাহেব তাঁর এক অভিজ্ঞতার কথা বলেন: তদকালীন APA-র প্রেসিডেন্ট, যিনি আবার ছিলেন লেসবিয়ান, আমার বক্তব্য থামিয়ে দিয়েছিলেন, কথাই বলতে দেননি এ কথা বলে যে, আপনি স্ট্রেইট পুরুষ আর আমি লেসবিয়ান নারী। আপনার সাথে আমি কোনো বিষয়েই একমত হতে পারব না। অথচ পুরো হলের কেউ কোনো কথাই বলল না। এই নারী APA-এর একজন প্রখ্যাত গবেষক ও বহু অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত। পাঠক, তাহলেই বোঝেন কী গবেষণা হয়।

- APA সমকামীদের মনোচিকিতসা করে তাদের স্বাভাবিক যৌনতায় ফিরিয়ে আনাকে 'অনৈতিক' ঘোষণা করার দ্বারপ্রান্তে। তাহলে ব্যক্তিস্বাধীনতা কি একমুখেই চলবে?

আরেকজন মনোচিকিৎসক Jeffrey Satinover, M.D. একই অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, সমকাম কর্মীদের দ্বারা মানসিক-স্বাস্থ্য সংগঠনগুলো ইউজড হচ্ছে। এরা রিসার্চের রেজাল্টকে নিজেদের স্বার্থে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নিচ্ছে। বিজ্ঞানের এই বিকৃতি এতোই ব্যাপক, যে তা আমাদের কল্পনার বাইরে। তিনি আরও বলেন, দেখেন, কারা APA-র প্রতিনিধিত্ব করে। সমকাম মনোবিদ Gregory Herek, Ph.D. লেখেন বিখ্যাত Romer v. Evans কেসের ব্রিফিং APA-র পক্ষে। আমেরিকার 'জেন্ডার পরিচয়' আইনে এই কেস অন্যতম ভিত্তি। তিনি সেখানে জেন্ডার পরিচয় এক্সপার্ট হিসেবে ২ জনের নাম বলেন।

১. John Money, Ph.D. যিনি ডাচ শিশুকাম জার্নাল PAIDIKA-তে সাক্ষাতকার দেন: বয়স্ক পুরুষ আর ছোট বালকের যৌন সহবাস গঠনমূলক হতে পারে, যদি উভয়ের সম্মতি থাকে।

২. John de Cecco, Ph.D. শিশুকাম জার্নাল PAIDIKA-র একজন সম্পাদক। এবং Journal of Homosexuality-তে বয়স্ক পুরুষ আর ছোট বালকের যৌন সহবাস (man-boy sexual contact) কে আখ্যায়িত করেন 'দুই প্রজন্মের কাছে আসা' হিসেবে।

পাঠক, এঁরা আমাদের জন্য বিজ্ঞান বানায়। APA-র আলোচনা এজন্য করা হল, কারণ সমকাম ও নারীবাদের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয় এবং প্রকাশিত হয় American Psychological Association-এর ব্যানারে। এবং এগুলোকে বিনাপ্রশ্নে মেনে নেয় পুরো দুনিয়া। সেখানে অবস্থা এই।

পশুকাম,শিশুকামকে স্বাভাবিক করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যম, মুভি, সিরিয়াল, গল্প, উপন্যাসের মাধ্যমে সমকামীদেরকে সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসার চেষ্টা

করা হয়েছে, পর্নমুভির মাধ্যমে হাতে কলমে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে সমকামিতা সহ সকল বিকৃত যৌনাচারের। আর এ কাজে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে এবং করে চলছে Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS), International Plant Parenthood Federation (IPPF), জাতিসংঘ, প্লেবয়ম্যাগাজিন, পর্ন ইন্ডাস্ট্রি, বিভিন্ন এনজিও ইত্যাদি।

পাশ্চাত্যের সেক্সিওলোজির পুরোটাই দাড়িয়ে আছে মিথ্যের ওপর। ইরাক, আফগানিস্তান, ইয়েমেনে ড্রোনে করে গনতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ফ্রিডোম অফ চয়েস ফেরি করে বেড়ানো পাশ্চাত্য কেন মিথ্যের ওপর দাড়িয়ে থাকা এই আইডিওলোজি গায়ের জোরে চাপিয়ে দিচ্ছে পুরো পৃথিবীর ওপর? অন্যের ব্যক্তিস্বাধীনতা, অন্যের ফ্রিডোম অফ চয়েসে নাক গলানোর অধিকার তাকে কে দিল? মুসলিম ভূখন্ডের অধিবাসীরা নিজেরাই ঠিক করে নিবে তারা সমকামিতা মেনে নিবে না বর্জন করবে, পাশ্চাত্যের গনতন্ত্রই তাদেরকে এই অধিকার দিয়েছে, পাশ্চাত্যের গনতন্ত্রই তাদেরকে এই অধিকার দিয়েছে তারা বেছে নিবে তাদের জীবন যাপনের পদ্ধতি। তাহলে কেন পাশ্চাত্যে জোর করে 'মুক্তি'-র পশ্চিমা সংজ্ঞা চাপিয়ে দিচ্ছে মুসলিমদের উপর? যারা ক্রমাগত চিন্তার স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়, বৈচিত্র্যের স্তুতি গেয়ে বেড়ায়, যারা মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারকে সম্মান করার কথা বলে তারাই কেন পশ্চিমা লিবারেলিসমের আদর্শগুলোকে সারা পৃথিবীর মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চায়? যা কিছু পশ্চিমা লিবারেলিজমের ছকের ভেতর পড়ে তা সভ্যতা; আর যা কিছু এর বাইরে তার সবই পশ্চাৎপদতা— কীভাবে তারা ঔদ্ধত্যভরে এই দাবি করে? কে তাদের অধিকার দিয়েছে?

ইনশাআল্লাহ্ এই পাঠে আমরা পাশ্চাত্যের সেক্সিওলোজির শিকড় ধরে টান দেবার চেষ্টা করব। আমরা দেখব কিভাবে পাশ্চাত্য গায়ের জোরে সমকামিতাকে স্বাস্থ্যকর হিসেবে প্রমাণ করে চলেছে। কিভাবে বাংলাদেশে মিডিয়া আর এনজিও ওয়ালারা সমকামিতার সমকামিতার প্রসারে কাজ করছে আপনারই নাকের ডগায়। আমরা মুখোশ খুলে দেবার চেষ্টা করব কিছু মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, কিছু ওরগানাইজেশান, কিছু ব্যক্তির এই দেশকে আপনার এবং আপনার সন্তানের জন্য বসবাসের অনুপোযুক্ত করে তুলছে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক।

সমকামিতা স্বাধীনতা, নাকি রোগ নাকি অন্যকিছু [২৪]

সমকামিতা নিয়ে কথা বললেই প্রথমে যে যুক্তি দিয়ে ঘায়েল করার চেষ্টা করা হয়, তা হলো - অন্য কিভাবে চলবে না চলবে তার নিজস্ব ব্যাপার। স্রষ্টা কাউকে সমকাম দিয়ে সৃষ্টি করলে তার অধিকার আছে তার পছন্দমতো জীবন বেছে নেওয়ার। এই প্রশ্নগুলো আমাদের দেশের কথিত মুক্তচিন্তকরা করেন পাশ্চাত্যের দর্শন টেনে এনে। মূলত সমকামিতাকে পাশ্চাত্যে ডাকা হয় 'একটি বিকল্প লাইফস্টাইল', 'ব্যক্তিগত পছন্দ' অথবা 'প্রাকৃতিক ব্যতিক্রম' হিসেবে অথচ সমকামিতাকে একটি অসুস্থতা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন American Psychiatric Association (APA)-এর মনোবিদেরা।[২৫] যদিও এখন আর অসুখের লিস্টে সমকামিতা খুঁজে পাওয়া যায়না বরং তার জায়গায় উল্টো হোমোফোবিয়া অর্থাৎ সমকামভীতিকেই এখন অসুস্থতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইসলাম এবং আমরা মুসলিমরা ক্রমাগত এর বিরোধিতা করে যাবার কারণে আজ আমাদের 'গোঁড়া', 'ভিন্নমতের প্রতি অসহনশীল' ইত্যাদি বিভিন্ন কথা শোনানো হচ্ছে। আর সমকামিতার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি খাঁড়া করে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, সমকামিতা শুধুই সামাজিক অবক্ষয় বা ব্যতিক্রমী সামাজিক ব্যবহারের ফসল নয় বরং বায়োলজিকালি এর ভিত্তি রয়েছে অর্থাৎ কিনা কিছু মানুষ জিনগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই সমকামী। আসুন দেখা যাক যুক্তিগুলো।

◆ সমাকামিতার বিরোধিতা করতে গিয়ে আগেকালের সভ্য মানুষ প্রথম যুক্তি এটাই দেখাত যে, সমকামি আচরণ পুরোটাই অস্বাভাবিক। পায়ুকাম কখনই সন্তান উৎপাদনে সক্ষম নয় যা কিনা যৌনতার প্রধান উদ্দেশ্য। 'প্রকৃতি' আমাদেরকে সমকামি করে বানায়নি এটাই ছিল মানুষের প্রথম যুক্তি।

কিন্তু সমকামিতার গবেষকরা, পৃথিবীবাসীর এই যুক্তির দুর্বলতাকে ততদিন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছিল যতদিন না তারা প্রাণিজগতের অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে সমকামি আচরণ প্রত্যক্ষ করে। ঘটনা হল, জাপানের উপকূলে তারা এমন কিছু সামুদ্রিক মাছের প্রজাতি খুঁজে পায় যাদের পুরুষ মাছেরা স্ত্রী মাছ হবার অভিনয় করে অন্য পুরুষ মাছের কাছে, যাতে করে অন্য পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদের গর্ভধারণের কারণ না হয়। তারা আরও দেখে

---

[২৪] (মূল লেখাটি ড. আবু আমিনাহ বিলাল ফিলিপস এর "কন্টেম্পোরেরি ইস্যুস" বই থেকে নেয়া। তবে পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রাখতে কিছু কথা অনুবাদক নিজ থেকে যোগ করেছেন, যা বন্ধনীর ভিতরে রেখে মূল লেখাকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।)

[২৫] (১৯৭৩ সাল পর্যন্ত Diagnostic and Statistical Manual (DSM) নামক রোগের তালিকায় 'সমকামিতা' ছিল। ১৯৭৩ সালে এর ২য় সংস্করণে বাদ দেয়া হয়। Out of DSM: Depathologizing Homosexuality, Jack Drescher, Behavioural Science (Basel). 2015 Dec; 5(4): 565–575)।

যে আফ্রিকার এক ধরণের প্রজাপতির পুরুষেরাও এই কাজটি করে থাকে।

আমাদের পাল্টা যুক্তি হল, যদি অন্য প্রাণীর আচরণ দিয়ে মানুষের আচরণ জাস্টিফাই করা লাগে তাহলে দক্ষিণ আমেরিকায় একধরণের মাকড়সা পাওয়া যায়, যার নারী সদস্যরা পুরুষের চাইতে আকারে বড় হয় এবং যৌনসঙ্গমের পর নারী পুরুষকে খেয়ে ফেলে। (তাহলে কি কিছুদিন পর এই আচরণও আইনের আওতায় আনা যাবেনা আর আমাদের স্ত্রীরা এরকম ক্যানিবালিজম[২৬] চালু করলেও এটা স্বাভাবিক হবে?)

◆ মানুষের মস্তিস্কের একটি এলাকা[২৭] আছে যা পুরুষের একটু বড় এবং মেয়েদের ছোট হয়। '৮০ এর দশকে দাবি করা হয়, সমকামি পুরুষদের এই এলাকাটি ছোট বলেই তারা সমকামি।

কিন্তু বিজ্ঞানের জগতে এই দাবি বেশিদূর এগোতে পারেনি। অংশটি ছোট প্রমাণ করার জন্য সমকামি গবেষকরা বেছে নিয়েছিল মৃত সমকামি পুরুষদের মস্তিস্ককে। বিজ্ঞানীরা এই ডেটাকে পাত্তা না দেবার এক নম্বর কারণ হল মস্তিস্কগুলো মৃত। এমন হতে পারে মৃত্যুর পর সেটি ছোট হয়েছে। আর দ্বিতীয়ত মস্তিস্কের অংশটি ছোট হয়ে যাওয়ার কারণে তারা সমকামি নাকি সমকাম চরিতার্থ করবার কারণেই তাদের ঐ জায়গাটি ছোট হয়ে গেছে তা জানা যায়না। এমনও হতে পারে যে তারা জন্ম নিয়েছিল সঠিক সাইজের অঙ্গ নিয়ে কিন্তু সমকামিতার কারণে তা বছরের পর বছর ধরে ধীরে ধীরে ছোট হয়ে গেছে। (এরকম ঘটনা ঘটার প্রমাণ আছে অন্য গ্ল্যান্ডের ক্ষেত্রে)

◆ সাম্প্রতিককালে জেনেটিক্স দিয়ে সমকামিতাকে সবচাইতে বেশি 'স্বাভাবিক বানাবার প্রয়াস চলছে। ১৯৯৩ সালে National Cancer Institute এর ড. ডীন হেমার, গে জিন আবিস্কারের দাবি করেন, "the first concrete evidence that 'gay genes' really do exist."

এই আবিস্কার হেমারের জীবনকে বদলে দেয়। সাদামাটা একজন গবেষক থেকে হেমার হয়ে যায় বিখ্যাত মিডিয়া ব্যক্তিত্ব। প্রেস্টিজিয়াস জার্নালে হেমারের গবেষণা প্রকাশিত হলে সংবাদপত্রের হেডলাইন থেকে টিভি চ্যানেলের ব্রেকিং নিউজ হয় হেমার। তার দাবি ছিল, সমকামি পুরুষেরা তাদের মায়েদের এক্স ক্রোমোসোমের থেকে এই বৈশিষ্ট্য পায়। কলরোডো সুপ্রিম কোর্টে হেমারের টেস্টিমোনি, সমকামি বিরোধী আইনকেও রদ করে দেয়।

---

[২৬] Cannibalism- নরখাদক স্বভাব

[২৭] (মস্তিস্কের interstitial nuclei of the anterior hypothalamus (INAH) এলাকা। A difference in hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men, LeVay S. et. al., Science, 1991 Aug 30.)

কিন্তু মজার ব্যাপার হল হেমারের অনুসরণ করা পদ্ধতি অনুসরণ করে, ওয়েস্টার্ন ওন্টারিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা[২৮] সেই গে জিন আবিস্কার করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে দেখা যায় হেমারের গবেষণায় কোন control group ছিলনা, যা কিনা বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি মৌলিক বিষয়। কিন্তু আসল মজার তখনও বাকি ছিল।

জুন ১৯৯৪ তে শিকাগো ট্রিবিউন রিপোর্ট[২৯] করে, হেমারের ল্যাবোরেটরির একজন জুনিয়র এসিস্টেন্ট, যে কিনা গে জিন আবিষ্কারের সময় সহায়তা করেছিল, ইচ্ছে করে করে সিলেক্টিভ রিপোর্ট করেছে। ঐ মহিলাকে হেমারের ল্যাবে post-doctoral fellowship থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়।

[নিজের স্বীকারোক্তি ছাড়াও Dr. Dean Hamer এর গবেষণাকে অনেক বিজ্ঞানীই ভুল প্রমাণ করেছেন। এখানে কয়েকটা সফল রিসার্চের কথা তুলে ধরা হল—

মানবজাতি জেনেটিক্সের ফিল্ডে এক বিরাট বড় অর্জন করে যখন তারা 'The Human Genome' প্রজেক্ট কমপ্লিট করে। এই প্রজেক্ট শুরু হয়েছিল ১৯৯০ সালে এবং শেষ হয় ২০০৩ সালে। এই প্রজেক্টের মাধ্যমে মানুষের জেনেটিক কোডের সিকুয়েন্সগুলোকে ম্যাপিং করার উদ্দেশ্যে এটি তৈরি করা হয়।[৩০] কিন্তু এই প্রজেক্ট দিয়ে তথাকথিত 'Gay gene' কে আইডেন্টিফাই করা সম্ভব হয়নি।

X ও Y হল মানুষের সেক্স ক্রোমোসোম। X ক্রোমোসোম ১৫৩ মিলিয়ন base pairs এবং ১১৬৮টি জিন ধারণ করে। X ক্রোমোসোমের থেকে ছোট ক্রোমোসোম Y তে আছে ৫০ মিলিয়ন base pairs এবং ২৫১টি জিন। এই ক্রোমোসোমগুলোকে নিয়ে গবেষণা করেছে Baylor University, The Max Planck University, The Sanger Institue, Washington University মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার এবং প্রচুর সময় খরচ করে এবং তাদের রিসার্চে তারা 'Gay gene' এর অস্তিত্ব X ক্রোমোসোমেও পায়নি, Y ক্রোমোসোমেও পায়নি।[৩১]

Dr. George Rice নামের আরেকজন বিজ্ঞানী পরবর্তীতে ডিন হ্যামারের মত একই গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু Dr. George এই গবেষণা থেকে কোনো পজিটিভ ফলাফল লাভ করতে পারেননি। Dr. George Rice তার গবেষণার ফলাফল সম্পর্কে

---

[২৮] *Male Homosexuality: Absence of Linkage to Microsatellite Markers at Xq28, George Rice et. al., Science, 23 Apr 1999: Vol. 284, Issue 5414, pp. 665-667*
ভালো তুলনামূলক একটা আর্টিকেল পাবেন এখানে shorturl.at/gpqvV

[২৯] STUDY ON `GAY GENE' CHALLENGED, John Crewdson. CHICAGO TRIBUNE, june 25 1995 [shorturl.at/mrtL0]

[৩০] How it works, issue 49

[৩১] www.trueorigin.org/gaygene01.asp

বলেন, ''আমাদের গবেষণার তথ্যউপাত্ত এমনকোন জীনের উপস্থিতিকে সমর্থন করে না যা কিনা Xq28 পজিশন দ্বারা sexual orientation কে শক্তিশালীভাবে প্রভাবিত করতে পারে।''[৩২]

Dr. Neil Whitehead বায়োকেমেস্ট্রির পিএইচডিপ্রাপ্ত একজন অধ্যাপক। উনি এই বিষয় নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন যা বিজ্ঞান মহলে সমাদৃত হয়েছে। উনি জন্মগতভাবে সমকামী হওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, ''সমকামিতা জন্মগত নয়, জিনেটিক দ্বারা নির্ধারিতও নয় এবং সমকামিতা অপরিবর্তনশীলও নয়।''[৩৩]

এছাড়া সমকামীরা Drs. J Michael Bailey, Richard C. Pillard এর পুরোনো Twin Studies রিসার্চকেও দাবি প্রমাণে ব্যবহার করে[৩৪] । অথচ এই স্টাডি উল্টো আরো প্রমাণ করে যে সমকামিতা জন্মগত নয়। আসলে শুধু জীন দ্বারা মানুষের যৌনতার ভূৎপত্তি নির্ধারিত হয় না। কেউ জন্মগতভাবে Heterosexual ও না আবার কেউ জন্মগতভাবে Homosexual ও না। বরং মানুষ যৌন আচরণ করতে শিখে পরিবেশ থেকে, বায়োলজিরও ভূমিকা আছে এইক্ষেত্রে।"

এছাড়া অন্য বিভিন্ন অনুসন্ধান থেকেও জানা যায়, সমকামিতা জন্মগতভাবে প্রাপ্ত কোনও বিষয় নয়। "The Washington Post" একবার রিপোর্ট করেছিলো যে, 'অধিকাংশ অনুসন্ধানে দেখা যায়– উভকামিতা নারী পুরুষ, বিশেষ করে নারীর ক্ষেত্রে এখন একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এই অনুসন্ধানে দেখা যায় প্রথমদিকে তারা বিপরীত লিঙ্গের দিকে যায় (সাধারণ)- তারপরে তারা ঝুঁকে সমকামিতার দিকে তার পর তারা হয় উভকামী। আর একদম শেষ দিকে তারা আবার বিপরীত লিঙ্গের দিকে ফিরে আসে (সাধারণ)।[৩৫]

রিপোর্টার ল'রা সিজন স্টেপ সেই রিপোর্টে লিখেছেন, সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে দেখা যায়, সমকামিতা সামাজিক মিথস্ক্রিয়া থেকেই উদ্ভূত হয়। সমকামিতা এক ধরনের আবেগ, কৌতূহল, আকর্ষণ এর দিকে ধাবিত হয়ে উদ্ভূত হয় এবং এটা স্বল্পস্থায়ী যা– সময়ের সাথে পরিবর্তন হয়ে যায়।

ল'রা তার রিপোর্টে কিছু গবেষণা তুলে ধরেন। এর মধ্যে একটি হল – লিসা

---

[৩২] George Rice, et al., "Male Homosexuality: Absence of Linkage to Microsatellite Markers at Xq28," Science, Vol. 284, p. 667.

[৩৩] Neil and Briar Whitehead,My Genes Made me Do it!,page 9

[৩৪] Human Sexual Orientation Has a Heritable Component, Human Biology, Vol. 70 (1998), Iss. 2

[৩৫] Partway Gay? For Some Teen Girls, Sexual Preference Is a Shifting Concept, Laura Sessions Stepp, The Washington Post, January 4, 2004 [shorturl.at/ghJZ9]

ডায়মন্ডের। তিনি ইউনিভার্সিটি অফ উতাহ এর মনোবিদ্যার সহযোগী অধ্যাপক। তিনি ১৯৯৪ সালে একটা গবেষণায় – ১৬ থেকে ৪৩ বছর বয়সী নারী সমকামীদের নিয়ে কাজ করেছিলেন। সেখান থেকে দেখা যায় – দুই তৃতীয়াংশ নারীই পরিবর্তীতে সমকামিতা থেকে সরে এসেছেন। আবারো বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত হয়েছেন।[৩৬]

এরকম আর হাজারো হাজারো গবেষণা হয়েছে – যেখানে দেখা গেছে – সমকামিতাকে প্রায় সবাই অতিক্রম করে ফেলেছেন। সমকামিতাকে অতিক্রম করা কোনদিনই অসম্ভব ছিল না। যদি এটা জিনেটিক ব্যাপারই হত– তাহলে সেটা সম্ভব হত না। এর থেকে আবারো দেখা যায়– এটা শুধুই একটা মনোবিকার। অসংখ্য সমকামী তাদের পথ থেকে ফিরে এসেছেন। যার- ফলে এই শব্দটাকে কবর দেবার সময় এসেছে – "born gay"।

১৯৯৩ সালে, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির দুই প্রফেসর Drs. William Byne এবং Bruce Parsons তাদের – "gay gene" studies on brain structure and on identical twins নিয়ে গবেষণা প্রবন্ধ লিখেন। দীর্ঘ গবেষণা শেষে তাদের প্রবন্ধ – "Archives of General Psychiatry" তে প্রকাশ করেন। তারা তাদের গবেষণায় – গে জীন নিয়ে গবেষণাগুলির মধ্যে অনেক পদ্ধতিগত ত্রুটি পান এবং শেষে উল্লেখ করেন,

'There is no evidence at present to substantiate a biologic theory. … he appeal of current biologic explanations for sexual orientation may derive more from dissatisfaction with the present status of psychosocial explanations than from a substantiating body of experimental data'[৩৭]

তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করে দেন – বায়োলজিক্যালি সমকামিতার পক্ষ কোনো প্রমাণই পাওয়া যায় না। এটা নিখাদ একটা মানসিক সমস্যা। একে বিজ্ঞান নয় – মনোবিদ্যার হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। বিজ্ঞানের এখানে কিছু নেই। এটা মানসিক সমস্যা।

এই গবেষণা ব্যাপক তোলপাড় শুরু করে। এই প্রফেসরেরা এবার পড়লেন ব্যাপক তোপের মুখে। সমকামিরা এই প্রফেসরদের গবেষণার ফলাফলে বলেন এর দ্বারা কনজারভেটিভদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হল। Byne ঘোষণা করেন যে – "false dichotomy:Biology or Choice?"। তিনি স্পষ্টই বলেন, তিনি এই ক্ষেত্রে প্রায়

---

[৩৬] Female bisexuality from adolescence to adulthood: Results from a 10-year longitudinal study. Diamond, L. M. (2008), Developmental Psychology, 44(1), 5–14

[৩৭] William Byne and Bruce Parsons, "Human Sexual Orientation: The Biologic Theories Reappraised," Archives of General Psychiatry, Vol. 50, March 1993: 228-239

নিশ্চিত যে – এটা প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়। অনেকগুলি কেস থেকেও এমন কাউকে পাওয়া যায়নি যে সচেতনভাবে তার সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি বুঝে নিয়ে যৌনতায় লিপ্ত হয়েছে। যাই হোক, তিনি বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণের সাথে উপসংহার টানেন – যে এটা কোনমতেই প্রাকৃতিক হতে পারে না।

মানুষ রোবোট নয়। তার নিজস্ব বুদ্ধি বিবেচনা দিয়েই সে কাজ করে এবং আল্লহ তার সেই কাজের হিসাব নেন যা সে জেনে বুঝেই করে। যদি সমকামিতা আসলেই জিনগত কারণে হত, ঈশ্বর কখনই একে পাপ হিসেবে চিহ্নিত করতেন না।][৩৮]

(সমস্যা হল হেমারের আবিষ্কার পত্রপত্রিকার হেডলাইন হলেও, পরের কেচ্ছাগুলো তেমন মিডিয়া কভারেজ পায়নি। তাই জনসাধারণের মনে এখনও গে জিনের ভূত খুঁটি গেড়ে বসে আছে)

◆ ইসলাম হঠাৎ করে পৃথিবীতে সমকামবিরোধি আইন আনেনি। বরং মানুষের ইতিহাস সমকামকে ঘেন্না করেছে। Torah[39] তে স্পষ্টভাবেই এই আচরণকে গর্হিত বলা হয়েছে।

ফলাফল হিসেবে এইডস রোগই যথেষ্ট এটা প্রমাণ করার জন্য যে সমকামিতা সমাজের জন্যে ভয়াবহ। এইডস প্রথমদিকে সবচাইতে বেশি ছড়িয়েছে সমকামি কমিউনিটিগুলোর মধ্যে। এবং তারপর এটি ড্রাগ ও রক্তদানের মাধ্যমে এবং সবশেষে সাধারণ যৌন আচরণের মানুষের মধ্যে এটি ছড়িয়ে পড়ে।

(পায়ুকাম ও এর কারণে রক্তপাত এইডস সংক্রমণের জন্যে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। একজন এইডস রোগীর সঙ্গে স্বাভাবিক যৌন আচরণের ফলে এইডসে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা, পায়ুকামের তুলনায় নগণ্য। তাই সবচাইতে মজার ব্যাপার হল, ঘোর সেক্যুলাররাও এইডস সংক্রান্ত সেমিনারে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার উপদেশ দেয়)

◆ ইসলাম সমকামিতাকে সম্পূর্ণ ব্যক্তি মানুষের পছন্দ হিসেবে বিবেচনা করে। এটি কোন রোগও নয়। এটা কখনই হতে পারেনা যে ঈশ্বর কিছু মানুষকে সমকামি করে সৃষ্টি করলেন এবং তারপর একে একটি অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তির বিধান দিলেন। আল্লাহ্ কখনই এরকম অবিচার করেননা। কোন বিষয়ের প্রতি বহু মানুষের ঝুঁকে পড়াটাই সে বিষয়টি স্বাভাবিক হবার জন্য যথেষ্ট নয়। মানুষের সমাজে নানা অনাচার প্রবণতা দেখে দিতে পারে আধুনিক মানুষের জটিল

[৩৮] আব্দুর রহমান রাহীল

[৩৯] Torah দ্বারা এখানে ইয়াহূদীদের ধর্মিয় কিতাব উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত তাওরাত বিকৃত হয়ে যাওয়ায় সেখানে আল্লাহ তা'আলা কী বলেছিলেন তা আমরা জানতে পারিনা। [শারঈ সম্পাদক]

জীবনযাত্রার বিভিন্ন ধরণের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কার্যকলাপের কারণে; সেটা হতে পারে ব্যভিচার থেকে ধর্ষণ, নেক্রফিলিয়া থেকে পাশবিকতা। এসব অনাচারের পিছনে দায়ী হতে পারে মিডিয়ার প্রভাব কিংবা মানুষের কুমন্ত্রণা।

মানুষ রোবোট নয়। তার নিজস্ব বুদ্ধি বিবেচনা দিয়েই সে কাজ করে এবং আল্লহ তার সেই কাজের হিসাব নেন যা সে জেনে বুঝেই করে। যদি সমকামিতা আসলেই জিনগত কারণে হত, ঈশ্বর কখনই একে পাপ হিসেবে চিহ্নিত করতেন না।

একেবারে সম্প্রতি কিছু বিজ্ঞানী বলছেন, পেশাদার খুনিদের কিছু জিনগত বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য মানুষ থেকে আলাদা।[৪০]

তাই বলে কি কাল থেকে আমরা খুনিদের ক্ষমা করে দিয়ে, মানুষ হত্যা আইনত জায়েজ করে দেবো ?

♦ ইসলাম মা-বাবা হিসেবে আমাদের নির্দেশ দেয়, আমরা যেন ১০ বছর বয়স থেকে আমাদের সন্তানদের বিছানা পৃথক করে দেই যাতে করে শৈশবের শিশুসুলভ কৌতুহল থেকে উৎসারিত কোন অনাকাঙ্ক্ষিত যৌনতা, আমাদের সন্তানদের স্পর্শ না করে। এমনকি স্কুলে বা অন্য এডাল্টদের দ্বারা আক্রান্ত হবার কারণেও এ ধরণের ঘটনা যে ঘটতে পারে, সে সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

সমকামিতা কি জেনেটিক্যাল?

এই কমিউনিটির মানুষরা অনেক দিন থেকেই দাবি করে আসছে সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন বায়োলোজিক্যালি প্রি-ডিটারমাইন্ড, সহজাত এবং জন্মগত একটি বৈশিষ্ট্য। বাস্তবতা হলো, তাদের এই 'জন্মগতভাবে সমকামী' দাবির পক্ষে বৈজ্ঞানিক কোনো তথ্য, উপাত্ত নেই, বরং গত বছর আমেরিকার জন হপকিন্সের দুই বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট প্রায় ২০০ সাইন্টিফিক জার্নাল ঘেটে নিউ অ্যাটলান্টিস নামক জার্নালে একটা প্রতিবেদন ছাপিয়েছেন যেখানে তারা দেখিয়েছে সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের সাথে সহজাত, জন্মগত বা বায়োলোজিক্যাল যে সম্পর্ক এতদিন ভাবা হতো তার বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি নেই। কিছু বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টর আছে যার সাথে লৈঙ্গিক আচরণগত সম্পর্ক আছে কিন্তু সেটা কোনো মতেই ওরিয়েন্টেশনে ভূমিকা রাখে না।

ইদানিং অনেকে নেচার নিউজের একটা লিংক শেয়ার করছে, সেখানে নাকি দাবি করা হয়েছে সমকামিতার সাথে জিনের সম্পর্ক রয়েছে। এদের অজ্ঞতার সীমা

[৪০] Two genes linked with violent crime, BBC News [https://www.bbc.com/news/science-environment-29760212] Are murderers born or made?, BBC News

নাই। প্রথমত, গবেষণাটি নেচার জার্নালে প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধ না, এটা একটা সায়েন্টিফিক কনফারেন্সে একজন বিজ্ঞানীর দেয়া গবেষণার আপডেট। বিষয়টা হলো, সেখানে দাবি করা হয়েছে, সমকামিতার সাথে সম্ভাব্য জিনগত সম্পর্কটা প্রচলিত ক্লাসিকাল জেনেটিক্সের মতো নয়। এর সাথে এপিজেনেটিক্স নামে বায়োলজির নতুন একটি শাখার সম্পর্ক। সংক্ষেপে বলতে গেলে এপিজেনেটিক্স হলো, এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর বা বাহ্যিক কোনো কারণে ক্রোমোসোমের কেমিক্যাল চেঞ্জ ঘটে যার ফলে ডিএনএ'র কোনো পরিবর্তন হয়না কিন্তু জিনের ফাঙ্কশন চেঞ্জ হয়ে যায়। এটা জীবনের যেকোনো পর্যায়ে হতে পারে। এপিজেনেটিক্যাল চেঞ্জ প্রাত্যাহিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত অনেক কারণেও হতে পারে, যেমন, ড্রাগ, টক্সিক কেমিক্যাল, ডায়েট, স্ট্রেস এবং অন্যান্য এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস।

সমকামিতার সাথে এপিজেনেটিক্সের সম্পর্ক আছে কি নাই এটা বলার মতো অবস্থা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে তবে এখন আপনাদের মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া প্রমাণিত কিছু এপিজেনেটিক্সের ফলাফল উদাহরণসহ উল্লেখ করবো।

◆ **মায়ের প্রভাব:** আমরা অনেকেই কথাটা জানি, মায়েদের স্বাস্থ্যের উপরে গর্ভের সন্তানের সুস্থতা ও শারীরিক সক্ষমতা নির্ভর করে। এর মূল কারণটা অনেকেই জানে না যে, এটা এপিজেনেটিক্সের কারণেই হয়ে থাকে। ইঁদুরের উপরে এক গবেষণায় দেখা গেছে মাতৃত্বকালীন ডায়েট ও স্ট্রেস জরায়ুর ভ্রূণের উপরে প্রভাব ফেলে। আমরা অনেকসময় বলি, গর্ভবতী মায়েদের ধুমপান অনাগত সন্তানের স্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে। গবেষণায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, গর্ভকালীন স্মোকিং ডিএনএ'র এক্সপ্রেশনে প্রভাব ফেলে। এমনকি মাতৃত্বকালীন সাইকোলোজিক্যাল ও সোশ্যাল বিহেভিয়র সাথে মানুষিক স্ট্রেস এপিজেনেটিক্যাল চেঞ্জ ঘটায়। ইঁদুরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মা ইঁদুরের স্ট্রেসের কারণে নবজাতকের নিউরোলোজিক্যাল ডিফেক্ট হয়েছে।

◆ **পিতার প্রভাব:** শুধু মায়েদেরই নয়, বাবাদের স্বাস্থ্যের সাথেও সন্তানের সুস্থতা সম্পর্কিত। অতিরিক্ত এলকোহল পান করলে ও টক্সিক কেমিক্যালের কারণে যথাক্রমে স্পার্মের ডিএনএ'র মিথাইলেশনে[৪১] ও জার্মলাইনে[৪২] প্রভাব পড়ে, যা একটি এপিজেনেটিক্যাল পরিবর্তন।

◆ **প্রসবকালীন প্রভাব:** অবাক করা তথ্য, সিজারিয়ান বেবিদের ডিএনএ'র মিথাইলেশন নরমাল ডেলিভারড বেবিদের থেকে বেশি থাকে, যা এপিজেনেটিক্যাল।

---

[৪১] ডিএনএ তৈরির একটি ধাপ।

[৪২] জননকোষ যারা জিনকে বয়ে নেয় পরের প্রজন্মে

শিশুদের বেড়ে উঠার সময়ে পারেন্টসদের কেয়ার, সোশ্যাল বিহেভিয়ার, স্ট্রেস এডাপটেশন ইত্যাদি পরবর্তীতে ডিএনএ'র এপিজেনেটিক্যাল মোডিফিকেশনের মাধ্যমে বায়োলজিক্যাল মেমরি ও নিউরোন সার্কিট ডেভেলপমেন্টে ভূমিকা রাখে।

এইভাবে বয়ঃসন্ধিতে, সাবালকত্বে, অনেক এনভায়রনমেন্টাল ও সোশ্যাল ফ্যাক্টর আছে যা মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে ভূমিকা রাখে। এ সবই এপিজেনেটিক্যাল ডিএনএ মোডিফিকেশনের ফলাফল।

আমরা জানতে পারলাম **যেসব পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক ফ্যাক্টর ডিএনএ'র কাজকে পরিবর্তন করে, যাকে আমরা এপিজেনেটিক্স বলছি, তার সবগুলোই মানুষের 'চয়েস' বা ইচ্ছাকৃত।** সমকামিতাও একটি 'চয়েস' যার ফলে পরবর্তীতে এপিজেনেটিক্যাল পরিবর্তন হচ্ছে (এখনো চূড়ান্তভাবে অপ্রমাণিত)।

বংশগত জেনেটিক অসুখগুলো (যেমন, এনিমিয়া, সিস্টিক ফ্রিব্রোসিস ইত্যাদি) ক্রোমোসোমে পরিবর্তনের ফলে হয়ে থাকে। মায়ের থাকলে সন্তানের হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ। এখানে মায়ের কিছুই করার থাকে না, কারণ এটা তার জিনের পরিবর্তনের ফল। পক্ষান্তরে, এপিজেনেটিক্যাল পরিবর্তনের জন্য মানুষের নিজস্ব কর্মকান্ড (ড্রাগ, এলকোহল, ধূমপান, স্ট্রেস ইত্যাদি) দায়ী থাকে। 'সমকামিতার সাথে জিনের সম্পর্ক আছে'— দাবি করাটা ততটাই হাস্যকর, যতটা হাস্যকর 'অতিরিক্ত মদপান, ধূমপান বা ড্রাগ এডিকশনের জন্য জিন দায়ী'— দাবি করাটা।

আরো একটি তথ্য জানিয়ে দিচ্ছি, গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে উঠা একজন মানুষের সমকামী হওয়ার সম্ভাবনা শহরে বেড়ে উঠা কারো থেকে ন্যূনতম ৪ গুন্ কম, যা প্রমান করে সমকামিতা একটি পলিটিকাল, সোশ্যাল ও কালচারাল ট্রেন্ড।[৪৩] ("কদর্যতার নেপথ্য কারণ" অংশে আমরা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত দেখব)

সমকামিতা কি অপরিবর্তনীয় ?

সমকামীদের আরেক বিভ্রান্তি হল যে সমকামিতা হল অপরিবর্তনীয়! এটা একটা ভুল ধারণা। সমকামীরা যেমন বিষমকামী হতে পারে, তেমনি বিকৃত মনের অধিকারী বিষমকামীরাও সমকামী হতে পারে। কিন্তু এখানে একটা বড় বিষয় বিষমকামীদের তুলনায় সমকামীরাই নিজেদের বেশি পরিবর্তন করে। নিচের ফিগারটি দেখলে এটা

[৪৩] Large cities may provide a congenial environment for the development and expression of same-gender interest. [Laumann, Edward O.; John H. Gagnon; Robert T. Michael; Stuart Michaels (1994). The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States, page. 561]
In Denmark, people born in the capital area were significantly less likely to marry heterosexually, and more likely to marry homosexually, than their rural-born peers. [Childhood Family Correlates of Heterosexual and Homosexual Marriages: A National Cohort Study of Two Million Danes, Morten Frisch]

বুঝতে পারবেন–
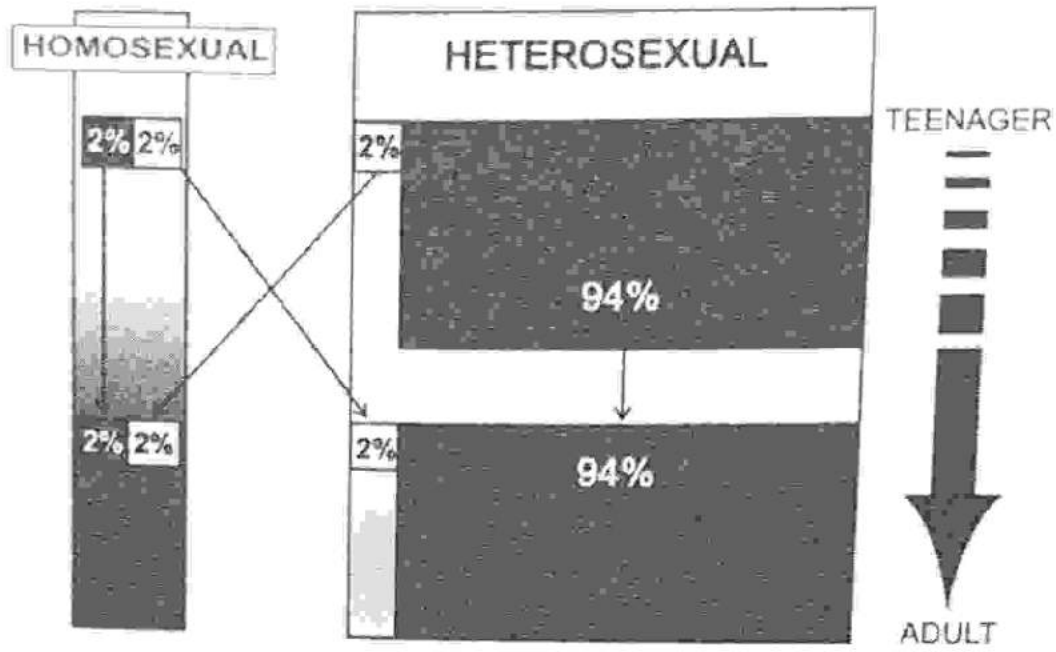
Figure1-: Showing natural movement between sexual orientations

এই ফিগারে দেখা যাচ্ছে যে টিনএজার সমকামীদের প্রায় অর্ধেকই বিষমকামী হয়ে যায় পরবর্তীতে অর্থাৎ ৪% টিনএজার সমকামীদের প্রায় ২% বিষমকামী হয়। অপরদিকে ৯৪% বিষমকামী টিনএজারদের মধ্যে মাত্র ২% পরবর্তীতে সমকামী হয়।[৮৮]
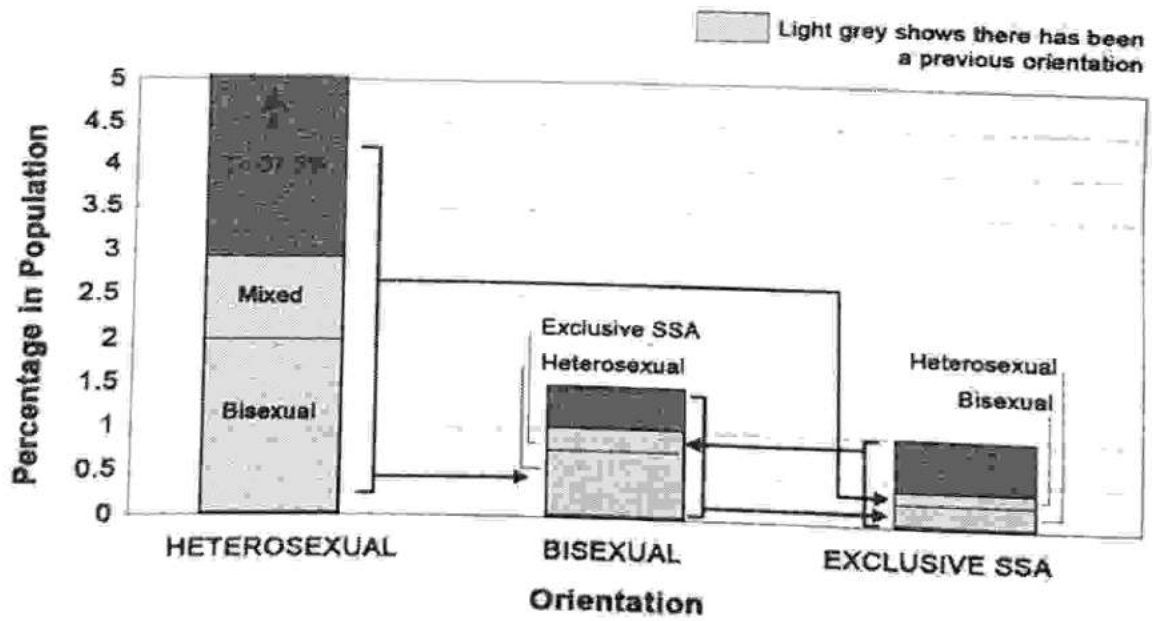
Figure2-: Movement of male adults between homosexuality and heterosexuality over a lifetime. Most movement is towards heterosexuality. Within each vertical column light grey labelled blocks indicate the previous orientation'

ফিগার-২ এ পুরুষদের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন দেখানো হয়েছে, (SSA=Same Sex Attraction সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ)[৮৫]

---

[৪৪] Bell AP, Weinberg MS, Hammersmith SK. 1981. Sexual Preference: Its Development In Men and Women. Bloomington, Indiana: Indiana University Press

[৪৫] Kinnish KK, Strassberg DS, Turner CW. 2005. Sex differences in the flexibility of sexual orientation: a multidimensional retrospective assessment. Archives of Sexual Behavior 34:175-83
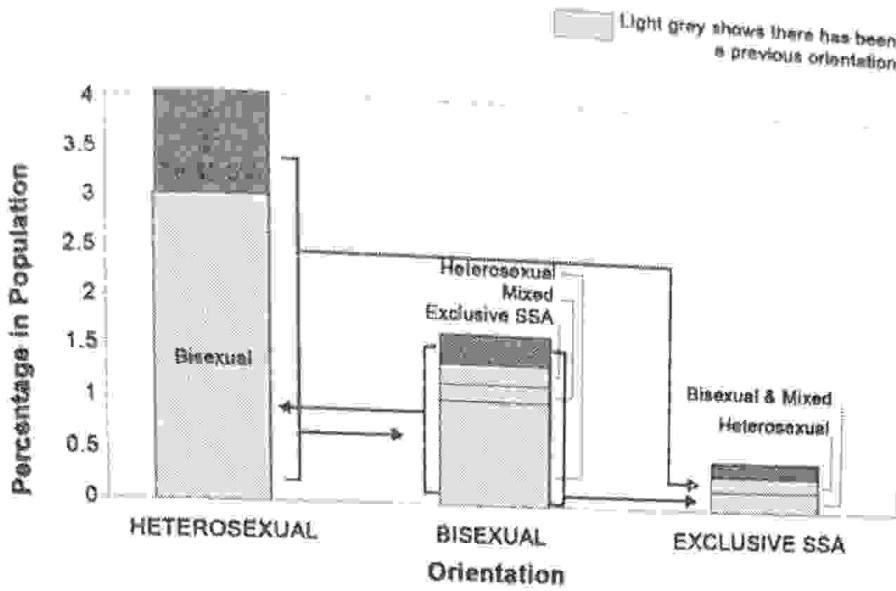
Figure3-: Movement of female adults between lesbianism and heterosexuality. Most movement is towards heterosexuality'

ফিগার-৩ এ নারীদের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। (SSA=Same Sex Attraction)[৮৬]

ফিগার-২ ও ফিগার-৩ দেখে যে সিদ্ধান্তগুলো নেয়া যায়—

১) বেশিরভাগ পরিবর্তন হল Heterosexuality এর দিকে।

২) যারা Heterosexuality তে পরিবর্তিত হচ্ছে তাদের সংখ্যা Bisexual ও exclusive SSA (SSA=Same Sex Attraction) এর সংখ্যার সমষ্টির থেকেও বেশি!

এই জরিপগুলো দেখলে সহজেই বুঝা যায়, সমকামিতা কোন স্থির অবস্থা নয় বরং এটা পরিবর্তনশীল। অপরদিকে বিষমকামীদের নগণ্য পরিবর্তন দেখে বলা যায় যে, বিষমকামিতা হল স্থির অবস্থা। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমকামিতা হল একটা অস্বাভাবিক অবস্থা কারণ অস্থিরতা হল অস্বাভাবিক অবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য

Homosexuality & Heterosexuality এর মধ্যে পার্থক্যঃ

Homosexuality (সমলিঙ্গের সাথে কাম) বা Heterosexuality (বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কাম)— কোনোটার পেছনেই জিনেটিক প্রভাব নেই। আসলে জীন আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং জীন আমাদের একটা অবস্থার জন্য প্রস্তুত করে। যেমন, জীন আমাদেরকে সঙ্গম করার জন্য প্রস্তুত করে। কিন্তু আমরা কিভাবে সঙ্গম করব, সেটা জীন নির্ধারণ করতে পারে না, সেটা নির্ধারিত হয় ব্যক্তির দ্বারা। অর্থাৎ

[৮৬] Kinnish KK, Strassberg DS, Turner CW. 2005. Sex differences in the flexibility of sexual orientation: a multidimensional retrospective assessment. Archives of Sexual Behavior 34:175-83

Homosexuality হল 'matter of choice'।

কিন্তু Heterosexuality এর পেছনে বায়োলজিক্যাল ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব রয়েছে। মানুষের জন্য Heterosexual হওয়া হল স্বাভাবিক। কারণ Heterosexuality এর সাথে মানুষের টিকে থাকা (Survival instinct) ও জন্মদানের (reproductive instinct) সহজাত সম্পর্ক আছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই দুটো ছাড়া মানুষের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাবে। অথচ সমকামের সাথে এই দুই instinct-এর কোন সম্পর্কই নেই !

সমকামীরা সঙ্গম করার পর অসুস্থতাছাড়া অন্য কোন ফলাফল পায় কি? না পায় না। অর্থাৎ তারা ইনপুট করে ঠিকই কিন্তু কোন আউটপুট পায় না! এর কারণ হল যে তারা ভুল বায়োলজিক্যাল তথ্য ইনপুট করছে মানব শরীরে অথচ Heterosexual রা সঠিক বায়োলজিক্যাল তথ্য ইনপুট করছে বলে তারা বায়োলজিক্যাল আউটপুটও পাচ্ছে।

এখানে একটা জিনিস লক্ষ্যণীয় যে সমকামীদের অস্তিত্ব Heterosexual দের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল কিন্তু Heterosexual দের অস্তিত্ব সমকামীদের উপর নির্ভরশীল নয় কারণ সমকামীদের বংশবৃদ্ধি করার কোন ক্ষমতাই নেই, এইজন্য Homosexuality হল একটা ভঙ্গুর অবস্থা অথচ Heterosexuality হল একটা শক্ত অবস্থা। এ কারণে পৃথিবীর সব সমকামীদের যদি আপনি একটা দ্বীপে অবস্থান করতে দেন তাহলে এরা এমনিতে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এছাড়া অন্যান্য রিসার্চের দ্বারা Homosexuality ও Heterosexuality এর মধ্যে যেসব পার্থক্যগুলো জানা যায়–

- UCLA এর রিসার্চাররা তাদের একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, সমকামীদের যৌন সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয় না।তাদের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে প্রায় ৫১% সমকামী পুরুষদের Relationship Status হল সিঙ্গেল, অথচ বিষমকামী পুরুষদের ক্ষেত্রে পরিমাণটা হল মাত্র ১৫%![৪৭]
- সমকামীরা বিষমকামীদের তুলনায় দ্বিগুণ যেন সমস্যার মুখোমুখি হয়।[৪৮]
- সমকামীরা যদি কারো সাথে সম্পর্কও করে তবুও সেই সম্পর্ক বেশিদিন

[৪৭] Charles Strohm, et al., "Couple Relationships among Lesbians, Gay Men, and Heterosexuals in California: A Social Demographic Perspective," Pa-per presented at the annual meeting of the American Sociological Association, Montreal Convention Center, Montreal, Quebec, Canada, (Aug 10, 2006): 18. Accessed at: http://www.allacademic.com/metaplo.1912 index.html

[৪৮] Laumann EO, Paik A, Rosen RC. 1999. Sexual dysfunction in the United States: Prevalence and predictors. JAMA 281:537–44

টিকে না। ৬০% সমকামী পুরুষদের সম্পর্ক ১ বছরেরও কম টিকে এবং বেশিরভাগ সমকামী নারীদের সম্পর্ক ৩ বছরেরও কম টিকে।[৪৯]

এছাড়াও Homosexuality এর আরো সমস্যা আছে। আর Heterosexuality এর সমস্যা এতটাই কম যে সেটাকে অগ্রাহ্য করা যায়।

এইজন্যই আমাদের শরীর তৈরী মূলত Heterosexuality এর জন্য। Dr. Neil Whitehead এই সম্পর্কে বলেন –

"যদি DNA তে কিছু প্রোগাম হতে যায় তাহলে আপনি ধরে নিতে পারেন যে সেটা Heterosexuality হবে।"[৫০]

---

[৪৯] West DJ. 1977. Homosexuality Reexamined. London: Duckworth

[৫০] My genes made me do it! by Dr Neil Whitehead page-79

পাঠ ১১।। গোঁজামিল

উভলিঙ্গ প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজনন নাকি সমকামিতা

প্রকৃতিকে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী একলিঙ্গ ও উভলিঙ্গ উভয় প্রকারের প্রাণীই দেখা যায় উচ্চশ্রেণীর প্রাণী যেমন মানুষ, শিম্পাঞ্জি, বানরসহ বহু প্রজাতি একলিঙ্গ প্রাণির উদাহরণ। আবার নিম্নশ্রেণীর প্রাণী ও বহু উদ্ভিদের উভলিঙ্গ বৈশিষ্ট্যা দেখা যায়। এই উভলিঙ্গ-ত্ব ঐ নিম্নশ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য স্বাভাবিক। আসলে ইকো-সিস্টেমে যেই প্রাণী ও উদ্ভিদের দ্রুত বংশবিস্তার প্রয়োজন এবং যাদের প্রতিকূল পরিবেশেও দ্রুত বংশবিস্তার চাইয়ে যেতে হয় তাদের মাঝেই এই উভলিঙ্গ বৈশিষ্ট্য মহান আল্লাহ্ দিয়ে রেখেছেন। যেমন- উদ্ভিদের পরাগায়ণ সমপন্ন হবার জন্য বাতাস একটি বড় ফ্যাক্টর কারণ গাছেরা তো আর আমাদের মতো চলাচল করতে পারে না। তাই তাদের পরাগায়ণ যাতে খুব সহজেই সম্পন্ন হতে পারে এজন্যই অসংখ্য উভলিঙ্গ ফুল বিশিষ্ট উদ্ভিদ প্রকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। উদাহরণ সরূপ জবা কিংবা ধুতুরা ফুলের কথা বলা যেতে পারে। আবার অনেক ক্ষুদ্র প্রাণী আছে যাদের অনেক প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলা করতে হয়। সেই অবস্থায়ও যাতে তাদের বংশবিস্তার দ্রুততার সাথে অব্যাহত থাকে তার জন্য ঐ প্রাণীগুলোতেও উভলিঙ্গ বৈশিষ্ট্য দেয়া আছে।

অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতিতে একলিঙ্গ ও উভলিঙ্গ উভয় ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ বিদ্যমান। কিন্তু এই স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যেও অনেক সময় ব্যতিক্রম দেখা যায়। একলিঙ্গ প্রাণীদের মধ্যে রোয়াগের কারণে কিছু কিচু উভলিঙ্গ বৈশিশট্য অস্বাভাবিকভাবেই অনেক সময় দেখা যেতে পারে। যেমন- হিজড়া বা intersex শিশুদের কথা ধরা যেতে পারে। মেডিক্যাল সাইন্স অনুযায়ী কোনও না কোনও রোগের কারণেই এই অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। যেমনঃ Klinfelter's syndrome, turner's syndrome.

প্রশ্ন হলোঃ এই সব রোগের কারণে যে হিজড়া/intersex অবস্থা পরিলক্ষকিত হয় তার কারণে কি মানুষকে উভলিঙ্গ প্রানী হিসেবে অবহিত করা যায়!!?? নিশ্চয়ই না, কারণ রোগকে স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নেওয়ার মতো মূর্খতা কোনও স্বাভাবিক বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মানুষের কথা নয়। কিন্তু এই মূর্খতাই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে করেছেন নাস্তিক্যবাদী লেখক অভিজিত রায়। তিনি বারংবার তার বইয়ে হিজরাদের এই বৈশিষ্ট্যকে স্বাভাবিক বলে বুঝতে চেয়েছেন। তিনি হিজড়াদের

মাঝে যে একি সঙ্গে পুরুষ ও স্ত্রী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাকে স্বাভাবিক বলে চালিয়ে দিতে চান। তার যুক্তি হলো এগুলো তো মানব সমাজের আদিকাল থেকেই ছিল, সুতরাং এটি স্বাভাবিক!!!!

প্রশ্ন জাগে কি? আদিকাল থেকেই তো মানব সমাজের জন্মান্ধ, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। তাই বলে কি, "অন্ধ চোখ কে স্বাভাবিক বলা হবে!!?? হাত-পা না থাকাটাকে স্বাভাবিক কেউ বলবে??!!

KLINEFELTER'S SYNDROME AND TURNER'S SYNDROME কে কেউ যদি স্বাভাবিক বলে তবে তা শুনলে প্রথম বর্ষের মেডিক্যাল স্টুডেন্টও হাসবে যে কেউই chronomosomal abnormality বা chromosomal disease সমপর্কে সামান্য পড়াশোনা করলে দেখতে পাবেন যে, এই রোগ-গুলোর নামই ভেসে আসছে। বিশ্ব স্বীকৃত স্কল বই অনুসারেই এগুলো কিছু ক্রোমোসমাল রোগ যেখানে স্বাভাবিক নারী পুরুষের সাধারণ বিন্যাস (xx O xy) পরিবর্তে বিন্যাস হয় xo, xxy মত অস্বাভাবিক বিন্যাস। তাই এই রোগগূলোতে কোনও আচরণ গত সমস্যা দেখা দিলে তাকে রোগের উপসর্গ হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে এবং চিকিৎসা করতে হবে।

কিন্তু দুঃখের সাথেই বলতে হয় এই রোগগুলোকে স্বাভাবিক বলার অপচেষ্টা যেমন সমকামী সমর্থকরা করেছেন ঠিক তেমনিভাবে এগুলোর রওগের উপসর্গকে স্বাভাবিক বলে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার মত অপচেষ্টাও কম করেন নি। তার উদ্দেশ্য ছিল একটাই যে পুরুষের নারী হিসেবে আচরণ এবং নারীর পুরুষ হিসেবে আচরণ স্বাভাবিক বলে অপপ্রচার চালানো, যেনে এর সূত্র ধরে সমকামিতাকে স্বাভবিক বলার পথও প্রশস্ত হয়।

কিন্তু মেডিক্যাল সাইন্স কি তাদের সেই সুযোগ দিবে?

Davidson's Medicine আমাদের দেশসহ সারা বিশ্বের ডাক্তারদের অতি পরিচিত বই। এই বইয়ে অভিজিত যেসব condition বা Hermaphrodite/ উভলিঙ্গ-ত্ব এর উদাহরণ বলে স্বাভাবিক বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন। তার সবকটাকেই জেনে-টিক কিংবা হরমোনাল রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটাকে নাম দেওয়া হয়েছে intersex বা পুরুষ-নারীর মধ্যবর্তী অবস্তা যা কখনোই উভলিঙ্গ প্রাণীর ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থা নির্দেশ করে না। হ্যাঁ, একটা সম্য ছিল যখন intersex/ হিজড়াদের উভলিঙ্গ বলে অভিহিত করা হতো। কিন্তু স্বাভাবিক উভলিঙ্গ প্রাণির সাথে অস্বাভাবিক intersex কে এক করে দেখাকে বিজ্ঞানীরা সমীচীন মনে করেন নি। তাই আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই hermaphrodite শব্দের পরিবর্তে

মেডিক্যাল সাইন্সে intersex শব্দটি ব্যবহার হচ্ছে।

স্বাভাবিক উভলিঙ্গ প্রাণীগুলো সৃষ্টিগত ভাবেই উভলিঙ্গ প্রাণী, তারা প্রজনন অতিমাত্রায় সক্ষম, তাদের যৌন অঙ্গের বিন্যাস স্বাভাবিক। কিন্তু হিজড়াদের ক্ষেত্রে ঘটে উল্টো ঘটনা। মানুষ স্বভাবত একলিঙ্গ প্রাণী হলেও রোগের কারণে হিজড়াদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্য চলে আসে, তাদের যৌনাঙ্গের বিন্যাস সাধারণত অস্বাভাবিক হয়, তাদের যৌনাঙ্গের অস্বাভাবিকতার কারণে তাদের মধ্যে সন্তান জন্ম দেওয়ার অক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। আর একারণেই বিজ্ঞানীরা উভলিঙ্গ প্রাণীর সাথে হিজড়াদের মেলাতে চান না। এজন্যই তাদের intersex নামে আলাদা একটি শ্রেণিতে ফেলা হয়।

মূল কথা হলো। উভয়লিঙ্গ প্রাণী আর হিজরা এক নয়। একটি স্বাভাবিক অন্যটি অস্বাভাবিক।

জন্মান্ধের অন্ধত্বকে যেমন স্বাভাবিক বলা যায় না, তেমনি জেনেটিক রোগে আক্রান্তদের দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যকেও স্বাভাবিক বলা যায় না। বরং জন্মের পর থেকেই হিজড়া শিশুদের স্বাভাবিক করে তুলার চেষ্টা করা ই আমাদের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব।

সবচেয়ে বড় কথা হলো, উভলিঙ্গ প্রাণীর প্রজনন প্রক্রিয়া কোনো ভাবেই সমকামিতা নয়। কারণ এটা যদি সমকামিতা হতো তবে পুংজনন কোষের সাথে পুংজনন কোষের মিলনে বংশবিস্তার হতো। কিন্তু আমরা জানি যে উভলিঙ্গ প্রাণীদের মধ্যেও প্রজনন ঘটে এবং তা অবশ্যই পুংজনন কোষের সাথে স্ত্রীজনন কোষের মিলনে। তাহলে আপনি ই বলুন এটা কি সমকামিতা হয়?

আবার কিছু মুক্তমনা দাবি তুলে রূপান্তর কামিতা কি সমকামিতা নয়!!!!

উপরের আলোচনার ধারাবিহকতায় বলছি, আবার উভলিঙ্গ প্রাণীদের মধ্যে কিছু প্রাণী আছে যাদের মহান আল্লাহর দেয়া প্রাকৃতিক নিয়মেই জীবনকালের কোনও পর্যায়ে লিঙ্গ পরিবর্তন হয়। এই প্রকৃয়া কেন ঘটে তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বহু কারণ উল্লেখ করেছেন। যেমন অনেক সময় দেখা যায় প্রতিকূল পরিবেশে বংশবিস্তারের জন্য পুরুষ প্রাণী পাওয়া যায় না তখন আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ম অনুসারে ঐ প্রজাতির কিছু নারী সদস্যের মধ্যে শরীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে তারা পুরুষে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়া এই কারণে ঘটে যাতে করে ঐ প্রজাতির বংশবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। এই প্রাণীদের কাছে কোন সার্জন নেই। তারা নিজেদের পায়ে কাটাছেড়া করে না। কোন প্রাণী চাইলেই কি নিজে নিজে সেক্স চেঞ্জের মতো জটিল প্রক্রিয়া নিজ

থেকেই হয়ে যেতে পারে? নিশ্চয়ই না। এটাই প্রমাণ করে যে প্রজাতির বংশবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য এটি আল্লাহ্ এর দেয়া একটি প্রক্রিয়া। আর ঐ প্রাণীগুলো যখন পুরুষে রূপান্তরিত হয় তখন তারা শুধু নারী প্রজাতির সাথেই মিলি হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও বিপরীত লিঙ্গের মধ্যই যৌনাচার রক্ষিত হয়, যা সমকামিতার মধ্যে পরেই না।

অনেক তো হলো বিজ্ঞান আর দর্শন খন্ডন, এবার চিকিৎসা শাস্ত্রের ছুঁড়ি চালিয়ে এই পাঠের ইতি টেনে, আমাদের বইয়ের মূল উদ্দেশ্যে দৃষ্টিপাত দিব। গল্পের ছলেই শুরু করি তাহলে...

পাঠ ১২।। ছুরিকাঁচির নিচে

সমকামিতা। হালের আলোচিত টপিক। কারো কাছে মানবিক, স্বাভাবিক। কারো কাছে পাশবিক, বিকৃতি। কারো কাছে 'ঘেন্নার', তবে 'এটাও একটা ধরন', ওদেরও আছে সমাজে বসবাসের অধিকার, ইত্যাদি। নিজের পছন্দমত যৌনচর্চার অধিকার। কেউ তো আবার আগ বাড়িয়ে জিনগত-জন্মগত- প্রাকৃতিক প্রমাণ করেও ছেড়েছে। আজিব হ্যায় ইয়ে দুনিয়া। যা ইচ্ছে প্রমাণ করে ফেলা যায়। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য করে ফেলা যায়। নিজের চাহিদাকে বৈধতা দেয়া কোনো ব্যাপারই না। প্রতারণার যুগ, এইজ অব দাজ্জাল (দাজ্জাল অর্থ চরম প্রতারক)। সব সম্ভবের যুগ।

ডাক্তার হওয়ার জন্য ম্যালা বইপত্র পড়তে হয়েছে। ১১ টা সাবজেক্টে প্রতিটার ২ টা মেইন বই, একটা গাইড ধরলে ৩৩ টা কেতাব খতম দিয়ে লাইসেন্স মিলেছে রোগীর গায়ে হাত দেয়ার। তাই, একটা দুটো বই পড়ে আপনি যেমন খুব সহজে 'গে জিন' এর অস্তিত্ব বিশ্বাস করে সমকামিতা-কে 'হাতের স্পর্শ ছাড়াই প্রাকৃতিক' বলে বিশ্বাস করে ফেলতে পারেন। আমি পারি না। জেনেটিক্সে 'সমকামিতা' প্রাকৃতিকভাবে প্রোগ্রামড কি না, তা নিয়ে পক্ষ বিপক্ষ তৈরি হলেও, মেডিকেল সায়েন্সে সমকামিতার 'অপ্রাকৃতিকতা' নিয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

সমকামিতা যদি প্রাকৃতিকই হয়, স্বাভাবিকই হয়; তাহলে আমাদের শরীরের গঠন তা সাপোর্ট করার কথা। আমাদের এনাটমি ও শারীরতত্ত্ব তো সমকামবান্ধব হবার কথা। সমকামের জন্য যা যা প্রয়োজন, আমাদের গঠনও তেমনটাই হবার কথা। যেহেতু এটা প্রাকৃতিক দাবি করা হচ্ছে। সমকামের সাথে যায়- এমন বৈশিষ্ট্য পায়ু-লিঙ্গে পাওয়া গেলেই তো দাবিটা সঠিক হয় যে, সমকাম সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন ও সুস্থ স্বাভাবিক যৌনক্রিয়া, তাই না? যেমন ধরেন যোনির গঠনটাই এমন যে পুরো জায়গাটা—

- ঘর্ষণ উপযোগী
- প্রচুর পিচ্ছিলকারী তরল তৈরির ব্যবস্থা
- এসিডিক পরিবেশ, ফলে বহিরাগত জীবাণু প্রতিরোধী
- প্রসারণশীল
- আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টিকারী স্নায়ুসমৃদ্ধ

এসব বৈশিষ্ট্যই প্রমাণ করে যে, যোনিপথে মিলন একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। অপরপক্ষে নাকের ছিদ্র বা কানের ছিদ্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলো নেই। যা প্রমাণ করে নাকের ছিদ্রে বা কানের ছিদ্রে মিলন, চাই সেটা যত আগে থেকেই প্র্যাকটিস করা হোক না কেন, কোনভাবেই প্রাকৃতিক নয়। এমন কোন জায়গায় মৈথুন আর যা-ই হোক প্রাকৃতিক হতে পারে না। অনুপযুক্ত স্থানে অনুপযুক্ত চর্চা অবশ্যই প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং 'গে-জিন' এর রূপকথা বানিয়ে দিলেই পায়ু মৈথুনের উপযুক্ত হয়ে যাবে না। মনে রাখবেন, কোন জিনেই লেখা থাকে না যে এটা 'গে-জিন'। বরং এগুলো ধারণা করা হয় যে, হতে পারে এই জিন এই কাজের জন্য দায়ী। কিছু ভাইয়াকে এইসব ধারণাগত বিষয়কে এত বেশি বিশ্বাস করতে দেখা যায়, যদিও তারা দাবি করে তারা না দেখে কিছু বিশ্বাস করে না। যেহেতু গে-জিন আমার আলোচ্য বিষয় না, তাই আজ এখানে তা আলোচনা করছি না। চলুন দেখি, মানবদেহের গঠন আমাদের কী বলে।

কিছু শিখে নেইঃ

আগে কিছু কথা শিখে নিই যাতে পরের কথাবার্তা বুঝা যায়। আমাদের শরীর বহু কোষের সমন্বয়ে গঠিত। একই ধরনের একাধিক কোষ ভ্রূণদশায় যদি একই উৎস থেকে তৈরি হয়, আর যদি একই ধরনের কাজ করে সেই কোষের গ্রুপকে কলা/টিস্যু (Tissue) বলে। যেমন ধরেন নার্ভটিস্যু বা স্নায়ু কলা। ভ্রূণ অবস্থায় সবচেয়ে বাইরের লেয়ার থেকে এরা উৎপন্ন হয়ে সারা দেহে বিস্তার লাভ করে এবং নার্ভ তৈরি করে। সেন্স আনা-নেয়ার কাজটাই করে। আবার ধরেন, পেশীকলা। ভ্রূণের মধ্যস্তর থেকে তৈরি হয়, সারা শরীরে ছড়ায়, মাসল তৈরি করে, ওজন নেয়ার ও হাড্ডিকে বাঁকিয়ে নানান নড়াচড়ার কাজটা করে। অনেকগুলো কলা মিলেঝিলে যখন একটা কাজ করে তাকে বলে 'অঙ্গ'। যেমন ধরেন, হার্ট ♥। এর মধ্যে পেশীকলা-স্নায়ু কলা-যোজক কলা- আবরণী কলা সব মিলে রক্ত পাম্পের কাজটা করে।

কলাগুলোর মধ্যে আবরণী কলাটা (Epithelium) ডিটেইলস জানা দরকার। দেহের বাইরের ও ভিতরের আবরণ তৈরী করে যে কোষরা তাদেরকে আবরণী কলা বলে। চামড়ায় আছে, মুখের ভিতরের আবরণে এরা, রক্তনালীর ভিতরের আবরণে এরা, শ্বাসনালীর ভিতরের লেয়ারটায় এরা, ফুসফুস-ব্লাডার-পেশাবের নালী, সব সব। সব ধরনের আবরণ এরা সারি সারি কোষ বসে বসে তৈরি করে। এদেরকে সাংগঠনিকভাবে একসাথে কাজের ভিত্তিতে আবরণী কলা বলে।
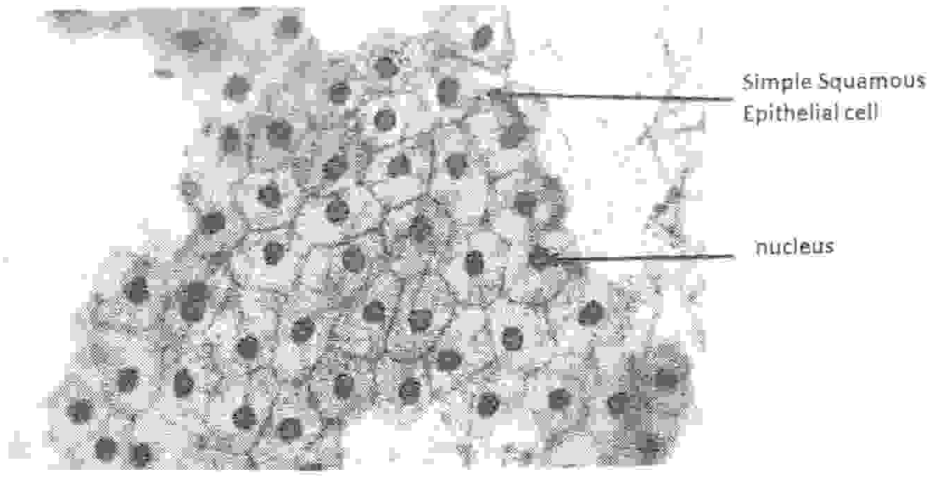
Simple Squamous Epithelium
Location : Air sacs

ফুসফুসে আঁইশাকার কোষ

এরা আবার কয়েক ধরনের। যেখানে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অণুর আদানপ্রদান দরকার, সেখানে আছে চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা মাছের আঁইশের মত কোষওয়ালা আবরণী কলা। যেমন ফুসফুসের শেষ মাথায় (Alveolus) যেখানে অক্সিজেন-কার্বনডাইঅক্সাইড আদানপ্রদান হবে সেখানে অন্যগুলো থাকলে হবে না, সেখানে আছে এই আঁইশাকার আবরণী কলা, যাতে লেনদেন সম্ভব হয়। আবার এগুলো আছে রক্তনালীর ভিতরের লেয়ারে, কারণ সেখানে (বিশেষত কৈশিকজালিকায়) গ্লুকোজ, এমিনো এসিড, স্নেহ পদার্থ সরবরাহ করতে হবে, আবার বর্জ্য নিতে হবে রক্তে, আদানপ্রদানের জন্য সেখানেও একস্তর আঁইশাকার কোষ (Simple Squamous Epithelium)। কেন আইশাকার? যাতে অণুগুলোকে কম দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে হয়। কোষের বেধ কম, আঁইশের মত।

আবার যে আবরণকে ঘর্ষণ সহ্য করতে হবে বেশি সেখানে বহুস্তর আঁইশাকার আবরণী কলা (Stratified Squamous Epithelium)। যাতে অল্প পুরুত্বে কয়েকস্তর কোষ দেয়া যায়। উপরের লেয়ার ঘষায় উঠে গেলেও (Desquamation) তলায় আরও কয়েক লেয়ার থাকে যা জীবাণু প্রতিরোধ করবে। যেমন ধরেন মুখগহ্বরের ভিতরের লেয়ারটা। গোশত-হাড্ডি চাবায়ে, লাকড়ির মত টোস্ট কুড়মুড় করে খাচ্ছেন, এই কোষগুলো আছে বলে। অন্যকোষ থাকলে সারাবছর ঘা হয়ে থাকত। আবার অন্ননালী জুড়েও এই কোষ, কারণ আমরা একদম তরল করে গিলি না, কিছুটা চিবিয়েই গিলে ফেলি, শক্ত শক্ত।

আবার কিছু জায়গা আছে যেখানে রস উৎপন্ন করাটাই কাজ। যেমন বিভিন্ন গ্ল্যান্ড।

এখানে রস বানানোর কাঁচামাল জমানো লাগবে, রস বানানোর মেশিনপত্র রাখা লাগবে, আবার বানানো রস রাখারও জায়গা লাগবে। তাই এখানে আঁইশের মত চ্যাপ্টা হলে কাজ হচ্ছে না। এসমস্ত রসের কারখানার জন্য আছে ছক্কার গুটির মত (Cube) একস্তর কোষের আবরণী কলা। কিছুটা স্পেস যাতে পাওয়া যায়। যেমন ধরেন: লালাগ্রন্থি, থাইরয়েডগ্রন্থি।
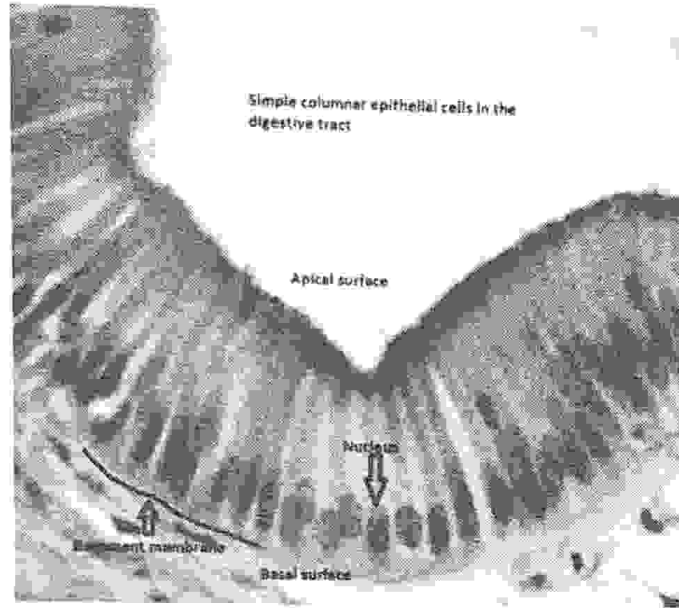
পরিপাক আবরণী কোষ (একস্তর স্তম্ভাকার)

আর যেখানে রস উৎপাদনের চেয়ে রস শোষণ মুখ্য উদ্দেশ্য। সেখানে কন্টিনিউয়াস শোষণ হতে হবে। এজন্য আরও স্পেস বেশি লাগবে। এজন্য সেখানে একস্তরবিশিষ্ট স্তম্ভাকার কোষের আবরণ (Simple Columnar Epithelium)। থামের মত লম্বা লম্বা। পুরো পরিপাক নালী জুড়ে এরা। এখানে পদে পদে উৎপাদন আর শোষণ। রস উৎপাদন করে হজম, খাবারকে সরল তরল করা আর শোষণ। এজন্য এই ধরনের কোষকে পরিপাক আবরণী কলাও (Digestive/ Gastrointestinal Epithelium)বলে। পাকস্থলী-ক্ষুদ্রান্ত্র-কোলন-মলাশয়।

যেখানে যেটা দরকার সেখানে সেটা, কোন ব্যত্যয় নেই। অবশ্য একশ্রেণীর মানুষ একে দুর্ঘটনা মনে করে। এমনি এমনিই এমন ছন্দের মত, নিখুঁত নকশা তৈরি হয়েছে বলে তাঁরা দাবি করে। এনারা রোবটের কাজকাম নিখুঁত হলে এঞ্জিনিয়ারের প্রশংসা করে, কিন্তু এতো অতি-আণুবীক্ষণিক লেভেলের পারফেকশন নাকি লক্ষ লক্ষ ঠাডা পড়ে নিখুঁত হয়েছে বলে তিনারা বিশ্বাস করেন।

আচ্ছা, অন্য প্রসঙ্গে না গেলাম। যে ধরনের আবরণী কলার যেটা সহ্য করার ক্ষমতা নেই, সেখানে সেটা হলে (Stess) একটা সমস্যা হয়। যেমন ধরেন, পাকস্থলীর ভিতরের আবরণে আছে স্তম্ভাকার কোষ। এরা সেখানে এসিড, শ্লেষ্মা ও অন্যান্য রসটস তৈরি করে। এখন, অন্ননালীর আবরণ আবার আঁইশাকার।
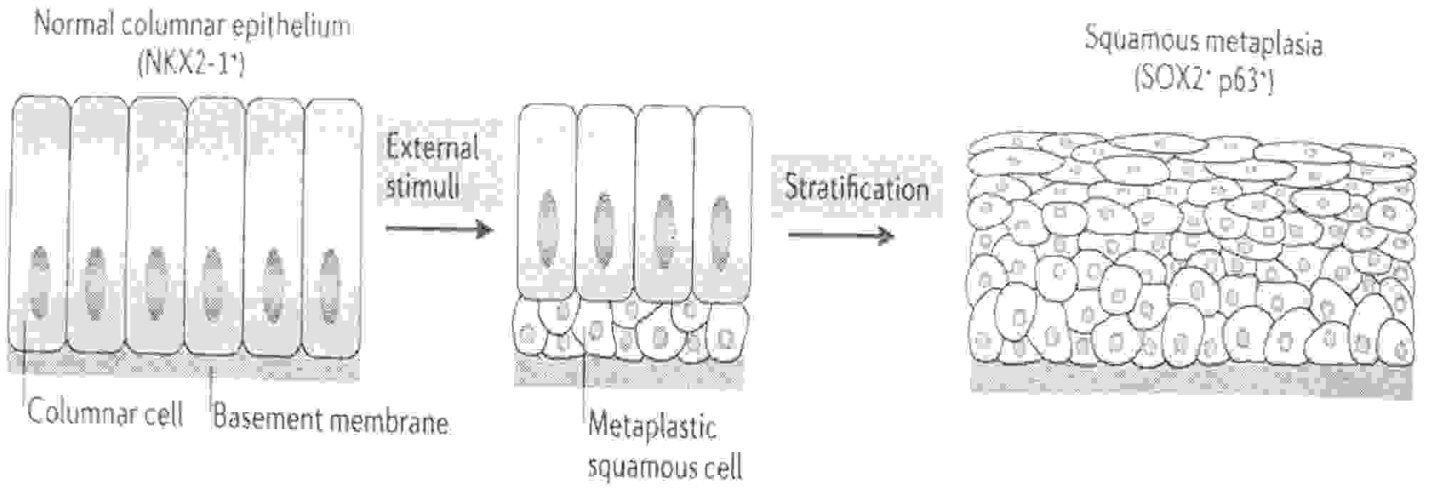
মেটাপ্লাসিয়া (দেখেন স্তম্ভ কোষ কীভাবে আঁইশ হচ্ছে)

যদি কারও দীর্ঘদিন পেটের খাবার উপরে উঠে আসার সমস্যা থাকে (Reflux), তাহলে ঐ আঁইশাকার কোষগুলো এসিডের ছ্যাঁকায় ছ্যাঁকায় পরিবর্তন হয়ে স্তম্ভাকার হয়ে যায়, এই প্রক্রিয়াকে বলে মেটাপ্লাসিয়া (Metaplasia)। এটা ভালো জিনিস না, ক্যান্সারপূর্ব লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত। এই অসুখকে বলে 'ব্যারেটস ইসোফ্যাগাস'। আবার পিত্তথলিতে পানি শোষণ ও পিত্তরস সংগ্রহ হয়, এখানে আবরণী কলা 'স্তম্ভাকার'। যদি দীর্ঘদিন কোন পাথর থাকে, তাহলে পাথরের ঘষায় ঘষায় এখানেও মেটাপ্লাসিয়া হতে পারে। কেননা ঘষার উপযোগী তো আঁইশকার কোষ। একই কাহিনী হতে পারে পেশাবের ব্লাডারেও। আবার শ্বাসনালীতে থাকে স্তম্ভাকার কোষ যাদের কাজ শ্লেষ্মা উৎপাদন। শেষপ্রান্তে গ্যাস অণু বিনিময়ের জন্য থাকে আঁইশাকার। ধূমপানের কারণে যে ক্যান্সার হয় তা মূলত নিকোটিনের কারণে না, তামাকের অন্যান্য উপাদানের কারণে, যেমন টার, বেনজিন। এসব কেমিক্যাল সহ্য করা স্তম্ভাকার কোষেরও কাজ নয়, একস্তর আঁইশেরও কাজ নয়।
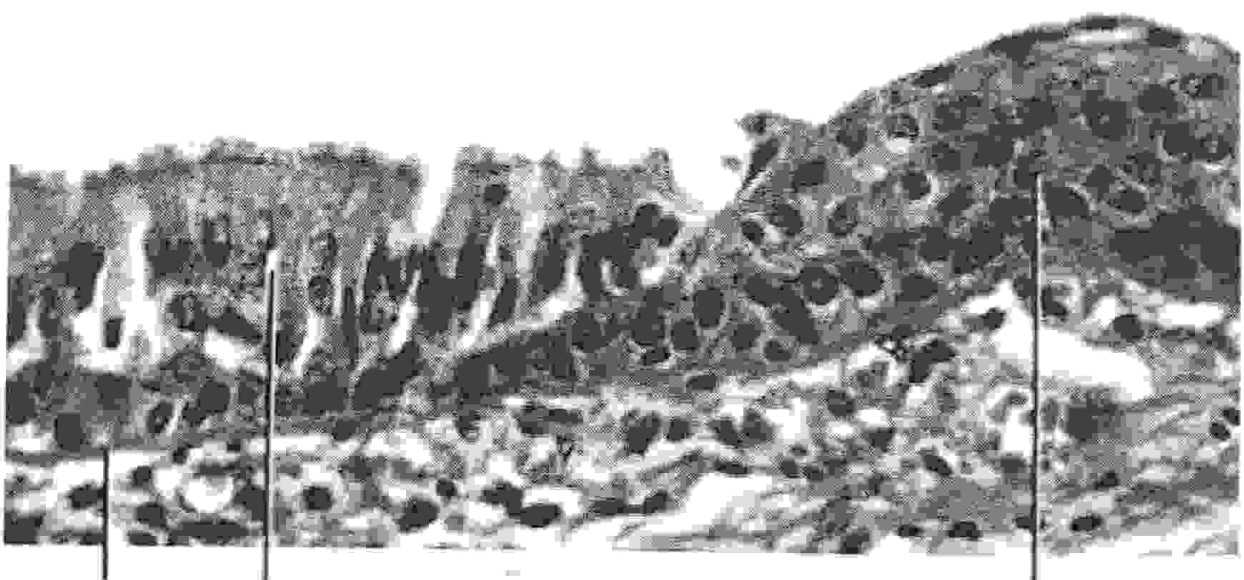
বামে শ্বাসনালীর মূল স্তম্ভ কোষ, ডানে আঁইশাকার ক্যান্সার কোষ

কেমিক্যাল সহ্য করতে চাই ত্বকের মত বহুস্তর আঁইশাকার কোষ, তাও আবার উপরে থাকতে হবে জড় কেরাটিন স্তর। ফলে এখানেও হবে মেটাপ্লাসিয়া। এবং ক্যান্সারে রূপ নেবে যদি কেমিক্যাল টর্চার চলতেই থাকে। স্তম্ভগুলো আঁইশে রূপান্তরিত হয়ে যে ক্যান্সার হবে তাকে বলে 'আঁইশাকার কোষ ক্যান্সার' (Sqamous Cell Carcinoma, SCC)। আর আঁইশগুলো ঘনকাকার হয়ে যে ক্যান্সার হবে তার নাম 'ঘনকাকার কোষ ক্যান্সার'(Small Cell Carcinoma)। আশা করি এতটুকু ক্লিয়ার।
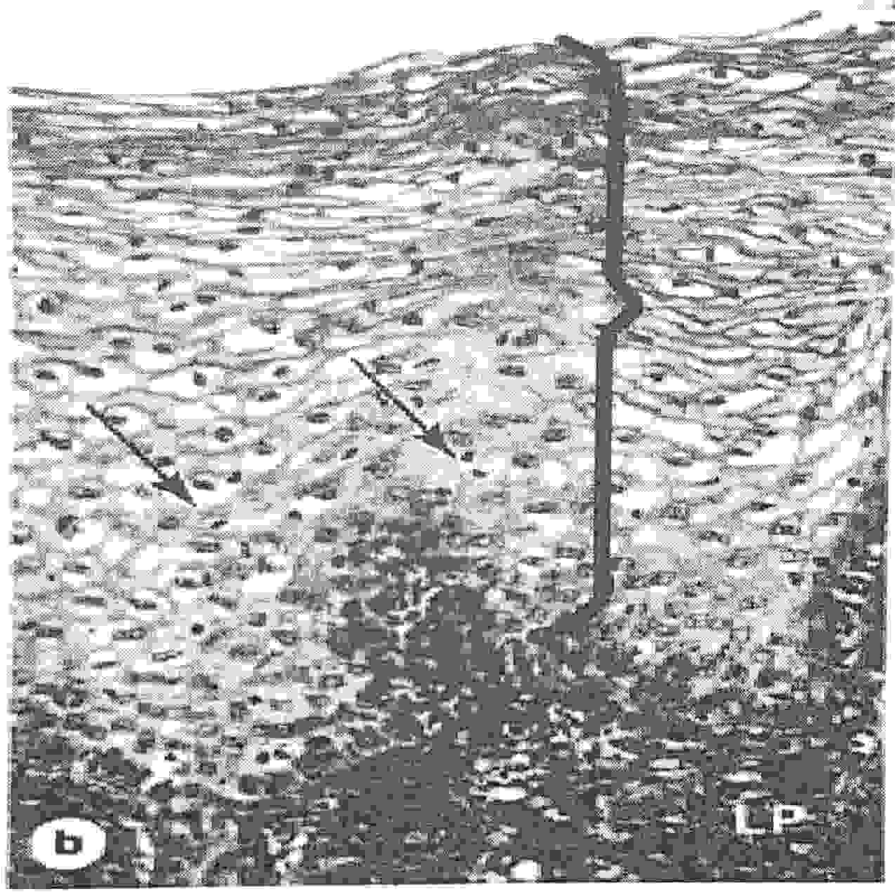
যোনির ভিতরের আবরণ (মাল্টিলেয়ার আঁইশ কোষ)

এবার মূল আলোচনা শুরু। পয়লা আমরা যোনিপথের (Vagina) গঠন দেখব। এটা একটা নালী বা টিউবের মত অঙ্গ। স্বাভাবিক অবস্থায় এর দৈর্ঘ্য থাকে ২.৭৫ ইঞ্চি থেকে ৩.২৫ ইঞ্চি। আর নারীর উত্তেজিত অবস্থায় বেড়ে দাঁড়ায় ৪.২৫-৪.৭৫ ইঞ্চি।[৫১] পুরো যোনিপথ তো বটেই, সেই সাথে পুরুষাঙ্গ যেখানে গিয়ে ধাক্কা দিতে পারে, মানে সারভিক্সের যে অংশ যোনিপথের দিকে বেরিয়ে থাকে (Ectocervix), সে অংশও মাল্টিলেয়ার আঁইশ কোষে আবৃত (ঘর্ষণ উপযোগী)। যদিও মূল সারভিক্সের (Endocervix) আবরণ একস্তর স্তম্ভ কোষের।[৫২] বামের ছবিতে দেখুন যোনিপথ ও বহিঃসারভিক্সের মাল্টিলেয়ার আঁইশ কোষ দেখা যাচ্ছে।

[৫১] https://www.webmd.com/women/features/vagina-size#1

[৫২] Junqueira's Basic Histology - Text and Atlas (13th Ed), Page 1031, 1034
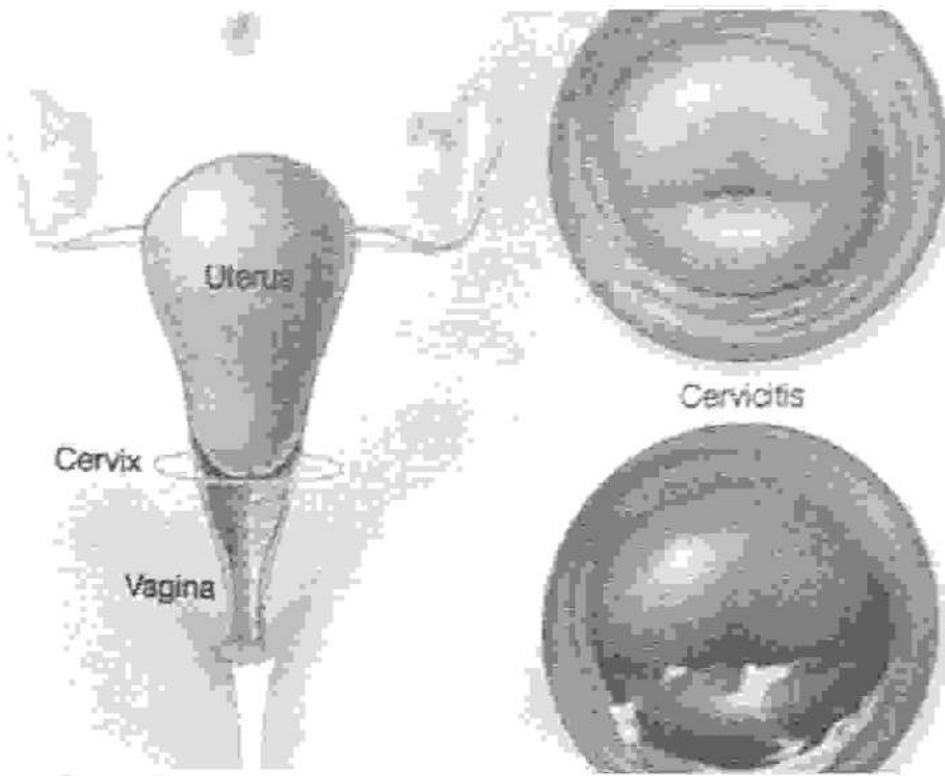
বহিঃসারভিক্স ও যোনির আবরণ মাল্টিলেয়ার আঁশ কোষ ঘর্ষণ উপযোগী

আর ডানের ছবিতে দেখুন জরায়ুর একটা অংশ যোনিপথের দিকে বেরিয়ে আছে। ঐ অংশটাও (বহিঃসারভিক্স) যোনিপথের মত একই ঘর্ষণযোগ্য মাল্টিলেয়ার আঁইশ কোষ আবরণ দিয়ে আবৃত।
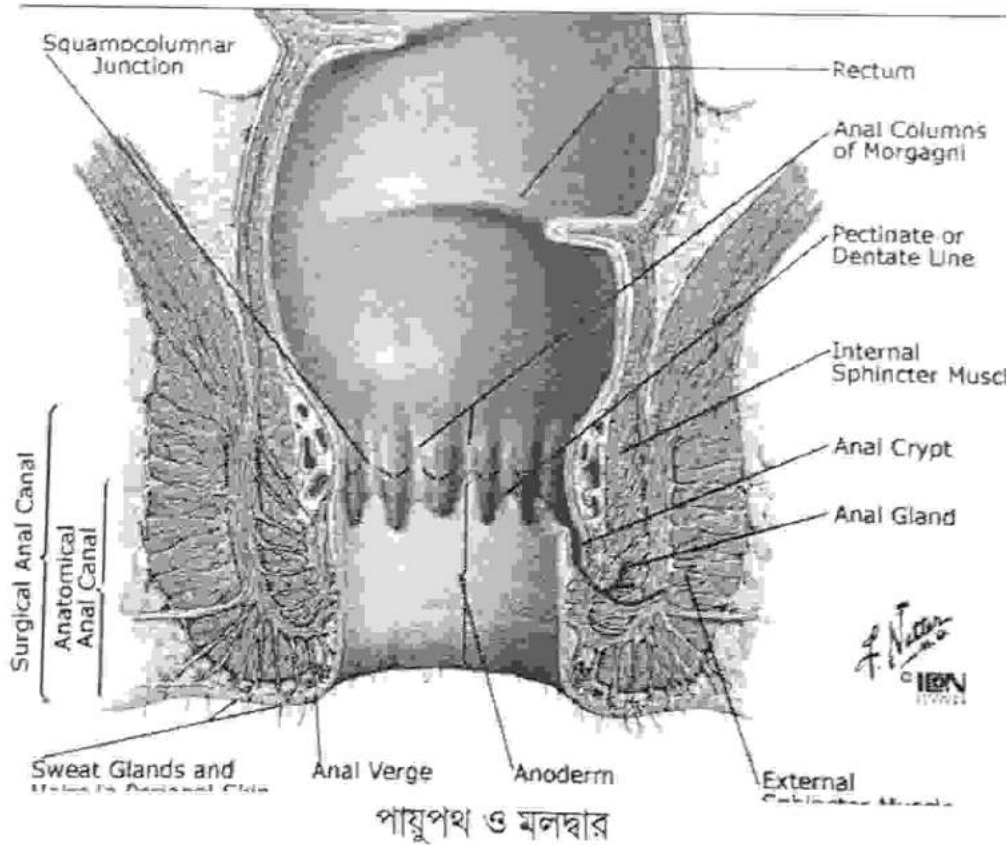
পায়ুপথ ও মলদ্বার

এবার, পায়ুর গঠনটা দেখি চলেন। ছবিটা দেখতে হবে খুব ভালো করে। পায়ু একটা নালী (Tube)। মাঝখান থেকে লম্বালম্বি চিরে ফেললে এমন দেখাবে। ছোট ছোট ঢেউয়ের মত কাল দাগ দেয়া আছে দেখেছেন? ঐ বর্ডার থেকে লোমওয়ালা বর্ডার পর্যন্ত এলাকাটা হল 'পায়ুপথ' (Anal canal), মাত্র ৪ সে.মি. (৩-৫ সেমি)।[৫৩]

[৫৩] https://emedicine.medscape.com/article/1990236-overview

এই এলাকাটুকু মার্ক করে 'Anoderm' লেখা আছে, মানে হল এখানে আবরণ আমাদের চামড়ার মতই, কেবল লোম-ঘামগ্রন্থি এসব নেই।

এর উপর থেকে রেক্টাম বা মলাশয় শুরু। মানে হল কালো ঢেউ ঢেউ দাগের নিচের টুকু জড় কেরাটিন যুক্ত মাল্টিলেয়ার আঁইশাকার কোষের আবরণ (ত্বকের মত), আর উপরের অংশ রেক্টামে একস্তর স্তম্ভটাইপ কোষের আবরণ (পৌষ্টিকনালীর বাকি অংশের মত)।[৫৪]
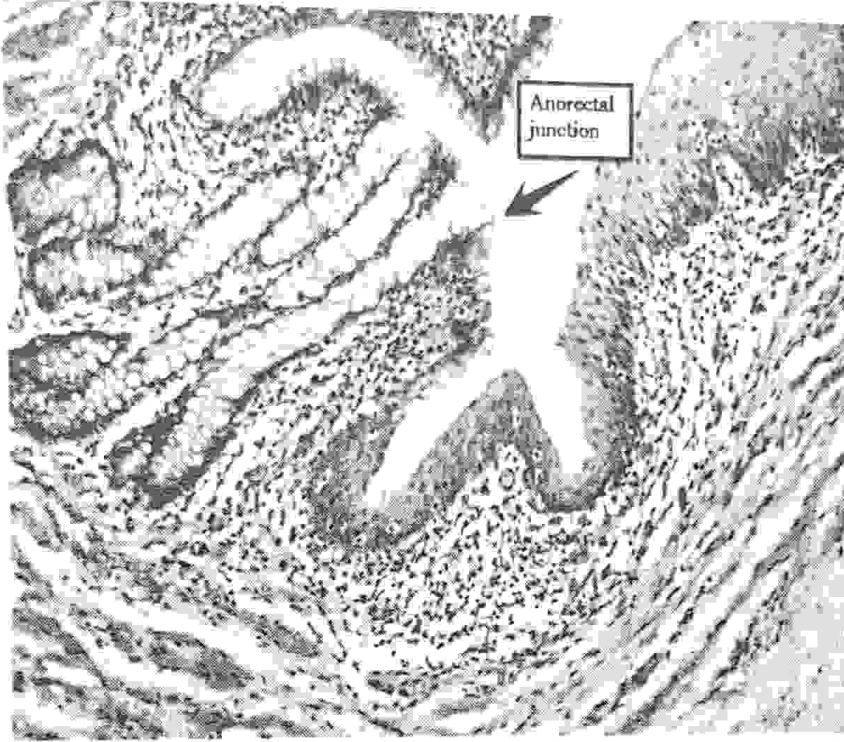
মলদ্বার ও পায়ুপথের আবরণী হঠাত পরিবর্তন

ডানের ছবিতে তীর চিহ্নিত অংশে লক্ষ্য করুন, আবরণ হঠাৎ বদলে গেছে। বাম পাশে গোল গোল শ্লেষ্মাগ্রন্থি বিশিষ্ট পরিপাক আবরণী (digestive epithelium), আর ডানে মাল্টিলেয়ার আঁইশ টাইপ কোষ। বামে রেক্টাম, আর ডানে পায়ুপথ। আগের ছবিতে দেখেন সুপরিসর রেক্টাম থেকে বেশ চিকন পায়ুপথে মল আসার সময় বেশ ঘর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাই মাল্টিলেয়ার আঁইশ দেয়া হয়েছে। এখন আমার কথা হলঃ

মন যেন উড়ে না বেড়ায়ঃ

১. এখানে আমরা দেখলাম, পায়ুপথের মাত্র ৪-৫ সেমি জায়গা ঘর্ষণ উপযোগী। পরের এলাকাগুলো মোটেও ঘর্ষণ উপযোগী নয়। পুরুষের গড় উত্থিত লিঙ্গের দৈর্ঘ্য ৫ ইঞ্চি, আমরা এক ইঞ্চি কমিয়ে ধরলাম। ৪ ইঞ্চি মানে ১০ সেমি। মানে লিঙ্গের বাকি ৫ সেমি গিয়ে আঘাত করবে রেক্টামের স্তম্ভাকার কোষের আবরণে, যা ঘর্ষণের জন্য অনুপযোগী। আর আমরা আগেই দেখেছি যে কাজের জন্য যা উপযোগী না, সেখানে সে কাজ হলে মেটাপ্লাসিয়া ঘটে। কোষের ধরন বদলে যায়, যা উপযুক্ত পরিবেশে ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে। সমকামীদের মলদ্বারের ক্যান্সারের ঘটনা সাধারণ মানুষের চেয়ে ২০

[৫৪] Junqueira's Basic Histology - Text and Atlas (13th Ed), Page 709-710

গুণ বেশি।[৫৫] আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি জানাচ্ছে, পায়ুমিলন পায়ুক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়ায়। আরও বেশি সম্ভাবনা বাড়ে সমকামী পায়ুমিলনে।[৫৬]

২. যেহেতু এমন জায়গায় গিয়ে আঘাত হচ্ছে যা একস্তরী স্তম্ভ কোষ, মাল্টিলেয়ার না। ফলে প্রতিবার সেক্সে ইনজুরি হবেই। আবরণী ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। ফলে এইডস ভাইরাস, প্যাপিলোমা ভাইরাস ইনফেকশন ছড়ায় দ্রুত। এইডস তো এইডস-ই, আর প্যাপিলোমা ভাইরাস-ই মূলত ৮০-৯০% মলদ্বারের ক্যান্সারের জন্য দায়ী।[৫৭]

৩. টিউমার-এর খারাপ জাতটাকেই (malignant) বলে ক্যান্সার। টিউমার বড় হতে সাহায্য করে আমাদের দেহে উৎপন্ন প্রোস্টাগ্লান্ডিন (PG) নামক কেমিক্যাল গ্রুপের PGE2 ও PGF2. আর টিউমার তৈরি শুরু হতে সাহায্য করে PGE2, PGF2, ও PGE1. এবং এই ৩ ধরনের PG-ই অত্যধিক পরিমাণে আছে বীর্যে। দেহস্থ অন্য যেকোন রস বা টিস্যুর চেয়ে বেশি।[৫৮] মানে বীর্য সহ্য করার ক্ষেমতাও পায়ুর নেই, যা জরায়ুর আছে।

৪. এবার একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতামত তুলে ধরব। ডাক্তার Stephen E. Goldstone, MD সাহেব Mount Sinai School of Medicine, New York এ assistant clinical professor হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এবং তিনি gayhealth.com এর মেডিকেল ডিরেক্টর। তিনি ২০০০ সালের American Society of Colon and Rectal Surgeons এর বার্ষিক সম্মেলনে বলেন, ১৯৯৭ সালের আগে আমি আমার পুরো ক্যারিয়ারে একটা পায়ু ক্যান্সারের রোগী পেয়েছি। ১৯৯৭ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত আমি আমার চেম্বারে রেফার হয়ে আসা ২০০ পুরুষ রোগীর ডাটা সংগ্রহ করি। এদের সবাই নন-ক্যান্সার সমস্যা নিয়ে এসেছিল। এদের ৬৬% ছিল এইচআইভি পজেটিভ। বায়োপসি করে পেলাম, এদের ৬০% এর হাইগ্রেড আঁইশ কোষের টিউমার ক্যান্সার যা এখনও ছড়িয়ে পড়েনি (high-grade squamous

---

[৫৫] Daling, J., Weiss, N., Hislop, T., Maden, C., Coates, R., Sherman, K., et al. (1987). Sexual practices, sexually transmitted diseases, and the incidence of anal cancer. The New England Journal of Medicine, 317(16): 973–7. অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেশন অব এইডস অর্গানাইজেশন এর সাইট (https://www.afao.org.au/article/gay-men-anal-cancer/#n17)

[৫৬] https://www.cancer.org/cancer/anal-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html

[৫৭] ঐ আর্টিকেলেই আছে।বরাতঃ International Journal of Cancer এর দুইটি রিসার্চ পেপার। (1) De Vuyst, H., Clifford G., Nascimento, M., Madeleine, M., Franceschi, S. (2009). Prevalence and type distribution of human papillomavirus in carcinoma and intraepithelial neoplasia of the vulva, vagina and anus: a meta-analysis. International Journal of Cancer, 124(7), 1626–36.(2) Hoots, B., Palefsky, J., Pimenta, J., Smith, J. (2009). Human papillomavirus type distribution in anal cancer and anal intraepithelial lesions. International Journal of Cancer, 124(10), 2375–83.

[৫৮] Journal of American Medical Association (JAMA) এর

intraepithelial lesions (HSIL) আর ৩% এর পেলাম ছড়িয়ে পড়া (invasive) ক্যান্সার। যদিও এদের কারোরই ক্যান্সারের লক্ষণ প্রকাশ পায়নি।[৫৯] ফাইনালি তিনি সিদ্ধান্ত দেন, সমকামী পুরুষেরা পায়ুপথের যেকোন সমস্যা নিয়ে এলেই তাদের গভীর পরীক্ষা (aggressive screening) করা দরকার। হতে পারে ভিতরে ক্যান্সার-পূর্ব আরও মারাত্মক কোন সমস্যা লুকিয়ে আছে।

৬. পায়ুপথের অধিকাংশ ক্যান্সার Adenocarcinoma টাইপ, মানে গ্ল্যান্ড টাইপ। আঁইশকোষ ক্যান্সার (Sqamous Cell Carcinoma, SCC) খুব বিরল। কিন্তু অধুনা এই আঁইশকোষ ক্যান্সার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানান University of California-র professor of clinical pathology জনাবা Teresa M. Darragh, MD ও associate director for gynecologic pathology জনাবা Barbara Winkler, MD.[60]

এই ক্যান্সার হচ্ছে ঠিক যে জায়গায় স্তম্ভাকার-টু-আঁইশাকার চেঞ্জটা হয়েছে তার সংলগ্ন উপরের অংশে যেখানে পুরোটাই স্তম্ভকোষ (squamo-columnar junction with the rectal columnar mucosa)। তাঁরা বলেন, পায়ুমৈথুনে (receptive anal intercourse) আঘাত-ইনজুরি-মেরামত চলতে থাকে, যা মেটাপ্লাসিয়া প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। (In this area of transition, there is active changeover of columnar epithelium to squamous epithelium through the process of squamous metaplasia. This process is accelerated by trauma, healing, and repair such as might be expected to occur with receptive anal intercourse.)

[৫৯] http://www.cancernetwork.com/gastrointestinal-cancer/anal-cancer-incidence-rising-homosexual-men
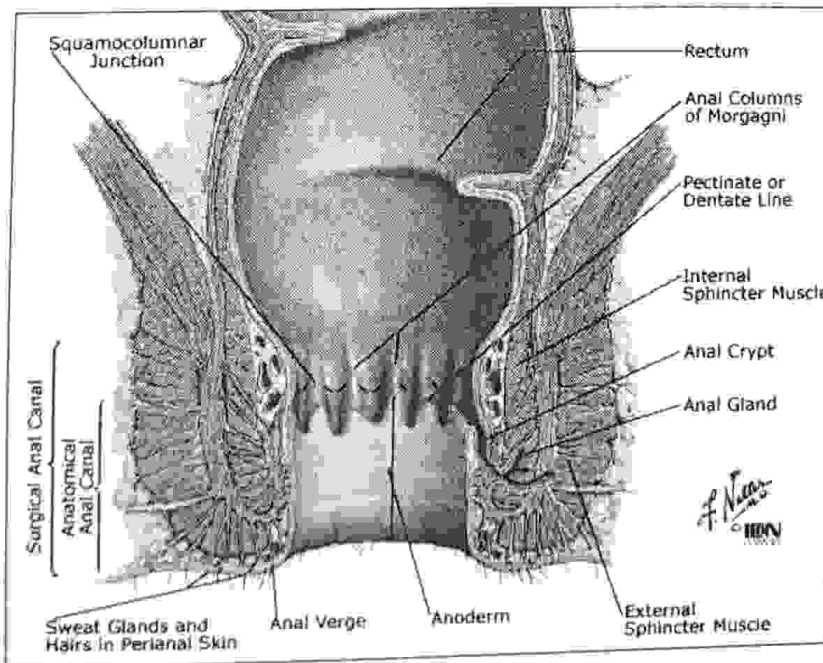
[৬০] http://www.captodayonline.com/Archives/pap_ngc/NGC_analrectalcyto.html

আবার দিলাম ছবিটা। কালো জিগজ্যাগ দাগটা হল সেই জাংশন। এর উপরে শার্পলি স্তম্ভকোষ শুরু, নিচে শার্পলি মাল্টিলেয়ার আঁইশ কোষ শুরু। দাগের ঠিক উপরের জায়গাটাতেই মেটাপ্লাসিয়া বেশি হয় আমরা জানলাম, সমকামীদের ক্ষেত্রে। দেখেন এই জায়গাটা বাকি রেক্টামের চেয়ে উঁচু, লম্বা লম্বা ভার্টিকাল ভাঁজ আছে। মানে ঘষা এখানে লাগে বেশি, বাকি রেক্টামের চেয়ে। যা ঘষা লাগার জন্য তৈরি হয়নি, তাতে ঘষা লাগতে লাগতে একসময় তাই ঘটে যা আমরা আগে বলেছি—মেটাপ্লাসিয়া। এই মেটাপ্লাসিয়া থেকে হচ্ছে এই ক্রমবর্ধমান হারে আঁইশ কোষ ক্যান্সার।
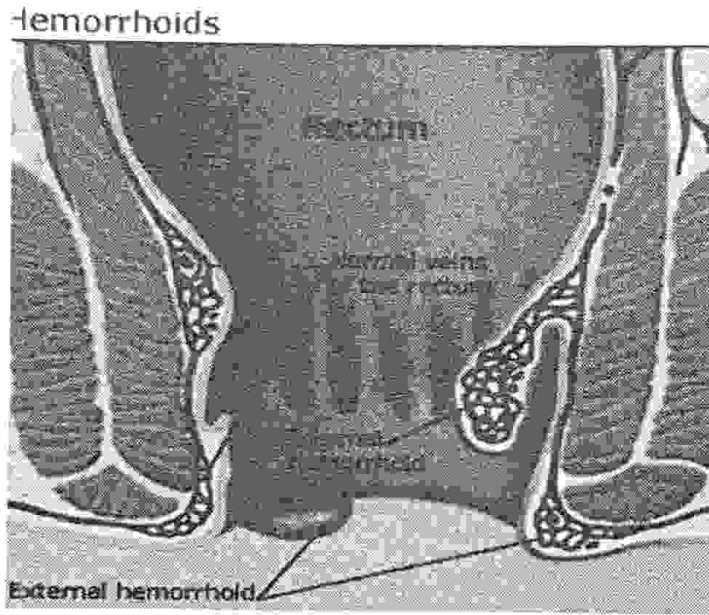
উপরের নীল আর নিচের নীল মিলিয়ে দেখুন

৭. এবার উপরের ছবির নীল রঙের জায়গাটা লক্ষ্য করুন। নীল যেগুলো দেখছেন, এগুলো শিরা, উচু জায়গাটাকে বলে 'কুশন' (coushion)। এখানে যে বিখ্যাত অসুখটা হয়, তার নাম আপনারা সবাই জানেন— পাইলস (haemorrhoid)। দেখুন, ঐ নীল অংশটাই বেড়ে গোটার মত হয়েছে।
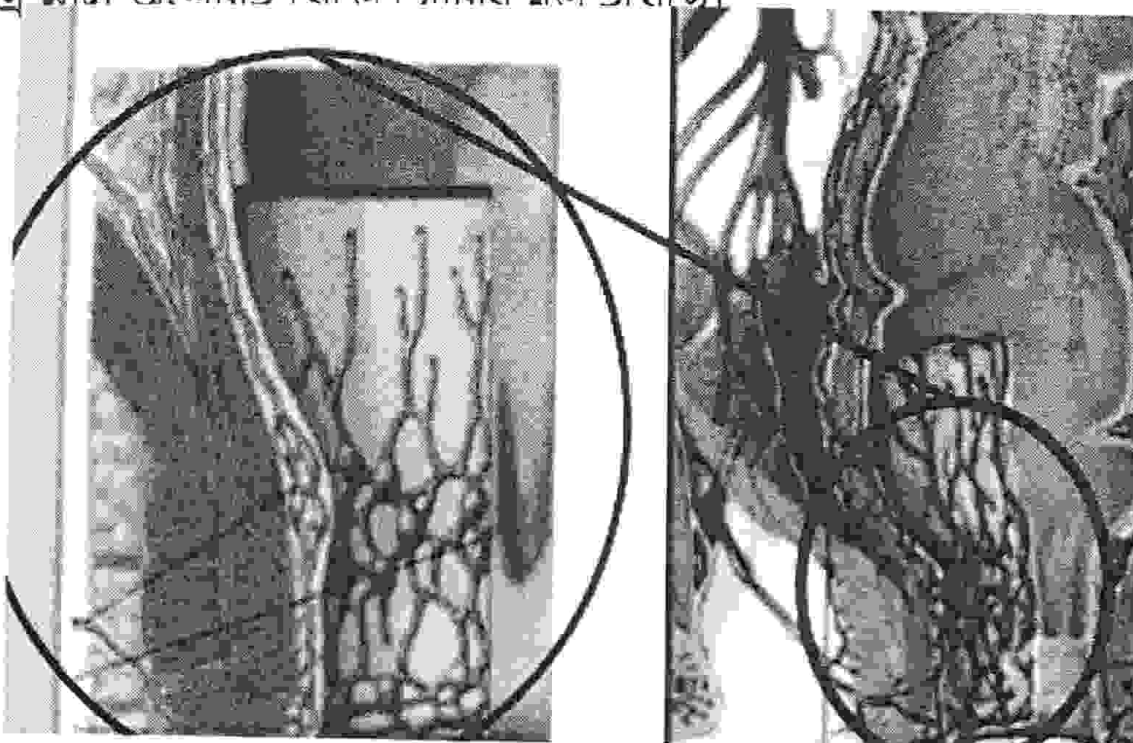
দুটো ভিন্ন রক্ত পরিবহন সিস্টেমের মিলনস্থল (Porto-systemic anastomosis)

পায়ুর এই জায়গাটা অতিমাত্রায় রক্তনালীসমৃদ্ধ। দুটো ভিন্ন রক্ত পরিবহন সিস্টেমের মিলনস্থল এটা (Porto-systemic anastomosis)। আবরণীর নিচেই রয়েছে প্রচুর রক্তজালক (venous plexus)। আঘাত/ঘর্ষণের জন্য এ জায়গাটা মোটেই নিরাপদ না। আসলে এই শিরাজালিকা চওড়া হয়ে ও মোটা হয়ে ঝুলে পড়ে হয় পাইলস। পাইলসের কারণগুলো যদি আমরা দেখিঃ[৬১]

- শিরা থেকে কম রক্ত ব্যাক করাঃ দীর্ঘসময় টয়লেটে বসে থাকা, গর্ভাবস্থা, পায়ুপেশীর অধিক সংকোচন

- *কোষ্ঠকাঠিন্য*
- *পেটে অধিক চাপ দেয়া*
- *গর্ভাবস্থা*
- *পারিবারিক ইতিহাস*
- *Lack of erect posture*
- *Familial tendency*
- *Higher socioeconomic status*
- *Chronic diarrhea*
- *Colon malignancy*
- *Hepatic disease*
- *Obesity*
- *Elevated anal resting pressure*
- *Spinal cord injury*
- *Loss of rectal muscle tone*
- *Rectal surgery- Episiotomy*
- *Anal intercourse* *****
- *Inflammatory bowel disease, including ulcerative colitis, and Crohn disease*

তাহলে দেখা গেল পাইলসের একটা কারণ হল পায়ুসঙ্গম। পায়ুসঙ্গম নিজেই অনেকগুলো রোগের কারণ। এটা ন্যাচারাল বিহেভিয়ার হলে তা এতো অসুখবিসুখের কারণ হবে কেন? ন্যাচার সাপোর্ট করে না বলেই তো এত সমেস্যা। ন্যাচারের বিরুদ্ধে যায় বলেই তো ন্যাচার বিদ্রোহ করে।

---

[৬১] https://emedicine.medscape.com/article/775407-overview#a6

৮. রয়টার্সের রিপোর্ট। ৬১৫০ জন নরনারীর ডাটা বিশ্লেষণ করলেন গবেষকগণ। এদের ৩৭% মহিলা একবার হলেও পায়ুসঙ্গম করেছেন। আর ৫% পুরুষ পাওয়া গেল যারা একবার হলেও পায়ুসঙ্গম করেছেন। প্রধান গবেষক Dr. Alayne Markland, University of Alabama জানান, পায়ুসঙ্গমের সাথে 'পায়খানা ধরে রাখতে না পারা'র (fecal incontinence) সম্পর্ক আছে। এবং সেটা মেয়েদের চেয়ে পুরুষের ক্ষেত্রে বেশি। এই ৩৭% মহিলার ৫০% এরই মাসে একবার হলেও fecal incontinence হয়, মানে কাপড় নষ্ট হয় আর কি। আর পুরুষের ৩ গুণ বেশি হয় এই দুর্ঘটনা, প্যান্ট ভরায়ে ফেলে।[৬২]
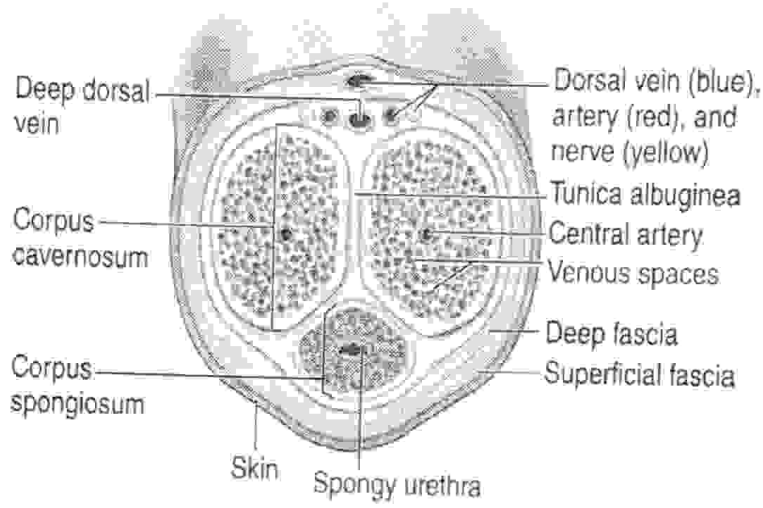
লিঙ্গের প্রস্থচ্ছেদ

৯. পিরোনীজ ডিজিজ (Peyronie's Disease) নামে একটা অসুখ আছে। গবেষকগণ মনে করেন, লিঙ্গে ইনজুরি হয়ে লিঙ্গের অভ্যন্তরে রক্তপাত হতে পারে। অনেকসময় ইনজুরি লক্ষ্য করার মত না-ও হতে পারে, তবে ভিতরে রক্তপাত হয়ে থাকে।[৬৩] কারণ লিঙ্গ কোন মাংসপেশী নয়। এটা বিশেষ একধরনের স্পঞ্জের মত টিস্যু যার ভিতরে রক্ত প্রবেশ করে তা শক্ত হয়। আবার রক্ত বেরিয়ে গেলে নরম হয়ে পড়ে। নিচের ছবি দুটো দেখুন। CC-CS লেখা জায়গাগুলো স্পঞ্জের মত রক্ত ধরে রাখে, ফলে শক্ত হয়।
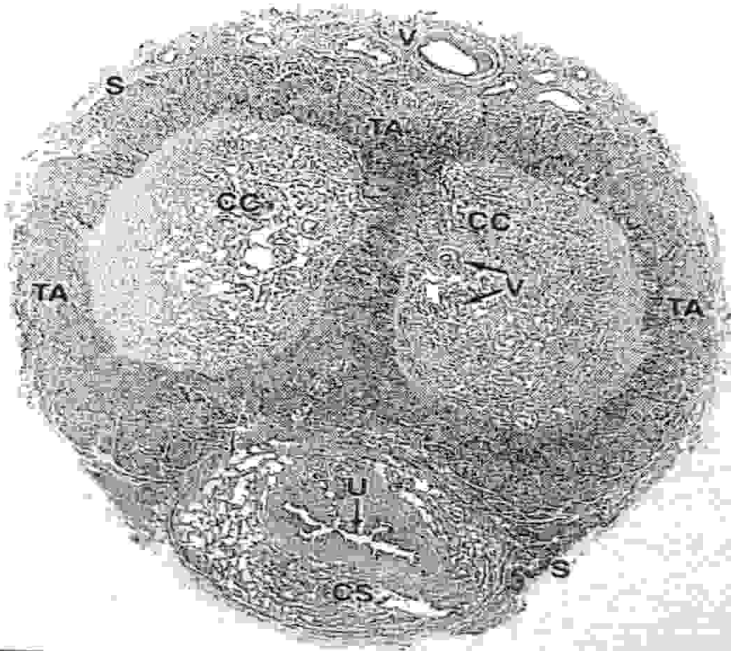
[৬২] American Journal of Gastroenterology, published online January 12, 2016 এর বরাতে রয়টার্স https://www.reuters.com/article/us-health-analsex-incontinence-idUSKCN0VD2RH

[৬৩] https://www.webmd.com/men/peyronies-disease#1

অত্যধিক পরিমাণে রক্তনালী থাকার কারণে সামান্য ইনজুরি হলেও রক্তক্ষরণ হতেই পারে, আপনার অজ্ঞাতেই। ফলে সেখানে তৈরি হয় স্কার (বাংলায় 'চল্টা' বলা যেতে পারে), এদের বলা হয় 'প্লাক'। ফলে লিঙ্গ বেঁকে যেতে পারে বা এবড়োখেবড়ো হয়ে যেতে পারে। কারো কারও প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে, এমনকি লিঙ্গ উত্থিত হবার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলতে পারে। জানাচ্ছে American Urological Association. [৬৪]

Southern Illinois University-র urologist Tobias Köhler, M.D. সাহেব জানাচ্ছেন 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকাকে, বেশি চাপ দিয়ে হস্তমৈথুন করলে হতে পারে এই অসুখটা।[৬৫] তার মানে সামান্য এই 'হাতের চাপেই' রক্তক্ষরণ হয়ে যেতে পারে লিঙ্গের ভিতরে, কেউ তো আর কিল-ঘুষি দিয়ে মাস্টারবেশান করে না। বিছানা বা বালিশে ঘষাঘষি তো আরও মারাত্মক ব্যাপার। নিচের টেবিলটা খেয়াল করুনঃ

	যোনিপথ	পায়ুপথ ১
স্বাভাবিক (resting) প্রেসার	১৯.৭ cm H_2O= ১৪.৫ mm Hg ২	৮৮ ±৩ mm Hg
মর্দন (squeezing) প্রেসার	২২ cm H_2O= ১৬.১৮ mm Hg ৩	১৬৭ ±৬ mm Hg

(ছবির ১ নং রেফারেন্স[৬৬] ছবির ২ নং রেফারেন্স[৬৭] ছবির ৩ নং রেফারেন্স[৬৮])

167 mm Hg মানে 22264.8 প্যাসকেল চাপ। অর্থাৎ ৩.২২ পাউন্ড ওজন এক বর্গইঞ্চিতে যে পরিমাণ চাপ দেয়। মানে ১.৪৬ অর্থাৎ প্রায় দেড় কেজি একটা বাটখারা লিঙ্গে বেঁধে দিলে যে চাপ অনুভব হবে অতখানি চাপ দেয় মলদ্বার সংকোচন (লিঙ্গের গোড়ার ক্ষেত্রফল এক বর্গইঞ্চি ধরেছি)। অনেক প্রেসার। লিঙ্গের মত সেন্সিটিভ অঙ্গের জন্য এটা অনেক প্রেসার। লিঙ্গ প্রবেশনের জন্য মলদ্বার খুবই রিস্কি জায়গা। মলদ্বারের চাপ নেবার মত ক্ষমতা নেই পুরুষাঙ্গের। আর স্কুইজ ছাড়া সারাক্ষণ প্রেসার থাকে ৭৭০ গ্রাম ওজন ঝুলিয়ে দিলে যেমন লাগবে, তেমন। হস্তমৈথুনেও এত চাপ দেয়া হয় না। নিঃসন্দেহে পেনিসে ইনজুরি হতেই হবে। পেনিস আর মলদ্বারে ইনজুরি না করে সমকাম করা অসম্ভব।

আমরা পায়ুপথে আঙুল দিয়ে একটা পরীক্ষা করি (Digital Rectal Exam, DRE)। তখন টের পাওয়া যায়, কত শক্তভাবে মলদ্বার চাপ দেয়। এছাড়া একটা

---

[৬৪] https://www.urologyhealth.org/urologic-conditions/peyronies-disease

[৬৫] https://nypost.com/2016/02/01/if-this-happens-to-you-youre-masturbating-too-much/

[৬৬] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3968922/

[৬৭] https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1034/j.1600-0412.2001.801003.x

[৬৮] https://www.researchgate.net/figure/Recordings-of-vaginal-squeeze-pressure-measured-by-fiberoptic-microtup-transducer_fig1_286686766

স্বয়ংক্রিয় সংকোচন আছে মলদ্বারের যাকে বলে Anal Reflex/Anal wink. অর্থাৎ পায়ুর আশেপাশের ত্বকে কোন খোঁচা/ চিমটি দিলে পায়ু সংকোচন হয়। [৬৯]পায়ুমৈথুনে এই চাপ অতিক্রম করে চাপের বিরুদ্ধে লিঙ্গ প্রবেশ ও চালনা করাতে হয়। আবার ভিতরেও রেস্টিং প্রেসারের বিপরীতে লিঙ্গচালনা করতে হয়। সেখানে প্রচুর শিরাজালকের উপস্থিতিও আমরা দেখলাম। মোদ্দাকথা লিঙ্গ ও পায়ুর দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্যমান ইনজুরি না করে পায়ুমৈথুনের কোন সুযোগই নেই।

এজন্যই পায়ুমৈথুনে ২০ গুণ বেশি এইডসের সম্ভাবনা । আর এই রিস্ক আরও বাড়ে যদি আগে থেকেই রেক্টামে কোন ইনফেকশন থাকে।[৭০] আর আমরা দেখলাম, ইনজুরি ছাড়া পায়ুমৈথুন অসম্ভব। এক তো আবরণ ঘর্ষোণোপযোগী না, সিঙ্গেল লেয়ার, তার উপর আবার প্রেসার বেশি, ইনপুট প্রেসারও দিতে হবে বেশি, আবার রক্তজালিকা বেশি। তার উপর এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জীবাণু প্রজাতি E. coli যারা রক্তে এন্ট্রি পেলেই ইনফেকশন করে।

১০. যোনিপথের Skene's ও Bartholin's গ্রন্থি থেকে প্রচুর পিচ্ছিল তরল নির্গত হয়। একজন মহিলার কোন উত্তেজনা ছাড়াই প্রতিদিন ১.৫ গ্রাম তরল বের হয়। আর উত্তেজিত হলে তা বহুগুণে বেড়ে যায় (arousal fluid)। আর অর্গাজমের সময় তা আরও বৃদ্ধি পায়।[৭১]

যোনিপথের মত পায়ুতে যথেষ্ট পিচ্ছিলকারকের উৎপাদনও নেই, ফলে প্রচুর লুব্রিকেন্ট ব্যবহার করতে হয়। অনেক বিজ্ঞ সমকামী ভাইয়া বলতে পারেন, জেলী ব্যবহার করলেই তো আর আঘাত-ঘর্ষণের ফলে ইনজুরি আর হলো না। আচ্ছা, ২০১০ সালে International Conference on Microbicides এ ২ টা গবেষণা উপস্থাপন করা হয়। ৪৭ টি দেশের সহস্রাধিক মাইক্রোবায়োলজিস্ট অংশ নেন। এই দুটি রিপোর্টের সারমর্ম হল, পায়ুকামে জেলী (lubricants) ব্যবহারে এইডসের রিস্ক আরও বাড়ে ।[৭২] একটিতে বাল্টিমোর ও লস এঞ্জেলসের ৯০০ পুরুষ ও মহিলার ডেটা নেয়া হয়। গবেষকগণ দেখেন, যারা জেলী ব্যবহার করে তারা ৩ গুণ বেশি যৌনবাহিত রোগের (rectal sexually transmitted infections) ঝুঁকিতে আছে। আরেকটা স্টাডি বলছে, জনপ্রিয় জেলীগুলোকে ল্যাবে নিয়ে দেখা গেছে, সেগুলোর

---

[৬৯] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK424/

[৭০] https://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100525094900.htm

[৭১] Lentz, Gretchen M. (2012). Comprehensive Gynecology (6th ed.). Philadelphia, PA: Elsevier. pp. 532–533.

[৭২] https://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100525094900.htm

অনেকগুলো রেক্টাল কোষের জন্য মরণঘাতী (toxic)। যার ফলে এগুলো ব্যবহারে এইডসের ভাইরাসের প্রবেশ হয় আরও সহজ। এমনকি পুরুষ না কি নারী, এইডস আছে না কি নেই, কোন শহরে থাকে, কনডম ইউজ করে কি না, গত মাসে কতজন যৌনসঙ্গীর সাথে মিলিত হয়েছে— এই সবগুলো ফ্যাক্টরকে সমান সমান নিয়েও দেখা গেছে, পায়ুমৈথুনের (receptive rectal intercourse) আগে জেলী (lubricant) ব্যবহার করার সাথে পায়ুর যৌনবাহিত রোগের সম্পর্ক জোরালোই রয়ে গেছে। (Even after controlling for gender, HIV status, city, condom use, and number of sex partners in the past month, the association between use lubricant before receptive rectal intercourse and rectal STIs remained strong) জানাচ্ছেন গবেষকদলের প্রধান Dr Pamina Gorbach যিনি School of Public Health এবং University of California, Los Angeles-এর David Geffen School of Medicine-এর একজন চিকিৎসক।

University of Pittsburgh ও Magee-Womens Research Institute এর Charlene Dezzutti, Ph.D এর নেতৃত্বে পরিচালিত আরেকটা গবেষণার রিপোর্টে বহুল প্রচলিত ৬ টা জেলী নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে,

- এতে অনেক বেশি পরিমাণে লবণ ও শুগার থাকে যা কোষের পানি টেনে নেয়। ডিহাইড্রেশান হয়ে মারা যায় আবরণী কোষ। ইনফেকশনের জায়গা করে দেয়।

- আবার কোনটা পায়ুর ভালো ব্যাকটেরিয়ার পুরো বসতিই জ্বালিয়ে দেয়। ফলে খারাপ ব্যাকটেরিয়া আসার সুযোগ পায়।

মোটকথা, যোনিতে যেখানে প্রচুর লুব্রিক্যান্ট ক্ষরণের ব্যবস্থা আছে, সে তুলনায় পায়ুতে প্রায় জিরো। লুব্রিক্যান্ট নিয়েও শেষরক্ষা নেই, ইনফেকশান হবেই। কেননা আগেই দেখেছি, কেমিক্যাল সহ্য করার জন্য চাই মাল্টিলেয়ার আঁইশ কোষের আবরণ। রেক্টামের একস্তর স্তম্ভকোষ মারা যাবে অহেতুক কেমিক্যাল টর্চারে।

সারসংক্ষেপঃ

মোদ্দাকথা, মানবদেহের প্রাকৃতিক গঠন সমকামিতার বা পায়ুমিলনের সাথে যায় না, এটা স্বাভাবিক প্র্যাকটিস না। কোনভাবেই প্রাকৃতিক তো নয়ই, বরং প্রকৃতিবিরুদ্ধ, যার বহিঃপ্রকাশ প্রাণঘাতী রোগ উৎপাদন (disease process).

আমরা ফরেনসিক মেডিসিন বইয়ে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌন অপরাধ' (Unnatural Sexual Offence) অধ্যায়ে সমকামিতা, পশুকামিতা এসব পড়েছি, ইন্ডিয়ান রাইটারের লেখা বই। আজ ইন্ডিয়া সমকামিতার মত 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌন অপরাধ'-কে

অপরাধের লিস্ট থেকে উঠিয়ে দিলেই এর প্রকৃতিবিরুদ্ধতা চলে যাবে, প্রকৃতিবান্ধব হয়ে যাবে, তা না। যা টের পাবে প্রতিটি সমকামী তাদের জীবনের কোন এক পর্যায়ে। ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর প্রহর গুণবে আর স্মরণ করবে সেই সব অগ্নিঝরা দিনগুলোর কথা, আর অপেক্ষা করবে সামনের অগ্নিঝরা ভবিষ্যতের।

আর তিনারাই তো বিশ্বাস করেন— সারভাইভাল ফর দ্য ফিটেস্ট। পায়ুমিলনে তো ফিটেস্ট কোন প্র্যাকটিস না, প্রজাতির ধারা রক্ষায় এর কোন ভূমিকা নেই। সমকামীরা সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিকভাবে আনফিট। মানবসমাজ ও মানবপ্রজাতি রক্ষায় তাদের কোন ভূমিকা নেই। এখন এই আনফিট অংশ মানবপ্রজাতির জন্য অপচয়, ওয়েস্টেজ। আগে হলে হিটলার ও স্ট্যালিন 'সোশ্যাল ডারউইনিজম' (আনফিট জনসংখ্যাকে সমাজ থেকে ঝেড়ে ফেলা) এপ্লাই করত। ভবিষ্যতে এরাও একা একাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তবে সমাজে যেন এদের প্রভাব না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সমকামিদের প্রতি ইসলামের বিধান এজন্যই দেয়া হয়েছে, যাতে এই ভয়ংকর আনন্যাচারাল রোগ সমাজে ছড়াতে না পারে। টপ ও বটম দুজনকেই হত্যা করার বিধান দেয়া হয়েছে, কেননা একজন বেঁচে থাকলেই সে আরেকজনকে প্ররোচিত করবে। ইসলামী শাসনব্যবস্থা না থাকায় এই ভয়াবহ অপরাধীদের থাবা থেকে সমাজ আজ নিরাপদ নয়। প্রতিকার সম্ভব নয় বলে আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে এই ঘাতক ব্যাধি। আমার আপনার সন্তান যেন এই অপরাধের শিকার না হয়, এই ব্যাধিতে আক্রান্ত না হয়। নোট বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে বলে আলোচনা এখানেই শেষ করছি। সমকামিতা প্রতিরোধ, কারণ, করণীয় সম্পর্কে একজন যুগসচেতন আলিমের লেখা আশা করছি। এ বিষয়ে আমার মনের কথাগুলো আমি চাই একজন আলিম বলুক। কিছু বিষয়ে কথা বললে নিজের গায়েই থুথু এসে পড়ে। আত্মসমালোচনার দিক দিয়ে উলামাদের লেখনী এ বিষয়ে আরও ভারসাম্যপূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ।

ভাবার্থঃ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিখ্যাত হাদিসটা মনে আছে না তাবারানী শরীফের সূত্রেঃ হে ইবনে মাসঊদ, কিয়ামাতের আলামত ও শর্তগুলো হল — এরপর আল্লাহর রাসূল একের পর এক কিয়ামাতের আলামাতসমূহ উল্লেখ করতে থাকেনঃ

- *শিশুরা হয়ে যাবে ক্ষিপ্ত, দুর্ব্যবহারকারী- বৃষ্টি হবে জ্বালাময় (এসিড রেইন)*
- *মানুষ যোগাযোগ করবে থালার সাহায্যে (ডিশ এন্টেনা)*
- *এজন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হবে*
- *বাদ্যযন্ত্র থাকবে মানুষের মাথার উপর (হেডফোন)*

- *তাদের হৃদয়ে ফিতনা প্রদর্শন করা হবে 'ম্যাট' এর মত (টিভি)*
- *নেতৃত্ব থাকবে সমাজের নিকৃষ্ট লোকদের হাতে*
- *চোরকে সাধু ও সাধুকে চোর মনে করা হবে*
- *মুমিনকে ছাগলের চেয়েও বেইজ্জত করা হবে*
- *তাদের চুল থাকবে 'বুখতি উট' এর মত (Bactrian Camel)*
- *আধুনিক ঘোড়া কাট*

ভাবার্থ বললাম, এরকম আরও কিছু লক্ষণ উল্লেখ করেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার মধ্যে একটা ছিল — আর রিজালু বির রিজাল, ওয়ান নিসাউ বিন নিসা। পুরুষ পুরুষের সাথে মিলিত হবে, আর নারী নারীর সাথে।

১৪০০ বছর আগেই নবীজীকে জানানো হয়েছিল, কওমে লুত (আঃ) যেমন অফিসিয়ালি সমকাম প্র্যাকটিস করত, ১৪০০ বছর পরে তেমনি অফিসিয়ালি আবার ফিরে আসবে সেই ঘৃণ্য পাপাচার। কী? টেনশন? টেনশন লেনেকা নেহি, স্রেফ দেনে কা হ্যায়। বিজয় ঈমানওয়ালাদেরই হবে নিশ্চিত। সে বিজয়ে আমার কী অবদান রইল, সেটাই টেনশনের বিষয়।

সুবহানাল্লাহ।

সাদাকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আলহামদুলিল্লাহি আলা দীনিল ইসলাম।

পাঠ ১৩।। বিষবাষ্পে বাংলাদেশ

সমকামিতা ও বাংলাদেশ

সমকামিতা আর বাংলাদেশ শব্দ দুটো একসাথে শুনলে অনেকে আঁতকে উঠে বলে – একি সম্ভব। তাদের আমরা বলব – আপনি বোকার স্বর্গে আছেন অথবা আপনি বাংলাদেশে বসবাস করেন না বা সমকামিতা সম্পর্কে আপনি জ্ঞান রাখেন না। একটু গভীর দৃষ্টি দিলে দেখবেন আপনার পরোক্ষ উপস্থিতি এই বিকৃতকে আরো প্রকাশ্য করতে সহায়তা করছে। যে বা যারা সমকামিতা প্রসারে কাজ করছে আপনি মৌনভাবে তাদের উপস্থিতি মেনে নিচ্ছেন। একটি সমাজে বা রাষ্ট্রে সমকামিতা কিভাবে ছড়িয়ে পরে তা বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে কিছু "বুদ্ধিবৃত্তিক অস্ত্র" সম্পর্কে। এই বিষয়ে জনপ্রিয় লেখক আসিফ আদনান ভাই তার "চিন্তাপরাধ" বইয়ের "সমকামিতা এজেণ্ডাঃ ব্লু প্রিন্ট" ও "পেডোফেলিয়া" অংশে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। আমরা লেখকের অনুমতি সাপেক্ষে কিছু তথ্য সেখান থেকে নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক অস্ত্র দিয়ে আমাদের কিভাবে মানিয়ে নেওয়ার সংস্কৃতিতে প্রবেশ করানো হচ্ছে তা আলোচনা করব। সাথে বাংলাদেশে কারা সমকামিতা প্রসারে কাজ করছে এবং তাদের কার্যক্রমের কিভাবে হচ্ছে এবং তাদের যাত্রা কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে, এই পাঠে আমরা তা আলোচনা করব।

সমকামিতাকে স্বাভাবিকীকরণ বা স্বীকৃত দেওয়ার জন্য দেশে দেশে যে অস্ত্রটি গত চার দশকের বেশি সময় ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে তা হলো – মার্শাল কার্ক ও হান্টার ম্যাডসেনের একটি আর্টিকেল। কার্ক ও ম্যাডসেনের এই আর্টিকেল উপস্থাপিত ধারণা ও নীতিগুলো পরবর্তী ৩ দশক জুড়ে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে রাজনীতি, মিডিয়া, অ্যাকাডেমিয়া, বিজ্ঞান, দর্শন ও চিন্তার জগতে। সারা বিশ্বজুড়ে। সমকামীদের ম্যাগাযিন গাইডে প্রকাশিত মূল আর্টিকেলটির নাম ছিল "The Overhauling of Straight America "। ৮৯ তে প্রকাশিত সম্প্রসারিত বইয়ের নাম দেওয়া হয় - After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the 90s. কার্ক ও ম্যাডসেনের উদ্দেশ্য ছিল সিম্পল –সমকামিতা ও সমকামিদের প্রতি অ্যামেরিকানদের মনোভাব বদলে দেওয়ার জন্য একটি স্টেপ বাই স্টেপ ব্লু-প্রিন্ট বা ম্যানুয়াল তৈরি করা।

কিন্তু প্রশ্ন জাগতে পারে কেন আমরা কার্ক-ম্যাডসেনের আর্টিকেল নিয়ে চিন্তা

করব, তাতে স্পষ্ট লেখা আছে আমেরিকান সাম্রাজ্যর কথা। এই কেন ভাবতে হবে সেজন্যই আমাদের এই আয়োজন। আমরা দেখানোর চেষ্টা করব গত চার দশক ধরে সমকামিতার প্রসারে এই ম্যানুয়াল কিভাবে কাজ করছে।

কার্ক-ম্যাডসেনের ব্লু-প্রিন্টের প্রথম ধাপ - মানুষকে সমকামিতার ব্যাপারে ডিসেনসেটাইয করা।

> *'প্রথম কাজ হল সমকামি এবং সমকামিদের অধিকারের ব্যাপারে অ্যামেরিকার জনগনের চিন্তাকে অবশ করে দেওয়া, তাদের সংবেদনশীলতা নষ্ট করে দেওয়া [desensitization]। মানুষের চিন্তাকে অবশ করে দেওয়ার অর্থ হল সমকামিতার ব্যাপারে তাদের মধ্যে উদাসীনতা তৈরি করা...একজন স্ট্রবেরি ফ্লেইভারের আইস্ক্রিম পছন্দ করে আরেকজন ভ্যানিলা। একজন বেইসবল দেখে আরেকজন ফুটবল। এ আর এমন কী!' [Kirk & Madsen, The Overhauling of Straight America]*

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, স্কুলে স্কুলে সেক্স এডুকেশনের প্রচার নিয়ে। এক সময় একই ক্লাসে বিজ্ঞান এর জীববিদ্যা পাঠ নিয়ে পড়তে ছাত্র-ছাত্রীরা লজ্জায় লাল হয়ে যেত। এখন সরকার থেকে জোর করে গিলানো হচ্ছে সেক্স এডুকেশন এবং প্রথম দিকে শিক্ষার্থী আর অভিভাবক এর বিরুদ্ধে সরব ছিল। কিন্তু এখন একে সবাই স্বাভাবিক চোখে দেখতে শুরু করেছে এবং গত ৩-৪ বছরে এমন এক প্রজন্ম তৈরি হয়েছে যাদের কাছে এগুলো এখন রাখ-ডাক না রাখার বিষয়। খেয়াল করে দেখবেন যে সমাজে সেক্সুয়াল বিষয় প্রকাশ্যভাবে বলা ট্যাবু ছিল এবং যারা এগুলো নিয়ে আলোচনা করতো তাদের নোংরা ভাবা হতো। সেই সমাজ ই এখন মুখে কুলুপ এটে আছে আবার অনেক সমাজ তাদের বাহবা দিচ্ছে। যারা আজ চুপ আছে তারাও একসময় তা মেনে নিবে। অর্থাৎ মানুষকে তাদের চিন্তার জগত থেকে সরিয়ে নিয়ে তাদের দেওয়া ছাঁচে চিন্তা করতে তৈরি করা এই এজেন্ডার প্রথম ধাপের মূল উদ্দেশ্য।

কার্ক-ম্যাডসেনের মতে প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্দেশ্য এই একটি। সমকামিতা যে একটি জঘন্য বিকৃতি, চরম সীমালঙ্ঘন, ও ঘৃণ্য পাপাচার তা সম্পর্কে মানুষের সংবেদনশীলতাকে নষ্ট করে দেওয়া। তাদের ভাষায় –

> *'সমকামিতা একটি ভালো জিনিস - একেবারেই শুরুতেই তুমি সাধারন মানুষকে এটা বিশ্বাস করাতে পারবে, এমন আশা বাদ দাও। তবে তুমি যদি তাদের চিন্তা করাতে পারো যে সমকামিতা হল আরেকটা জিনিষ (ভালো না খারাপ না – জাস্ট আরেকটা ব্যাপার) তাহলে ধরে নাও আইনগত ও সামাজিক অধিকারের আদায়ের লড়াইয়ে তুমি জিতে গেছো।' [Kirk & Madsen, The Overhauling of Straight America]*

সমকামিতার প্রচার ও প্রসারের জন্য যারা কাজ করছে তাদের রেটোরিক খেয়াল করলে দেখবেন তাদের অধিকাংশ ঠিক এই মেসেজটাই দিতে চাচ্ছে। 'সমকামিতা ভালো বা খারাপ না, জীবনের একটা বাস্তবতা মাত্র'। পহেলা বৈশাখের সময় শাহবাগে সমকামি প্যারেড কিংবা ঈদের সময় ঈদের নাটক হিসেবে সমকামিদের গল্প তুলে ধরার পেছনে একটি মূল উদ্দেশ্য হল সমাজের বিকৃতকামী এক্সট্রিম মাইনরিটিকে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা। একই সাথে সমকামিতাকে ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত করা, যেমনটা জাতিসংঘের Free & Equal ক্যাম্পেইনেও করা হয়েছে।

ভিকটিমহুড – সমকামিতা জন্মগত

কার্ক-ম্যাডসেনের আরেকটি সাজেশান হল সমকামিদের ভিকটিম হিসেবে উপস্থাপন করা। সমকামিদের ভিকটিম হিসেবে চিত্রিত করার দুটি ডাইমেনশান থাকবে। প্রথমত, সমকামিতাকে একটি সিদ্ধান্তের পরিবর্তে প্রাকৃতিক বা জন্মগত হিসেবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে সমকামিদের জন্মগতভাবেই ভিকটিম হিসেবে উপস্থাপন করা। দ্বিতীয়ত, সমকামিদের সমাজ দ্বারা নির্যাতিত হিসেবে চিহ্নিত করা।

বাংলাদেশে এবং বিশ্বজুড়ে যারা সমকামিতার প্রচার ও প্রসারের কাজ করে তাদের প্রপাগ্যান্ডা ও বক্তব্য আপনি সবসময় এ দুটো মোটিফ দেখতে পাবেন।

সমকামিরা জন্মগতভাবেই সমকামি এটা প্রমানের উদ্দেশ্য হল যদি সমকামিতাকে জন্মগত বা প্রাকৃতিক প্রমান করা যায় তাহলে সমকামিদের সম্পূর্ণ নৈতিক দায়মুক্তি সম্ভব। সমকামিতা যদি জন্মগত হয় তাহলে সমকামিতা একটি 'অ্যাক্ট' বা ক্রিয়া হিসেবে নৈতিকভাবে নিউট্রাল, কারন এর উপর ব্যক্তির কোন নিয়ন্ত্রন নেই। কিন্তু সমকামি জন্মগত – এই দাবির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তো নেই-ই, বরং বিভিন্ন পরীক্ষা ফলাফল ইঙ্গিত করে যে Sexual Oreintation নির্ভর করে ব্যক্তির 'চয়েস' বা স্বেচ্ছায় গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর।[৭৩]

মিডিয়া

কার্ক-ম্যাডসেনের মতে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরন ও গ্রহনযোগ্যতা তৈরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমের একটি হল মিডিয়া। বিশেষ করে ভিযুয়াল মিডিয়া –

'সোজা ভাষায়, ভিযুয়াল মিডিয়া, টিভি ও সিনেমা হল ভাবমূর্তি তৈরির ক্ষেত্রে পশ্চিমা সভ্যতার সবচেয়ে শক্তিশালি মাধ্যম। অ্যামেরিকান প্রতিদিন গড়ে সাতঘন্টা

[৭৩] https://concernedwomen.org/images/content/bornorbred.pdf

টিভি দেখে। এই সাতঘন্টা সময় সাধারন মানুষের চিন্তার জগতে ঢোকার এমন একটি দরজা আমাদের জন্য খুলে রেখেছে যার মধ্য দিয়ে একটা ট্রোজান হর্স ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব...যতো বেশি ও যতো উচ্চস্বরে সম্ভব, সমকাম, সমকামিতা এবং সমকামিদের কথা বলুন। বারবার দেখতে দেখতে থাকলে প্রায় যেকোন কাজই মানুষের কাছে 'নরমাল' মনে হওয়া শুরু করে...তবে মানুষের সামনে আগেই সমকামি আচরণ উপস্থাপন করা যাবে না – কারন তা মানুষের কাছে জঘন্য বলে মনে হবে এবং মানুষ সমকামিতার বিরুদ্ধে চলে যাবে। তাই সমকামিদের যৌনাচার সাধারন মানুষের সামনে উপস্থাপন করা যাবে না। আগে তাবুর মধ্যে উটের নাক ঢুকাতে দিন, তারপর আস্তে আস্তে বাকিটাও ঢুকানো যাবে।' [Kirk & Madsen, The Overhauling of Straight America]

আর বাস্তবিকই ধীরে ধীরে এই দরজার মধ্য দিয়ে ট্রোজান হর্স ঢুকাতে সমকামি মাফিয়া সমর্থ হয়েছে। ৯০ এবং ২০০০ এর প্রথম দশক জুড়ে বিভিন্ন ডেইলি সোপ ধীরে ধীরে সাধারন অ্যামেরিকানদের মধ্যে সমকামিতার গ্রহনযোগ্যতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট জৌ বাইডেন ২০১২ সালে সরাসরি সমকামিতা প্রচার করা টিভি সিরিয 'উইল অ্যান্ড গ্রেইস'-এর নাম উল্লেখ করে বলে –

> *"একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষকে একজন নারী আরেকজন নারীকে বিয়ে করবে এতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই...আমার মনে হয় না অ্যামেরিকান মানুষকে (সমকামিতা সম্পর্কে) শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে উইল অ্যান্ড গ্রেইসের মতো ভূমিকা আর কেউ বা আর কোন কিছু রাখতে পেরেছে। যা অন্যরকম মানুষ সেটাকে ভয় পায়। কিন্তু এখন মানুষ (সমকামিতার ব্যাপারে) বুঝতে শুরু করেছে।"* [৭৪]

আর একইভাবে আজ বাংলাদেশেও এই একই দরজার ভেতর দিয়ে সেই একই ট্রোজান হর্স ঢোকানোর জন্য কর্মতৎপরতা চলছে। কার্ক-ম্যাডসেনের ব্লু-প্রিন্ট বাংলাদেশে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সমকামিতার প্রচারে মিডিয়ার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্ক-ম্যাডসেনের মত ছিল প্রাথমিকভাবে প্রিন্ট মিডিয়া থেকে শুরু করা, এবং তারপর ধীরে ধীরে ভিযুয়াল মিডিয়ার দিকে আগানো। বাংলাদেশে সমকামিতা প্রচারের কাজ শুরু হয় ৯০ এর দশকের শেষের দিকে।

প্রাথমিকভাবে সমকামিতা প্রচারকদের কাজ ছিল অনলাইন চ্যাট গ্রুপ, মেইল গ্রুপ, ফোরাম ইত্যাদির মাধ্যমে সমকামিদের মধ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে পরিচিতি তৈরি করা, বিভিন্ন সময় একত্রে 'মিলিত' হওয়া এবং কিছু নির্দিষ্ট অঙ্গনে সমকামিতার প্রচার করা, এবং সমকামিতার পক্ষে জনমত তৈরি করা।

---

[৭৪] http://ew.com/article/2012/05/06/joe-biden-will-and-grace-gay-marriage/

পর্দার আড়ালে যারা

বাংলাদেশে সমকামিতার প্রসার নিয়ে গবেষণায় আমরা অবাক হয়েছি, আমাদের ধারণাতীত বিপদ সীমা থেকে তাদের কার্যক্রম এখন প্রতিষ্ঠিত পর্যায়ে চলে এসেছে। দেশের নামীদামি বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব, প্রতিষ্ঠান তাদেরকে এই কার্যক্রমে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের সমকামীদের স্বীকৃত যে সংস্থা আছে তাদের ওয়েবসাইট এবং সোশ্যাল সাইটে তাদের কার্যক্রম দেখলে তাদের দৌরাত্ম সম্পর্কে অবাক হতে হয়। বাংলাদেশে আত্মস্বীকৃত সমকামী সংগঠনের অন্যতম হল "BOB"। আমরা তাদের কার্যক্রম নিয়ে এখানে আলোচনা করব।

BOB প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে, যার অন্যতম উদ্যোক্তা হলেন আত্মস্বীকৃত সমকামী তানভীর আলম। যে একসময় এই সংগঠনে তৈরির উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে বলে- "আমরা (সমকামীরা) আমাদের যৌন অধিকার নিশ্চিত করতে চাই। এর স্বীকৃতি চাই।" এই সংগঠনের ওয়েবের স্লাইডে তিনটি স্লোগান দেওয়া আছে।

ক) ভালবাসা হল মানুষের আবেগীয় অনুভূতি, কোনও আইন দিয়ে তাকে বাধা যায় না।

খ) অদ্ভুত তারাই যারা কাউকে ভালবাসতে জানে না।

গ) বৈষম্য নয়, বৈচিত্র্যকে ধারণ করুন।

এই তিনটি স্লোগানে তাদের মূল উদ্দেশ্য ফুটে উঠে। অর্থাৎ দেশের প্রচলিত আইন সমকামিতার বিপক্ষে যা #৩৭৭ ধারা নামে পরিচিত। এই আইনে বলা আছে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোনো পুরুষ, নারী বা জন্তুর সাথে প্রকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে একান্তবাস করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।ব্রিটিশ আমলে, ১৮৬০ সালে সেকশন ৩৭৭ নামে একটি আইন করা হয়েছিল যেটার মূল বক্তব্য ছিল নারীপুরুষের স্বাভাবিক যৌনমিলন ছাড়া বাকি সবধরনের যৌনতা বেআইনি। এই সেকশনের ওয়ার্ডিং বেশ ব্যাপক হলেও মূলত এটি ছিল সমকামিতার ব্যাপারে। পাশের দেশ ভারতের আদালতের রায়ে এই সেকশন ৩৭৭ কেই বাতিল করা হয়েছে। বাংলাদেশকেও কিন্তু এই সেকশন ৩৭৭ বাতিল করতে বলা হচ্ছে। জাতিসঙ্ঘ থেকে অলরেডি ২০১৩ সালে বাংলাদেশকে সরাসরি এই ব্যাপারে চাপ দেয়া হয়েছে। এই বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

BOB তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে জানায় তারা Human Rights Forum of Bangladesh, Human Rights Alliance of Bangladesh and

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association এই সংস্থাগুলোর পূর্ণ সদস্য।

তাদের মিশন সমকামিতা নিয়ে যে কোন সহিংসতা বা বৈশম্যের স্বীকার যারা তাদের নিয়ে কাজ করা। আর ভিশন হল, এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে লিঙ্গ(জেন্ডারভিত্তিক) বৈষম্য ছাড়াই সবাই যে যার মতো জীবনকে উপভোগ করতে পারবে।

তাদের কার্যক্রম প্রক্রিয়া তিন ধাপে বিভক্তঃ

ক) কমিউনিটি মোবাইলাইযেশনঃ তারা বিভিন্ন গেট টু গেদার, বনভোজন, ছবি প্রদর্শন, কর্মশালা সহ আরো কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে সমকামীদের একসাথে করে (যেহেতু সমাজ এখনো তাদের কে সেভাবে স্বীকৃতি দেয় নি)। এই সব অনুষ্ঠানে তারা মানবাধিকার বিষয়গুলো মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ্যে আনে। তারা সাইকো-সোশ্যাল সাপোর্ট দেওয়ার জন্য ২৪/৭ টেলিফোন সুবিধা দিয়ে থাকে।

"কান পেতে রই" তাদের এমনই এক টেলিফোনমাধ্যম মানসিক সাপোর্ট সেবা। তাদের দাবি তারা হতাশাগ্রস্থদের এখানে কাউন্সিলিং দেওয়ার চেষ্টা করে, মূলত তারা একজন সমকামীকে আরও অন্ধকারে নিয়ে যাওয়ার ফাঁদ আঁটে।

খ) এডবোকেসিঃ সমকামিতা কোন অপরাধ নয় এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পলিসি মেকার ও গবেষকদের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করে। তাদের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন গবেষণা পত্র উপস্থাপন করে সমাজে সমকামীদের অবস্থান বৈধ করার (মানিয়ে নেওয়া) পাশাপাশি তাদের অধিকার নিশ্চিত করা।

সেই লক্ষ্যে ২০১৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর রাজধানীর মহাখালীতে আইসিডিডিআরবি(icddrb) এর জেমস পি গ্র্যান্টস্কুল আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে সমকামিতাকে একটি স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানায়। ওইদিন সংগঠনটি প্রথমবারের মতো ৬০০ আত্মস্বীকৃত সমকামীর ওপর পরিচালিত একটি জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে। যেখানে সমকামীদের ৫৬ দশমিক ৯ শতাংশ বলেছে, বিয়ের পরও তাদের যৌনাচরণ পরিবর্তন করবে না।

গ)নেটওয়ার্কিং: তাদের দাবি সামাজিক যেকোন মুভমেন্ট এর সাথে তারা জড়িয়ে কাজ করে যেগুলো নারী অধিকার, মানবাধিকার এবং মাইনরটিদের নিয়ে কথা বলে। তারা দাবি করছে, যেহেতু তারা রেজিস্টার্ড কোন সংস্থা নয় তাই তারা বিভিন সেবা সংস্থার সাথে মিলে কাজ করে থাকে। এমনকি তারা নিয়মিত বিভিন্ন সভা-সেমিনার

এর আয়োজন করে থাকে দেশ ও দেশের বাহিরে।

সারা বাংলাদেশব্যাপী সমকামীরা বিভিন্ন নাম দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বিদেশী এনজিওগুলো অর্থায়নে জেলায় জেলায় সমকামীদের ক্লাব খুলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সুসংগঠিত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে সমকামীদের সংগঠন দ্বারা পরিচালিতক কিছু ক্লাবের নাম : **১) লাইট হাউস কনসোর্টিয়াম (বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এদের কার্যক্রম), ২) বন্ধু (সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি), ৩) ওডপাপ, ৪) সাস (বরিশাল বিভাগে এদের কার্যক্রম), ৫) হাসাব।**

সমকামীদের স্বাস্থ্যগত সেবা দিয়ে থাকে যে সকল এনজিও সংস্থা: **১) আশার আলো সোসাইটি, ২) মুক্ত আকাশ বাংলাদেশ, ৩) জাগরি, ৪) ক্যাপ।**

সমকামীদের আইনগত সহায়তা দিয়ে থাকে যে সকল সংগঠন : **১) বাংলাদেশ মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরাম (বিএমএসএফ), ২) আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)।**

যে সকল বিদেশী সংস্থা বাংলাদেশের সমকামীদের অর্থায়ন করছে: **১) ফ্যামিলি হেলথ্ ইন্টারন্যাশনাল, ২) রয়েল নেদারল্যান্ডস এ্যাম্বেসি, ৩) ইউনাইটেড নেশন পপুলেশন ফান্ড (ইউএনএফপিএ), ৪) 'হাতি' প্রকল্প, বিশ্বব্যাংক, ৫) মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (MJF), ৬) আরসিসি প্রোজেক্ট অব দি গ্রোবাল ফান্ড আইসিডিডিআরবি।**

সমকামী, 'গে' নামগুলো ব্যাপক বিতর্কিত হওয়ায় এরা নাম পরিবর্তন করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে এরা ব্যবহার করছে 'এমএসএম' নামটি। এমএসএম অর্থ – মেল টু মেল সেক্স।

বাংলাদেশে সমকামীদের উস্কে দেওয়ার জন্য বিদেশী এনজিওগুলো কাজ শুরু করে প্রায় ২০ বছর আগে, ১৯৯৬ সালে। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক জেলায় জেলায় এদের কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এদেরকে দেখলে মনে হতে পারে এরা বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের কাজ করছে, কিন্তু বাস্তবে সেরকম নয়।

এসব সংগঠনগুলো সমাজে প্রবেশ করতে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করছে। যেমন- বিভিন্ন স্কুল-কলেজে ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগীতামূলক অনুষ্ঠান করা, বিভিন্ন দিবসে ছাত্রদের দিয়ে র‍্যালী করানো, এইডস বিষয়ে সচেতন করা, বিভিন্ন সভাসমাবেশ করা, এমনকি ধর্মীয় মাহফিলের আয়োজন করা, বিতর্ক প্রতিযোগীতার আয়োজন করা, মাদক ও যৌতুক বিরোধী সভা করা, উপজাতি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে কাজ করা,

নাচগান, নাটকসহ ও বিনোদন অনুষ্ঠান করা।

পুরুষ সমকামী বা এমএসএম'দের নিয়ে এরা দুভাবে কাজ করে।

ক) ফিল্ড অফিস ভিত্তিক, খ) ডিআইসি (ড্রপইনসেন্টার)। যেমন- এদের বিভিন্ন জেলা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। (খুলনা ডিআইসি, পাবনা ডিআইসি)

অনেকে হয়ত ভাবতে পারে, এ সংগঠনগুলো সমকামীদের অধিকার নিয়ে কাজ করছে। আসলে ব্যাপারটা সে রকম নয়। এদের কাজগুলোকে ঠিক সমকামীদের অধিকার নিয়ে কাজ বলা যায় না।

মূলত এদের কাজ হচ্ছে সমাজে সমকামীতাকে ভাইরাল করা, অর্থাৎ পুরুষ পতিতা দিয়ে পুরুষ সমাজকে সমকামীতায় প্রলুব্ধ করা, সমকামীতার বিস্তার ঘটানো। আপনি হয়ত আরো ভাবতে পারেন, বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। আসলে বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায়ে নেই, অনেক দূর পর্যন্ত এরা শিকড় গেড়ে ফেলেছে।

আমরা BOB এর তিনটি ধারাবাহিক ধাপ থেকে জানতে পারি, সমকামীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা দেশীয় বা আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি, বিভিন্ন এনজিও অথবা সংস্থার সাথে মিশে তাদের ব্যবহার করা। তাদের মাধ্যমে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের সমবেদনা আদায় করা তাদের মূল লক্ষ্য। নিচের আলোচনায় আমরা তাই দেখব তারা কিভাবে সেলিব্রেটি ব্যবহার করে তাদের অধিকার আদায়ের যাত্রায় নেমেছে।

পাবলিক স্ফেয়ারে যখন তারা তাদের বিকৃতি প্রচারের শুরু করে তখন তারা সেটা করে প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে। ২০১০ সালে বইমেলায় শুদ্ধস্বর প্রকাশনী থেকে বের হয় কুখ্যাত মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা অ্যামেরিকা প্রবাসি ইসলামবিদ্বেষি অভিজিৎ রায়ের বই 'সমকামিতা' (আমরা তার বইয়ের বিভিন্ন অপযুক্তি আমাদের বইয়ের "আতশ কাচের নিচে" পাঠের শুরুর দিকে খন্ডন করেছি) অভিজিৎ রায় এই বইয়ে বিজ্ঞানের জগাখিচুড়ি ব্যাখ্যা দিয়ে এবং নানা লজিকাল ফ্যালাসি ব্যবহার করে সমকামিতা-কে স্বাভাবিক মানবিক আচরণ হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। তার অন্যান্য লেখার মতো এই লেখাটিও ছিল মূলত বিভিন্ন পশ্চিমা লেখকের লেখার ছায়া অনুবাদ। ২০১০ সালে অগাস্টে আলতাফ শাহনেওয়াজ নামে একজনের লেখা অভিজিৎ রায়ের বইটির রিভিউ প্রকাশ করে প্রথম আলো। আর এর মাধ্যমে প্রায় সবার অলক্ষ্যে তাদের বিশাল পাঠক বেইসের ড্রয়িং রূপে এই জঘন্য বিকৃতির সাফাই পৌছে দেয় প্রথম আলো।

বাংলাদেশে প্রকাশ্যে সমকামিতার প্রসারে পরবর্তী বড় পদক্ষেপটি আসে ২০১৪

সালে, রূপবান নামে একটি ম্যাগাযিনের মাধ্যমে। আর এই ম্যাগাযিনের পক্ষে প্রচারনা চালানো হয় প্রিন্ট মিডিয়া (যেমন ডেইলি স্টারে বিজ্ঞাপন দেয়ার মাধ্যমে) এবং অনলাইনের মাধ্যমে। ২০১৪ সালে রূপবানের প্রথম সংখ্যার প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ হাই-কমিশনার রবার্ট গিবসন, ব্যারিস্টার সারা হোসেনসহ আরো অনেকে। এ থেকে গ্লোবাল সমকামি মাফিয়ার প্রভাব এবং বাংলাদেশে এদের বিস্তার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। ম্যাগাযিনটির প্রকাশনার খবর ফলাও করে প্রচার করা হয় ডেইলি স্টার, বাংলা ট্রিবিউন, ঢাকা ট্রিবিউন, বিবিসি সহ বিভিন্ন পত্রিকা ও গণমাধ্যমে।

শুধু এখানেই থেমে থাকা নয়, BOB ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে বিট্রিশ কাউন্সিলে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রথম সারির কয়েকজন ব্যক্তিবর্গ। তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য মিডিয়া ব্যক্তিত্ব চিত্রপরিচালক নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু এবং অভিনেত্রী এষা ইউসুফ ছিলেন যারা অনুষ্ঠানটির সঞ্চলন করেছিল। মূলত অনুষ্ঠানটি ছিল সমকামীদের গেট টু গেদার এর অংশ। এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা সমকামীতাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে "ধী" কমিক চরিত্রের উদ্ভোদন করেছিল।

সেদিন সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হয় অনুষ্ঠানটি। এতে উপস্থিত সবার মাঝে 'ধী' কমিকটির ফ্রি কপি বিতরণ করা হয়। খাওয়ানো হয় উন্নত মানের নাস্তা। আয়োজন করা হয় বিনোদন অনুষ্ঠানের। এতে গান পরিবেশন করে 'ঘাসফড়িং কয়ার' নামে একটি ব্যান্ড দল। উক্ত সমাবেশে পারফর্ম করায় এষা ও ইউসুফ এবং ঘাসফড়িং কয়ারকে সমকামীরা ধন্যবাদও জানিয়েছে। সমকামী চরিত্র 'ধী'র কন্টেন্ট ডেভেলপ করেছে চারজন। এর একজন হলেন মেহনাজ খান। তিনি বলেন, "ধী চরিত্রের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সমকামিতা সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে চাই। কারণ আমরা কাকে ভালোবাসবো এ ব্যাপারে আমরা স্বাধীনতা চাই।"

BOB এর দাবি ছিল- এই কমিকের মাধ্যমে সারাদেশে "ভালবাসার স্বাধীনতা" বার্তাটি পৌছে যাবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন-- ঢাকাস্থ আমেরিকান সেন্টারের পরিচালক মিস অ্যান ম্যাককোনেল, ব্যারিস্টার সারাহ হোসেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কামরুজ্জামান রাহাত, "নিজেরা করি" এনজিও এর সমন্বয়কারী খুশি কবির সহ আরো প্রতিষ্ঠিত অনেকে। খুশি কবির বলেন, "আশা করছি পরেরবার এই ধরনের অনুষ্ঠান আমরা প্রকাশ্যেই করবো, যেমনভাবে আমরা ঘরের মধ্যে গোপনে আমাদের সমকামী জীবনযাপন করতে চাই না"।

কার্ক-ম্যাডসেনের প্রেসক্রিপশান অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যবহারের পর এবার বাংলাদেশে সমকামিতার প্রচারকরা ভিযুয়াল মিডিয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া শুরু করেছে। সম্প্রতি আরটিভিতে প্রচারিত নাটক তাই নতুন কিছু না, বরং প্রায় দুই দশক পুরনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নতুন একট পর্যায়ের শুরু কেবল। গ্রামীনফোন প্রযোজিত এই নাটকে হুবহু কার্ক-ম্যাডসেনের শিখিয়ে দেওয়া 'যুক্তি'গুলোই তুলে ধরা হয়েছে, এবং নাটকের ডায়ালগের মাধ্যমে সমকামিতাকে জন্মগত ও স্বাভাবিক, এবং সমকামিতা নৈতিকভাবে নিউট্রাল একটি কাজ হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। নাটকে দেখানো হয়েছে সমকামি চরিত্রের পক্ষ নিয়ে একটি চরিত্র আরেকটি চরিত্রকে বলছেঃ

> *'ও পায়ুকামি (not straight), এটা কি ওর দোষ? সে কি এটাকে বেছে নিয়েছে? না। ওয়ার্ল্ডে নানা*
>
> *ধরনের মানুষ থাকে, তাহলে ও কেন থাকতে পারবে না? ও কি অস্বাভাবিক? না। ও কি একজন*
>
> *অপরাধী? না। ও তোমার আমার মতোই নরমাল মানুষ।'*
>
> *[রেইনবো, আরটিভি, নির্মাতাঃ আশফাক নিপুন, প্রযোজনাঃ গ্রামীন ফোন]*

অতি সম্প্রতি কিছু ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ব্রাক এনজিওর প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদ এর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটি সংবাদ। যদিও অনেকের কাছে ব্রাক শুধু একটি শোষণের প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠান, তবে তাদের অনেক বিতর্কিত কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি বলে দেয়- তারা বাংলাদেশে কি চাচ্ছে। তারা বাংলাদেশের সংস্কৃতি ভেঙ্গে দিয়ে তাতে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে সুদকে বৈধতা, কথিত নারী বৈষম্যতার নামে যৌন হয়রানি উন্মুক্তকরণ, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে পারিবারিক সম্পর্কগুলো ভেঙ্গে দেওয়া আরো অনেক কাজ। সমকামিতাকে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা শুরু করে যাচ্ছে, তাতে প্রথম নামটি সবসময় এই এনজিওর নামটি আসে। সম্প্রতি তাদের প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুতে বাংলাদেশ পায়ুকাম সমিতির (আকাশ থেকে মাটিতে পড়ার মতো কথা হলেও, এটাই সত্য) সভাপতি দেশের প্রথম সারির অনলাইন পত্রিকার মাধ্যমে শোক প্রকাশ করেন। পাঠকের সমালোচনায় পরে তারা সংবাদটি মুছে ফেলে, তাই আমরা রেফারেন্স হিসেবে উৎস দিতে পারি নি।

যদি বাংলাদেশে কার্ক-ম্যাডসেনের ব্লু-প্রিন্ট নির্বিঘ্নে অনুসৃত হতে থাকে তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা এরকম আরো অনেক নাটক, শর্টফিল্ম, স্কিট এবং জনসচেতনতা মূলক বিজ্ঞাপন দেখতে পাবো। এক পর্যায়ে পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতাগুলোতে সমকামিতার স্বপক্ষে প্রবন্ধ ছাপা হবে। সমকামিতা নিয়ে বানানো নাটক

ও সিনেমাকে জাতীয় পুরষ্কার, মেরিল প্রথম-আলো পুরস্কার সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরষ্কার দেওয়া হবে। পর্যায়ক্রমিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমকামি অধিকার সম্পর্কে প্রকাশ্যে নানা ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে, পাবলিক স্কুলের কারিকুলামে সমকামিতা ও সমকামি অধিকার সম্পর্কে আলোচনা যুক্ত করা হবে। এবং যদি সম্ভব হয় তাহলে সমকামি কোন তরুন বা তরুণীকে দেশী ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ার মাধ্যমে ইয়ুথ আইকন হিসেবে উপস্থাপন করা হবে। আর এভাবে ধীরে ধীরে সমকামিতাকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহনযোগ্য করে তোলা হবে একসময় একে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হবে। অথবা আইনগত স্বীকৃতি ছাড়াই একসময় সমকামিতে সমাজে ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা লাভ করবে, যেমনটা বর্তমানে যিনার ক্ষেত্রে হয়েছে। অ্যামনিস্টি ইন্টারন্যাশনাল, যারা মানবাধিকার অধিকার সংস্থা হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত সেবা সংস্থা। সম্প্রতি তাদের ভার্চুয়াল পেইজে ঘোষণা দিয়েছে, তারা ২০২০ সালকে সামনে রেখে তিনটি লক্ষ্য নিয়েছে- সকল দেশে গর্ভপাত বৈধ করা, মৃত্যুদন্ডের শাস্তি বাতিল করা ও সমকামিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।[৭৫]

যদি এইভাবেই চলতে থাকে তাহলে অত্যন্ত অন্ধকার এক ভবিষ্যৎ এর মোকাবেলা আমাদের করতে হবে। তাই এ ব্যাপারটা বোঝা জরুরী যে এ দ্বন্দ্বটা সাময়িক কিছু না। কোন একটা নাটক বা বই বা ম্যাগাযিনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ সমকামিতাকে রাতারাতি গ্রহনযোগ্যতা দিতে চাচ্ছে না। এই নাটক, বই বা ম্যাগাযিনগুলোও এভাবে বানানো হচ্ছে না। তারা চাচ্ছে ক্রমাগত মানুষের সামনে সমকামিতা, ও সমকামিতার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে, সমকামিতাকে স্বাভাবিক প্রমান করতে। প্রাকৃতিক প্রমান করতে। এই ব্যাপারে মানুষের সংবেদনশীলতা নষ্ট করে দিতে। মানুষকে ডিসেনসেটাইয করতে। জনমতকে পরিবর্তন করতে, সামাজিক মূল্যবোধকে বদলে দিতে। প্রতিপক্ষের আছে প্রায় অফুরন্ত ফান্ডিং, মিডিয়া এবং আঞ্চলিক-আন্তর্জাতিক প্রশাসনিক সমর্থন। সুতরাং একটি নাটকের পর সেই নাটক নিয়ে লেখালেখি করলে অনেক মানুষ এসব সম্পর্কে জেনে যাবে – এমন ধারণা যেমন সঠিক না, তেমনি ভাবে একটি নাটকের পর কেবলমাত্র আরটিভি-গ্রামীনফোন বর্জনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে হারানো যাবে এমন চিন্তা করাও ভুল। যদি আসলেই এই বিশাল মেশিনারীকে থামাতে হয়, যদি এই এজেন্ডার বাস্তবায়নকে বন্ধ করতে হয় তাহলে সমকামি এজেন্ডা বাস্তবায়নের পেছনে থাকা কাঠামো সম্পর্কে জানতে হবে, একে চ্যালেঞ্জ করতে হবে।

সমকামিতা ও বাংলাদেশ বিষয়ে আলোচনা থেকে একটা ভয়ংকর বিষয় পাওয়া

---

[৭৫] তাদের তথ্যমতে সমকামি অধিকার নিশ্চিত এর অনুপাত (সম্পন্নঃ ১২৩, বাকিঃ৬৮), গর্ভপাত বৈধকরণ (সম্পন্নঃ ৬৭, বাকিঃ১২৭), মৃত্যুদন্ড শাস্তি বাতিল (সম্পন্নঃ১০৬, বাকি:৯২)

যায় তাহলো পেডোফেলিয়া। বিভিন্ন গবেষক থেকে জানা যায় যে যারাই সমকামি হয়ে থাকে তারা কোন না কোন সময়ে শিশুকামী হয়ে থাকে। কারণ যতদিন পর্যন্ত একজন সমকামী তার কদর্যতা প্রকাশের সঙ্গী খুঁজে না পায়, ততদিন সে কদর্যতা প্রকাশের জন্য শিশুকামী হওয়ার সুযোগ খুঁজে। শিশুকাম এবং সমকাম দুটো ভিন্ন বিষয়, তবু শিশুকাম যেহেতু সমকামিদের প্রাথমিক রাস্তা এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতি এই বিষয়গুলো ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে শিশুকাম দু'ভাবে হয়ে থাকে আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং পর্দার আড়ালে। সাম্প্রতি আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এর ভয়ংকর বিষয়গুলো পত্রিকা বা মিডিয়াতে আসলেও "পর্দার আড়ালে" ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো সামনে আসে না। "পর্দার আড়ালে" ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর সাথে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের সম্পর্ক হওয়া সত্ত্বেও মিডিয়া এগুলো এড়িয়ে যায় এক অদ্ভুত কারণে। কারণ তাদের ঘরের মানুষরাই ই সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িত। আবার আবাসিক প্রতিষ্ঠান বলতে মাদ্রাসা, স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা বুঝানো হচ্ছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের নীতি-নির্ধারকদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর পরও না দেখার অভিনয় করে যাচ্ছে। ফলে মিডিয়া তথ্যগুলো আরো চটকদার করার সুযোগ পাচ্ছে।

যেহেতু আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে সমকামিতার রাস্তাগুলো সম্পর্কে মানুষকে সতর্কতা করা তাই আমরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিষয়গুলো আলোচনার চেষ্টা করব। আমরা প্রথমেই বলে রেখেছি সমকামিতার সঙে জড়িত প্রত্যেক টি প্রতিষ্ঠান বা যারা জড়িত তাদের মুখোশ ফাঁস করে দিব সে মসজিদের ইমাম বা স্কুলের টিউটর বা জনপ্রিয় কোন সাহিত্যিক ই হোক না কেন। আমাদের "সমকামিতা ও বাংলাদেশ" প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে সমকামিদের তৎপরতার রাস্তাগুলো ইতোমধ্যে আপনাদের কাছে প্রকাশ করেছি। এই পাঠে আমরা সমকামিতার সাথে শিশুকাম এর সম্পর্ক প্রকাশ করার পাশাপাশি বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে কারা এর পিছনে রয়েছে তা আলোচনা করব। যেহেতু এটা ভিন্ন বিষয় তাই আমরা এই পাঠেই একে কিভাবে কবর দিতে হবে তার রাস্তা বলে দেওয়ার চেষ্টা করব, ইন শা আল্লাহ্।

তাহলে চলুন এক ভয়ের জগতে প্রবেশ করি।

পাঠ ১৪।। ভয়ের জগত

আমাদের গবেষণায় দেখেছি বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে সমকামিদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয় শিশুরা। তবে এই শিশুকামিতাকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে চায়, কারণ এক শ্রেণীর শিশুকামী আছে যা দেশীয় পত্রিকায় আজকাল হর হামেশা সংবাদ হয়ে থাকে যা মূলত "বলাৎকার" নামে প্রসিদ্ধ। আর এক শ্রেণীর আছে যারা শিশুদেরকে যৌনকর্মী হিসেবে ব্যাবহার করে থাকে। যেহেতু বিষয় দুটো বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তাই আমরা শিশুকামিতা নিয়ে আলোচনা করব। এই বিষয়টি আলোচনার পিছনে প্রধান কারণ হল- অনেক অজ্ঞেয়বাদী ই দাবি করে যে শিশুকামিতার সাথে সমকামিতার সম্পর্ক নেই। আমাদের এই পাঠের আলোচনায় এই বিতর্কের যাথার্থতা যাচাই করব।

"পাঠক, সাবধান!

১. অপ্রত্যাশিতভাবে অনির্ধারিত কালের জন্য ছুটি পাওয়া গেছে। নানা কারনে নজরদারী নেই, জবাবদিহিতা নেই। চিন্তাহীন এবং আনন্দময় একটা সময়। আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগের কথা। সকাল ন'টার মতো বাজছে। রোদ মাথায় নিয়ে হাকডাক করতে করতে বাসার সামনের আন্ডার-কন্সট্রাকশান বিল্ডিং-এর ছাদ ঢালাই –এর কাজ করছে ওয়ার্কাররা। নাস্তা শেষে এক তলার সামনের বারান্দাতে গল্পের বই নিয়ে বসলেও পুরোটা মনোযোগ বইয়ের দিকে নেই। পড়া ফেলে মাঝে মাঝেই এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। পাহাড়ী এলাকায় বাসা। কিংবা বলা যায় পাহাড় কেটে বানানো আবাসিক এলাকা। বারান্দার ডান দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের খন্ডিত ছিটেফোঁটা।

বিক্ষিপ্ত ভাবে এদিক ওদিক তাকাবার সময় খেয়াল হল বারান্দার পাশে পাহাড়ের খন্ডিত ছিটেফোটার অংশে দাড়ানো কেউ একজন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বই থেকে পুরোপুরি মাথা না উঠিয়ে আড়চোখে তাকালাম। সমবয়েসী একটা ছেলে। জীর্ন-মলিন পোশাক। সম্ভবত পাতা কুড়োতে এই দিকে আসা। মনে হল আমার চাইতে হাতে ধরা বইয়ের প্রতিই দর্শনার্থীর মনোযোগ বেশি। আড়চোখে ছেলেটাকে বার দুয়েক দেখে নিয়ে কায়দা করে বইটাকে ঘুরিয়ে ধরলাম ছেলেটা যাতে পুরো প্রচ্ছদটা দেখতে পায়। মনে মনে এক গাল হেসে নিলাম। স্বাভাবিক। কেনার সময়ই বইটার প্রচ্ছদে চোখ আটকে গিয়েছিল। বইটার গল্প নিয়ে আমি সন্দিহান ছিলাম। তবুও, বলা যায় প্রচ্ছদের আকর্ষনেই অন্যান্য বইগুলোকে ফেলে এ বইটাকে বেছে নেওয়া। মনে মনে

বারকয়েক নিজের পিঠ চাপড়ে দিলাম। কাজ ফেলে সমবয়েসী একটা ছেলে আমার বইয়ের প্রচ্ছদের দিকে তাকিয়ে থাকা নিঃসন্দেহে আমার সিদ্ধান্তের যথার্থতার অকাট্য প্রমান।

বইটা ছিল সেবা প্রকাশনীর জনপ্রিয় কিশোর হরর সিরিযের। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে এক্স-ফাইলস, গুসবাম্পস, রসওয়েল সহ হরর/থ্রিলার/সায়েন্স ফিকশান জাতীয় বিভিন ওয়েস্টার্ন টিভি সিরিয ও সিনেমার জনপ্রিয়তার সময়ে শুরু হয়েছিল "কিশোর হরর" সিরিয। সেবা প্রকাশনীর নিয়মিত পাঠকদের কাছে, বিশেষ করে স্কুল পড়ুয়া "তিন গোয়েন্দা" পাঠকদের কাছে খুব দ্রুতই জনপ্রিয় ওঠে 'কিশোর হরর'। হরর সিরিযের জনপ্রিয়তার প্রভাবে কিছুদিন তিন গোয়েন্দা সিরিয থেকেও "কিশোর চিলার" নামে কিছু বই প্রকাশ করা হয়। আমার হাতে ধরা বইটার নাম ছিল বৃক্ষমানব। প্রচ্ছদে ছিল সবুজ রঙের বিকৃত বিকট এক মুখের ছবি। ৯৭ এ প্রকাশিত "বৃক্ষমানব" ছিল সেবা-র কিশোর হরর সিরিযের প্রথম দিকের বই এবং আমাদের (আমার এবং আপুর জয়েন্ট ভেনচার) কেনা কিশোর হরর সিরিযের প্রথম বই। লেখকের নাম, টিপু কিবরিয়া

২. সেবার কিশোর হরর সিরিয আর সিরিযের লেখকের নাম নানা কারন প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। বই পড়ার নেশা দীর্ঘদিন ভোগালেও ইংরেজি গল্প আর টিভি-শোর মধ্যম মানের নকল পড়ার চাইতে সোর্স ম্যাটেরিয়াল পড়াটাই বেশি লজিকাল মনে হত। তাছাড়া স্কুলের দিনগুলোতে সম্পূর্ণ অবসর সময়টা বইয়ের জন্য বরাদ্দ থাকলেও সময়ের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে বইয়ের জন্য বরাদ্দটা। টিপু কিবরিয়ার বিস্মৃতপ্রায় নামটা মনে করিয়ে দেয় ২০১৪ এর জুন থেকে অগাস্ট পর্যন্ত প্রকাশিত বেশ কিছু নিউয রিপোর্ট। প্রায় দু'মাস ধরে প্রকাশিত এসব রিপোর্টের সারসংক্ষেপ পাঠকের জন্য এখানে তুলে ধরছি।

আন্তর্জাতিক শিশু পর্নোগ্রাফির ভয়ঙ্কর একটি চক্র বাংলাদেশে বসেই দীর্ঘ নয় বছর ধরে পর্নো ভিডিও তৈরি করে আসছিল পথশিশুদের ব্যবহার করে। আন্তর্জাতিক শিশু পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দেশের তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। ২০১৪ এর ১০ জুন ইন্টারপোলের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে শিশু পর্ণোগ্রাফি তৈরির দায়ে সিআইডি গ্রেফতার করে টি আই এম ফখরুজ্জামান ও তার দুই সহযোগীকে। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, এ চক্র আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী ছেলেশিশুদের দিয়ে পর্নো ছবি তৈরি করতো। এ চক্রের মূল হোতা টি আই এম ফখরুজ্জামান, টিপু কিবরিয়া নামে অধিক পরিচিত। সমাজের কাছে

পরিচিত দেশের একটি খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থার কিশোর থ্রিলার ও হরর সিরিযের লেখক হিসেবে। এছাড়া তার বেশ কিছু শিশুতোষ গল্প উপন্যাসের বইও রয়েছে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে এখন সামনে চলে এসেছে তার অন্ধকার জগতের পরিচয়ই।

১৯৯১ সাল থেকে ১০ বছর সেবা প্রকাশনীর কিশোর পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন টিপু। ফ্রি-ল্যান্স আলোকচিত্রী হিসেবে কাজ শুরু করেন ২০০৩ সাল থেকে। গড়ে তোলেন একটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটিও। রাজধানীর মুগদায় আছে তার একটি স্টুডিও। এ সময় তার তোলা ছেলে পথশিশুদের ছবি ইন্টারনেটে বিশেষ করে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করতেন টিপু। এই ছবি দেখে সুইজারল্যান্ড ও জার্মানির পর্নো ছবির ব্যবসায়ীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে নগ্ন ছবি পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। দেয়া হয় টাকার প্রস্তাবও। রাজি হয়ে যায় টিপু। ফুঁসলিয়ে ও টাকার বিনিময়ে পথশিশুদের সংগ্রহ করে নগ্ন ছবি তুলে পাঠাতে শুরু করে। কিছু ছবি পাঠানোর পরই প্রস্তাব দেয়া হয় পর্নো ভিডিও পাঠানোর। শুরু হয় ভিডিও তৈরির কাজ। সময়টা ২০০৫ সাল। নুরুল আমিন ওরফে নুরু মিয়া, নুরুল ইসলাম, সাহারুলসহ কয়েকজনের মাধ্যমে বস্তিসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে ছিন্নমূল ছেলে শিশুদের সংগ্রহ করেন টিপু। মুগদার মানিকনগরের ওয়াসা রোডের ৫৭/এল/২ নম্বর বাড়ির নিচতলায় দুই রুমের বাসা ভাড়া নিয়ে জমে ওঠে ফ্রি-ল্যান্স ফটোগ্রাফির আড়ালে পথশিশুদের দিয়ে পর্নো বানানো ও ইন্টারনেটে বিদেশে পাঠানোর রমরমা ব্যবসা। নয় বছরে কমপক্ষে ৫০০ শিশুর পর্ণোগ্রাফিক ভিডিও তৈরি করে টিপু ও তার সহযোগীরা। ৩০০-৪০০ টাকা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ৮-১৩ বছরের এসব পথশিশুদের এ কাজে ব্যবহার করা হতো।

শিশুদের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচারে লিপ্ত হতেন টিপু এবং তার সহযোগীরা। বেশির ভাগ সময় ভিডিও করতেন টিপু নিজেই। একপর্যায়ে এই জঘন্য অপরাধ পরিণত হয় টিপুর নেশা ও পেশায়। আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে টিপু বলেছেন, তিনি পর্নো ছবি তৈরি করে জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের তিন ব্যক্তির কাছে পাঠাতেন। এঁদের একেকজনের কাছ থেকে প্রতি মাসে ৫০ হাজার করে মোট দেড় লাখ টাকা পেতেন তিনি। তবে তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি জানিয়েছে, ১৩টি দেশের ১৩ জন নাগরিকের কাছে শিশু পর্নোগ্রাফি পাঠাতেন টিপু কিবরিয়া। এসব দেশের মধ্যে আছে ক্যানাডা, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, মধ্য ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ। তদন্তে আরো জানা গেছে বেশির ভাগ ছবি ও ভিডিও পাঠানো হতো জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে। তারপর সেখানকার ব্যবসায়ীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এসব পর্নো ছবি বিক্রি করতো। প্রতিটি সিডির জন্য ৩শ' থেকে ৫শ' ডলার পেতেন টিপু। এই টাকা টিপুর কাছে পাঠানো হতো ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের মাধ্যমে।

টিপুর মাধ্যমে বাংলাদেশও ঘুরে গেছেন শিশু পর্নো বিক্রির দুই হোতা। চলতি বছরের (২০১৪) প্রথম দিকে জার্মানির এক পর্নো ছবি বিক্রেতা বাংলাদেশে এসেছিলেন। আর ২০১২ সালে আসেন সুইজারল্যান্ডের আরেক পর্নো বিক্রেতা। ওঠেন ঢাকার আবাসিক হোটেলে। সে সময় তাদের কাছে ছেলে শিশু পাঠান বাংলাদেশও ঘুরে গেছেন। সেই শিশুদের ধর্ষন করে তারা। এজন্য টিপু এবং তার সহযোগীরা পায় ৮ হাজার ডলার।

ইন্টারপোলের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১০ ও ১১ জুন খিলগাঁও, মুগদা এবং গোড়ানে অভিযান চালিয়ে টিপু কিবরিয়া এবং তার তিন সহযোগী নুরুল আমিন, নুরুল ইসলাম ও সাহারুলকে গ্রেফতার করে সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম টিম। স্টুডিওতে আপত্তিকর অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ১৩ বছরের এক শিশুর সাথে টিপুর সহযোগী নুরুল ইসলানকে। টিপুর খিলগাঁওয়ের তারাবাগের ১৫১/২/৪২ নম্বর বাড়ির বাসা ও স্টুডিও থেকে শতাধিক পর্নো সিডি, আপত্তিকর শতাধিক স্থির ছবি, ৭০টি লুব্রিকেটিং জেল, ৪৮ পিস আন্ডারওয়ার, স্টিল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, কম্পিউটার হার্ডডিস্ক, সিপিইউ, ল্যাপটপসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।[৭৬]

টিপু কিবরিয়ার ফ্লিকার লিঙ্ক - http://bit.ly/2b1ZXiu

টিপু কিবরিয়ার ব্লগ (সামওয়্যার ইন ব্লগ) লিঙ্ক - http://bit.ly/2aHYxuv

উপরের তথ্যগুলো ভয়ঙ্কর। তবে বাস্তবতা এর চেয়েও লক্ষগুন বেশি ভয়ঙ্কর। টিপু কিবরিয়ারা একটা বিশাল নেটওয়ার্কের ছোট একটা অংশ মাত্র। বিশ্বব্যাপী চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি ও পেডোফাইল নেটওয়ার্কের ব্যাপ্তি, ক্ষমতা ও অবিশ্বাস্য অসুস্থ অমানুষিক নৃশংসতার প্রকৃত চিত্র এতোটাই ভয়াবহ যে প্রথম প্রথম এটা বিশ্বাস করা একজন মানুষের জন্য কঠিন হয়ে যায়। আর একবার এ অসুস্থতা ও বিকৃতির বাস্তবতা, মাত্রা, প্রসার, ও নাগাল সম্পর্কে জানার পর, প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এ ভয়াবহতাকে মাথা থেকে দূর করা। আমাদের চারপাশের বিকৃত, অসুস্থ পৃথিবীটার এ এমন এক বাস্তবতা যা সম্পর্কে জানাটাই একজন মানুষের মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এ এমন এক অন্ধকার জগত যাতে মূহুর্তের জন্য উকি দেয়া আমৃত্যু তাড়া করে বেড়াতে পারে একজন মানুষকে।

---

[৭৬] শিশু পর্নোগ্রাফি॥ দুই সহযোগিসহ শিশু সাহিত্যিক টিপু কিবরিয়া গ্রেপ্তার – বাংলার মুখ
ঢাকার শিশু পর্নো চক্রের শিকার প্রায় ৫০০ বালক: পুলিশ - বিবিসি
পর্নোছবি নির্মাণের অভিযোগে শিশু সাহিত্যিক টিপু গ্রেফতার – বাংলানিউয২৪
নয় বছর ধরে শিশু পর্নো তৈরিতে যুক্ত টিপু কিবরিয়া -১৩ দেশে পাঠানো হতো এসব পর্নো ছবি – প্রথম আলো
অর্থের লোভে শিশু পর্নোগ্রাফি করেছি, সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদে কিবরিয়া – দেশ টিভি

টিপু কিবরিয়ার লেখা কিশোর হরর সিরিযের বইগুলোর ব্যাক কাভারে দুটো লাইন সবসময় দেয়া থাকতো –

"পাঠক, সাবধান! ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি!!"

এ লাইনদুটো ছিল কিশোর হরর সিরিযের ট্যাগলাইনের মতো। সেবার বইগুলোর পাতায় উঠে আসা অন্ধকারের কল্পিত গল্পগুলোর জন্য লাইন দুটোকে অতিশয়োক্তি মনে হলেও, যে অন্ধকারে বাস্তবর জগতের চিত্র তুলে ধরতে যাচ্ছি তার জন্য এ লাইনদুটোকে কোনক্রমেই অত্যুক্তি বলা যায় না। তাই টিপু কিবরিয়াকে দিয়ে যে গল্পের শুরু সে গল্পের গভীরে ঢোকার আগে টিপুর ভাষাতেই সতর্ক করছি–

"পাঠক, সাবধান!

ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি!!"

৩. টিপু কিবরিয়াকে যদি ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে চিন্তা করেন তবে তার বানানো শিশু পর্ণোগ্রাফির মূল পরিবেশক এবং ব্যবহারকারীরা হল পশ্চিমা বিশেষ করে ইউরোপিয়ানরা। শুধুমাত্র চোখের ক্ষুধা মেটানোয় তৃপ্ত না হয়ে টিপুর এ ইউরোপিয়ান ক্রেতাদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশে ঘুরে গেছে। কিছু ডলারের বিনিময়ে তার ইউরোপিয়ান ক্রেতাদের জন্য তৃপ্তির ব্যবস্থা করেছে টিপু কিবরিয়া। দুঃখজনক সত্য হল, পেডোফিলিয়া নেটওয়ার্ক ও চাইল্ড পর্ণোগ্রাফির বিশ্বব্যাপী ধারা এটাই। ঠিক যেভাবে কম খরচে পোশাকের চাহিদা মেটানোর জন্য নাইকি-র মতো আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো ম্যানুফাকচারিং এর কাজটা "তৃতীয় বিশ্বের" দেশগুলোর কাছে আউটসোর্স করে, ঠিক তেমনিভাবে পশ্চিমারা বিকৃতকামীরা শিশু পর্নোগ্রাফি তৈরি এবং শিশুকামের জন্য আউটসোর্স করে শিশু সংগ্রহের কাজটা। টিপু কিবরিয়ার মতো এরকম এ ইন্ডাস্ট্রির আরো অনেক ম্যানুফ্যাকচারার ছড়িয়ে আছে বিশ্বজুড়ে। তিনটি উদাহরন তুলে ধরছি।

রিচার্ড হাকল – ১৯৮৬ তে ব্রিটেনে জন্মানো হাকল তার 'নেশা ও পেশা'র বাস্তবায়নের জন্য বেছে নেয় দক্ষিন পূর্ব এশিয়াকে। লাওস, ক্যাম্বোডিয়া, সিঙ্গাপুর এবং ইন্ডিয়াতে পদচারনা থাকলেও হাকল তার মূল বেইস হিসেবে বেছে নেয় মালয়শিয়াকে। কুয়ালামপুরের আশেপাশে বিভিন্ন দারিদ্র দারিদ্রকবলিত অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর মাঝে সক্রিয় খ্রিষ্টান মিশনারীদের সাথে সম্পর্কের কারনে সহজেই মালয়শিয়াতে নিজের জন্য জায়গা করে নেয় হাকল। কখনো ফ্রি-ল্যান্সিং ফটোগ্রাফার, কখনো ডকুমেন্টারি পরিচালক, কখনো ইংরেজী শিক্ষক, আর কখনো নিছক খ্রিষ্টান মিশনারী হিসেবে অনায়াসে মালয়শিয়াসহ দক্ষিন এশিয়ার বিভিন্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিশুদের কাছাকাছি

পৌছে যায় সে।

২০০৬ থেকে শুরু করে প্রায় ৮ বছরের বেশি সময় ধরে দক্ষিন এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দরিদ্র শিশুদের উপর চালায় যৌন নির্যাতন। তার নির্যাতনের শিকার হয় ৬ মাস থেকে ১৩ বছর বয়সী দুইশ'র বেশি শিশু। গ্রেফতারের সময় তার ল্যাপটপে পাওয়া যায় বিশ হাজারের বেশি পর্ণোগ্রাফিক ছবি। টিপু কিবরিয়ার মতোই ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিশু ধর্ষনের ভিডি এবং ছবি বিক্রি করতো হাকল। ছবি ও ভিডিওর সাথে যোগ করতো বিভিন্ন মন্তব্য, ক্যাপশান। এরকম একটি ওয়েবপোষ্টে হাকল লেখে, "পশ্চিমা মধ্যবিত্ত ঘরের শিশুদের চাইতে দরিদ্রদের শিশুদের পটানো অনেক, অনেক বেশি সহজ।"

তিন বছর বয়েসী একটি মেয়ে শিশুকে ধর্ষনরত অবস্থা ছবির নিচে গর্বিত হাকলের মন্তব্য ছিল – "তুরুপের তাস পেয়ে গেছি! আমার কাছে এখন একটা ৩ বছরের বাচ্চা আছে। কুকুরের মতো অনুগত। আর এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কেউও এখানে নেই!"

অন্যান্য শিশুকামীদের জন্য পরামর্শ এবং বিভিন্ন গাইডলাইন সম্বলিত "Paedophiles And Poverty: Child Lover Guide"" নামে একটি বইও লিখেছিল রিচার্ড হাকল। হাকলের স্বপ্ন ছিল দক্ষিন এশীয় গরীব কোন মেয়েকে বিয়ে করে একটি অনাথ আশ্রম খোলা, যাতে করে নিয়মিত নতুন দরিদ্র শিশুদের সাপ্লাই পাওয়া যায় কোন ঝামেলা ছাড়াই। ২০১৪ সালে রিচার্ড হাকলকে গ্রেফতার করা হয়।[৭৭]

ফ্রেডি পিটস – হাকলের জন্মের আগেই হাকলের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করা লোকটার নাম ফ্রেডি পিটস। সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ১৯৯১ পর্যন্ত, প্রায় ১৭ বছর গোয়াতে গুরুকুল নামে একটি অনাথ আশ্রম পরিচালনা করে ফ্রেডি। হাকলের মতো ফ্রেডিও ছিল ক্যাথলিক চার্চের সাথে যুক্ত। এলাকায় মানুষ তাকে চিনতো লায়ন ক্লাবের সিনিয়র সদস্য, নির্বিবাদী সমাজসেবক 'ফাদার ফ্রেডি' হিসেবে। টিপু কিবরিয়া এবং রিচার্ড হাকলের মতোই ফাদার ফ্রেডির আয়ের উৎস ছিল পেডোফিলিয়া এবং চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি। তার সাথে সম্পর্ক ছিল ব্রিটেন, হল্যান্ড, অ্যামেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের শিশুকামী সংগঠনের। ফাদার ফ্রেডি তার আশ্রমের শিশুদের ভাড়া দিতো ইউরোপিয়ান টুরিস্ট, বিশেষ করে সমকামী ইউরোপিয়ান পুরুষদের কাছে। শিশুদের ধর্ষনের বিভিন্ন অবস্থার ছবি তুলে ইউরোপিয়ান ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করতো ফ্রেডি। নিজেও অংশগ্রহন করতো ধর্ষনে। বিশেষ 'ক্লায়েন্টদের' মনমতো শিশু সংগ্রহ করে তাদের ইউরোপে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হতো ফ্রেডির "গুরুকুল" থেকে। এভাবে প্রায়

[৭৭] Prolific Paedophile Raped Babies And Toddlers Huckle Tried To Cash In On Child Abuse Pics British paedophile 'planned to marry victim and abuse foster children'
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Huckle

দুই দশক ধরে ফাদার ফ্রেডি গোয়াতে গড়ে তোলে এক বিশাল ইন্ডাস্ট্রি।

ফ্রেডির এসব কার্যকলাপের সাথে বিভিন্ন বিদেশী ব্যাক্তি এবং আন্তর্জাতিক চক্র জড়িত থাকার প্রমান পাওয়া সত্ত্বেও গোয়ার রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করে এ বিষয়গুলো চাপা দেয়ার। এমনকি প্রথম পর্যায়ে চেষ্টা করা হয় দুর্বল মামলা দিয়ে ফ্রেডিকে খালাস দেয়ার। খোদ রাজ্যের অ্যাটর্নী জেনারেল এবং ট্রায়াল জাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে ফ্রেডির বিরুদ্ধে পাওয়া প্রমান ও নথিপত্র ধ্বংস করার চেষ্টার।

উচু মহলের এসব কূটকৌশলের সামনে রুখে দাড়ায় কিছু শিশু অধিকার সংস্থার এবং কর্মী। তাদের একজন শিলা বারসি। রাজ্য সরকার, মন্ত্রী, বিচারবিভাগ এবং মিডিয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে ফ্রেডি পিটসের মামলার ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন শিলা। গ্রেফতারকালীন রেইডে ফাদার ফ্রেডির ফ্ল্যাটে পাওয়া যায় ড্রাগস, পেইন কিলার, এবং সিরিঞ্জের এক বিশাল কালেকশান। ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয় ২৩০৫ টি পর্ণোগ্রাফিক ছবি। মামলার কারনে, দায়িত্বের খাতিরে শিলা বাধ্য হন প্রতিটি ছবি খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে। ফাদার ফ্রেডির ফ্ল্যাটে পাওয়া ২৩০৫ টি ছবিতে দেখা অন্ধকার অমানুষিক পৈশাচিকতার জগতের ভয়াবহ স্মৃতি আমৃত্যু তাকে তাড়া করে বেড়াবে বলেই শিলার বিশ্বাস।

ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্টকে দেয়া সাক্ষাৎকারে শিলা বলেন –

> *"সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছবিটি ছিলে আড়াই বছর বয়েসী একটি মেয়ের। মেয়েটিকে ছোট ছোট হাত আর পা গুলো ধরে তাকে চ্যাংদোলা করে, অনেকটা হ্যামকের মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল... একটা বিশালদেহী লোক... লোকটাকে... লোকটার শরীরের আংশিক দেখা যাচ্ছিল... সে বাচ্চাটাকে ধর্ষন করছিল। বাচ্চাটার কুঁচকানো চেহারায় ফুটে ছিল প্রচন্ড ব্যাথা আর শকের ছাপ। ছবিতে দেখেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল বাচ্চাটা সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করছিল।"* [৭৮]

ছবিগুলো দেখার পর শিলা সিদ্ধান্ত নেন যেকোন মূল্যে ফ্রেডির সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার। ১৯৯২ সালে ফ্রেডি পিটসের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়া হয়, এবং ৯৬ এর মার্চে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কারাভগ্রত অবস্থায় ২০০- সালে ফ্রেডি পিটস মারা যায়।[৭৯]

---

[৭৮] Why Goa should never forget Freddy Peats? Notorious child abuser arrested in the 90's

[৭৯] A Can Of Worms: Paedophile Freddy Peats is convicted, but is it an isolated case? Their latest holiday destination: Tim McGirk tells a horror story from India, the country now favoured by sex tourists Freddy Peats died Tehelka Articles Archive Six-year-old sexually abused victim describes how he was sodomised

পিটার স্কালি – পিটার স্কালির গল্পের মতো এতো বিকৃত, নৃশংস, এবং এতোটা বিশুদ্ধ পৈশাচিকতার কাহিনী খুব সম্ভবত আমাদের এ পাইকারী বিকৃতির যুগেও খুব বেশি খুজে পাওয়া যাবে না। স্কালি অস্ট্রেলিয়ান। নিজ দেশে ব্যাবসায়িক ফ্রডের পর নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে চলে আসে ফিলিপাইনে। কিছুদিন রিয়েল এস্টেট ব্যবসার চেষ্টার পর মনোযোগ দেয় আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি বানানোয়। বেইস হিসেবে বেছে নেয় দারিদ্র কবলিত মিন্দানাওকে। গড়ে তোলে এক চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি সাম্রাজ্য।

টিপু কিবরিয়া, হাকল আর ফাদার ফ্রেডির মতো স্কালিও নিজেই ছিল, স্ক্রিপ্ট রাইটার, পরিচালক এবং অভিনেতা। তবে বাকিরা কেবল শিশুকামের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও, বিকৃতিকে স্কালি নিজে যায় আরেকটি পর্যায়ে। শিশুকামের সাথে মিশ্রণ ঘটায় টর্চারের। স্কালির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভিডিওতে ধর্ষনের পাশাপাশি মারাত্মক ধরনের টর্চার করা হয়, ১৮ মাস বয়েসী একটি মেয়েশিশুকে। ১২ ও ৯ বছরের দুটি মেয়েকে বাধ্য করা হয় ধর্ষন ও নির্যাতনে অংশগ্রহন করতে। যখন ভিডিও করা বন্ধ থাকতো তখন বন্দী এ মেয়ে দুটিকে বিবস্ত্র অবস্থায় কুকুরের চেইন পড়িয়ে রাখতো স্কালি। তাদের বাধ্য করতো বাসার আঙ্গিনাতে নিজেদের জন্য কবর খুড়তে। পরে এ দুজনের একজনকে স্কালি হত্যা করে। লাশ লুকিয়ে রাখে রান্নাঘরের টাইলসের নিচে। তারপর হত্যা করার ভিডিও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিক্রি করে স্কালি।

স্কালির ভিডিওগুলো দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপিয়ান পেডোফাইল এবং চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি নেটওয়ার্কে। রাতারাতি স্কালি পরিণত হয় "সেলেব্রিটি কাল্ট-হিরোতে"। শুরুতে তার ভিডিওগুলোর জন্য Pay-Per View Streaming অফার করলেও, চাহিদা এবং জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় এক পর্যায়ে লাইভ স্ট্রিমিং শুরু করে স্কালি। ২০১৫ এর ফেব্রুয়ারিতে গ্রেফতার কয়া হয় স্কালি ও তার সহযোগী দুই ফিলিপিনো তরুণীকে। তদন্তকারী অস্ট্রেলিয়ান ও ফিলিপিনো পুলিশের ধারনা বিভিন্ন সময়ে কমপক্ষে ৮ জন শিশুর উপর যৌন ও শারীরিক নির্যাতন চালানোর ভিডিও ধারন করেছে স্কালি। তবে প্রকৃত সংখ্যাটা হতে পারে আরো বেশি।[৮০]

৪. টিপু কিবরিয়া, রিচার্ড হাকল, ফ্রেডি পিটস, পিটার স্কালি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে, তাদের অপরাধ এবং বিকৃতির মধ্যে বেশ কিছু যোগসূত্র বিদ্যমান। এরা সবাই শিকারের জন্য বেছে নিয়েছিল দারিদ্রপীড়িত

---

[৮০] Catching a monster: The global manhunt for alleged pedophile Peter Gerard Scully
Execution calls for Melbourne man Peter Gerard Scully accused of depraved acts in the Philippines Peter Gerard Scully made Philippines children dig own grave: victims
This is the face of Australia's most dangerous man.

এশিয়ান শিশুদের। এদের মূল অডিয়েন্স এবং ক্লায়েন্ট বেইস ছিল পশ্চিমা, বিশেষ করে ইউরোপিয়ান। আর এরা চারজনই চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি এবং গ্লোবাল পেডোফিলিয়া নেটওয়ার্কের সাপ্লাই চেইনের খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ। খুব অল্প পুজিতে, এবং অল্প সময়ে ওরা সক্ষম হয়েছিল বিশাল গ্লোবাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে কিংবা এধরনের নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হতে। এ দৃষ্টিকোন থেকে এ চারজনকে সফল উদ্যোক্তাও বলা যায়।

এ চার জন ধরা পড়েছে এটা ভেবে আমরা আত্মতৃপ্তি ভোগ করতেই পারি, কিন্তু বাস্তবতা হল একটা বিশাল মার্কেট, একটা বিপুল চাহিদা ছিল বলে, আছে বলেই এতো সহজে এ লোকগুলো এই কাজগুলো করতে পেরেছিল। আমাদের কাছে এ লোকগুলোর কাজ, তাদের বিকৃতি, পৈশাচিকতা যতোই অচিন্তনীয় মনে হোক না কেন বাস্তবতা হল পিটার স্কালি কিংবা টিপু কিবরিয়ারা এ অন্ধকার জগতের গডফাদার না, তারা বড়জোড় রাস্তার মোড়ের মাদক বিক্রেতা। একজন গ্রেফতার হলে তার জায়গায় আসবে আরেকজন।

২০১৪ তে রিচার্ড হাকলের গ্রেফতারের পর ২০১৫, সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হয় বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা শিশুকামী ও শিশু নির্যাতনকারী নেটওয়ার্কের হোতা ৭ ব্রিটিশ। ভয়ঙ্কর অসুস্থতায় মেতে ওঠা এই লোকগুলো শিশুদের ওপর চালানো তাদের পৈশাচিক নির্যাতন সরাসরি সম্প্রচার করতো ইন্টারনেটের মাধ্যমে। বিশেষ অফার হিসেবে লাইভ চ্যাটের অন্যান্য শিশুকামীদের সুযোগ দেয়া হতো ঠিক কিভাবে শিশুদেরকে নির্যাতন ও ধর্ষন করা হবে তার ইন্সট্রাকশান দেবার। অর্থের বিনিময়ে নিজেদের সহ-মুক্তচিন্তকদের আনন্দের ব্যবস্থা করতেন তারা। ব্রিটেন জুড়ে প্রমান মিলেছে এরকম আরো অনেক সক্রিয় নেটওয়ার্কের অস্তিত্বের।[৮১]

ফ্রেডি পিটসের গ্রেফতারের পরও গোয়ার শিশুকাম ভিত্তিক টুরিস্ট ইন্ডাস্ট্রির প্রসার থেমে থাকেনি। ফাদার ফ্রেডির শূন্যস্থান পুরন করেছে অন্য আরো অনেক ফ্রেডি। তেহেলকা ডট কমের ২০০৪ এর একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিবছর গোয়া থেকে ঘুরে যায় প্রায় ১০,০০০ পেডোফাইল। গোয়ায় অবস্থান করার সময় প্রতিটি পেডোফাইল যৌন নির্যাতন চালায় গড়ে আটজন শিশুর উপর।[৮২]

২০১৫ তে অস্ট্রেলিয়াতে গ্রেফতার হয় ম্যাথিউ গ্র্যাহ্যাম। ২২ বছর বয়েসী ন্যানো টেকনোলজির ছাত্র ম্যাথিউ নিজের বাসা থেকে গড়ে তোলে চাইল্ড পর্ণগ্রাফি এবং

---

[৮১] Seven members of 'terrifyingly depraved' paedophile gang jailed

[৮২] The Violence of Paedophilia in Goa

পেডোফিলিয়ার এক অনলাইন সাম্রাজ্য। ম্যাথিউ নিজে কখনো সরাসরি যৌন নির্যাতনে অংশগ্রহন না করলেও সক্রিয় পেডোফাইলদের জন্য সে হোস্ট করতো অসংখ্যা সাইট এবং ফোরাম। হোস্ট করত। বিশেষভাবে শিশুদের উপর ধর্ষনের সাথেসাথে চরম মাত্রার শারীরিক নির্যাতনের ভিডিও প্রমোট করা ছিল ম্যাথিউর স্পেশালিটি। ম্যাথিউর নেটয়ার্কের সাথে সম্পর্ক ছিল আরেক অস্ট্রেলিয়ান পিটার স্কালির।[৮৩]

১৫-তেই গ্রেফতার হয় আরেক অস্ট্রেলিয়ান শ্যানন ম্যাকুল। শ্যানন কাজ করত সরকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাডিলেইড চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে। এ সেন্টারের বিভিন্ন শিশুরা ছিল শ্যাননের ভিকটিম। এই শিশুদের অধিকাংশ ছিল ৩-৪ বছর কিংবা বয়সী কিংবা তার চেয়েও ছোট। শ্যানন যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের ভিডিও নিজের সাইট ও ফোরামের মাধ্যমে আপলোড ও বিক্রি করতো। খুব কম সময়েই শ্যাননের সাইট ও ফোরাম কুখ্যাতি অর্জন করে।[৮৪]

এভাবে প্রতিটি শূন্যস্থানই কেউ না কেউ পূরন করে নিয়েছে। টিপু কিবরিয়ার রেখে যাওয়া স্থানও যে অন্য কেউ দখল করে নেয় নি এটা মনে করাটা বোকামি। আমরা জানতে পারছি না হয়তো, কিন্তু যতোক্ষন পর্যন্ত চাহিদা থাকবে ততোক্ষন যোগান আসবেই। সহজ সমীকরণ। একোনমিক্স ১০১।

২০০৬ এ ওয়ালস্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী চাইল্ড পর্ণোগ্রাফিতে প্রতিবছর লেনদেন হয় ২০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। এটা ২০০৬ এর তথ্য। গত দশ বছরে মার্কেটে এসেছে হাকল, স্কালি, শ্যানন, গ্র্যাহামের মতো আরো অনেক "উদ্যাক্তো", বেড়েছে মার্কেটের আকার। ২০১১ সালের একটি রিসার্চ অনুযায়ী ২০০৮ থেকে ২০১১, এ তিনবছরে অনলাইনে চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি সংক্রান্ত ইমেজ এবং ভিডিও বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৭৭৪%।[৮৫]

ইন্ডেক্সড ইন্টারনেট বা সাধারনভাবে ইন্টারনেট বলতে আমরা যা বুঝি তার তুলনায় ডিপওয়েব প্রায় ৫০০ গুন বড়। এ ডিপওয়েবের ৮০% বেশি ভিযিট হয় শিশুকাম, শিশু পর্ণোগ্রাফি এবং শিশুদের উপর টর্চারের ভিডিও ইমেজের খোজে।[৮৬]

বিষয়টা একবার চিন্তা করুন। চেষ্টা করুন এ বিকৃতির প্রসারের মাত্রাটা অনুধাবনের। পৃথিবীতে আর কখনো এধরনের বিকৃতি দেখা যায় নি এটা বলাটা ভুল হবে। পম্পেই,

---

[৮৩] Melbourne 'hurtcore' paedophile master Matthew Graham pleads guilty

[৮৪] Shannon McCoole: Notorious paedophile testifies against alleged administrator of dark net abuse ring

[৮৫] Measuring the Child-Porn Trade Sexual Predators/ Exploitation/Child Pornography

[৮৬] Over 80 Percent of Dark-Web Visits Relate to Pedophilia, Study Finds

বা গ্রীসের কামবিকৃতির কথা আমরা জানি, আমরা জানি সডোম আর গমোরাহর ধ্বংসপ্রাপ্ত কওমে লূতের কথা। কিন্তু বর্তমানে আমর যা দেখছি, এ মাত্রার বিকৃতি ও তার বিশ্বায়ন, এ মাত্রার ব্যবসায়ন, এ ব্যাপ্তি মানব ইতিহাসের আগে কখনো কি দেখা গেছে? আর কখনো কি হয়েছে এভাবে বিকৃতির বাণিজ্যিকীকরণ?

আমার জানা নেই। কেন এতো মানুষ এতে আগ্রহী হচ্ছে? কেন জ্যামিতিক হারে প্রসারিত হচ্ছে এ ইন্ডাস্ট্রি? কেন এতোটা মৌলিক পর্যায়ে এ হারে অবিশ্বাস্য বিকৃতি ঘটছে মানুষের? কেন বিকৃতি ঘটছে? আর কেনই বা এমনসব পৈশাচিক ঘটনার পরও এধরনের ইন্ডাস্ট্রি শুধু টিকেই থাকছে না বরং আরো বড় হচ্ছে? শ্যানন-স্কালি-টিপু কিবরিয়াদের এ নেটওয়ার্কের গডফাদার কারা? কোন খুঁটির জোরে তারা থেকে যাচ্ছে ধরাছোয়ার বাইরে? একে কি শুধুমাত্র বিচ্ছিন কোন ঘটনা, কিংবা অসুস্থতা বলে দায় এড়ানো সম্ভব? সমস্যাটা কি চিরাচরিত কাল থেকেই ছিল এবং বর্তমান আধুনিক সভ্যতার যুগে এসে এর প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে? নাকি এর পেছনে ভূমিকা রয়েছে মিডিয়া ও পপুলার কালচারের? বিষয়টি কি মৌলিক ভাবে মানুষের যৌনতার মাঝে বিরাজমান কোন বিকৃতির সাথে যুক্ত? নাকি এ বিকৃতি আধুনিক পশ্চিমা দর্শনের যৌনচিন্তা এবং আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার মৌলিক অংশ?

ফলো দা মানি

ব্রুস

রাইমারদের বিয়ে হয়েছিল অল্প বয়সে। প্রেগনেন্সির ব্যাপারে যখন জানলো, তখনো ওদের বিয়ে হয়নি। জ্যানেটের বয়স ১৯, রনাল্ডের ২০। জ্যানেটের সবসময় শখ ছিল যমজ ছেলের। তাই যমজ দুই ভাই ব্রুস আর ব্রায়ানের জন্ম ছিল স্বপ্ন সত্য হবার মতো। তারপরই খুব তাড়াতাড়ি দুটো প্রমোশন হল রনাল্ডের। ছোট্ট এক রুমের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ওরা গিয়ে উঠলো মোটামুটি বড়সড় একটা ঘরে। রাইমারদের জীবন সুন্দর ছিল। গৃহিণী মা, পরিশ্রমী বাবা। আর ঘর আলো করে রাখা যমজ দু'ই ভাই। পিকচার পারফেক্ট।

ছন্দপতন হল ছ'মাসের মাথায়। ডায়াপার পাল্টানোর সময় ব্যাপারটা প্রথম চোখে পড়ে জ্যানেটের।। ও ভেবেছিল ভেজা ডায়াপারের কারণেই বুঝি ওরা কাঁদতো। কিন্তু দেখা গেল ডায়াপার ছাড়া রাখলেও কান্না থামছে না। প্রস্রাবের সময় সমস্যা হচ্ছে। ডাক্তার জানালেন ওরা দুজনেই ভুগছে ফিমোসিসে। ফিমোসিস গুরুতর কোন সমস্যা না। মোটামুটি কমনই বলা যায়। ছেলে বাচ্চারা ফিমোসিসের কারণে ঠিক মতো প্রস্রাব করতে পারে না। তবে খুব বেশি চিন্তিত হবার কারণ নেই। অধিকাংশ, ক্ষেত্রে ফিমোসিস

ঠিক হয়ে যায় আপনাআপনিই। তবে সেইফ সাইডে থাকার জন্য সারকামসিশান, অর্থাৎ খৎনা করানোর পরামর্শ দিলেন ডাক্তার। যমজ দু ভাইয়ের বয়স যখন ৭ মাস, তখন ওদের নিয়ে যাওয়া হল সারকামসিশানের জন্য।

সারকামসিশান বা খৎনা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা খুব সহজ একটা প্রক্রিয়া। ৯৯% চেয়েও বেশি ক্ষেত্রে বড় ধরণের কোন ঝামেলা ছাড়াই কাজটা হয়ে যায়। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে খোলা আকাশের নিচে পিড়িতে বসিয়ে বাঁশের চিমটা, ক্ষুর আর কাঁচি দিয়েই সুন্নাতে খৎনা করা হয়। কয়েক মিনিটের মামলা। পশ্চিমা বিশ্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়। তবে এয়ার কন্ডিশনড হসপিটালের অপারেশান থিয়েটারে, স্টেরিয়ালাইযড ক্ল্যাম্প আর স্ক্যালপেল দিয়ে। ব্রুস আর ব্রায়ানের ক্ষেত্রেও যদি এমনটা হত, তাহলে হয়তো এ গল্প আমাদের শুরু করতে হতো অন্য কোন ভাবে। কিন্তু ব্রুস আর ব্রায়ানের অপারেশনের দায়িত্বে থাকা ৪৬ বছর বয়েসী জেনারেল প্র্যাক্টিশানার ডাঃ য'ন মারি সেই দিন সিদ্ধান্ত নিলেন স্ক্যালপ্যালের বদলে বোভি কটারি মেশিন ব্যবহারের। এ ডিভাইসে একটি ছোট জেনারেটরের মাধ্যমে সূচের মতো ইলেক্ট্রোডের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়। বিদ্যুতের প্রবাহের কারণে ইলেক্ট্রোডে যে তাপ উৎপন্ন হয় তা দিয়ে "কাটা" হয়। একটা ছুরি বা স্ক্যালপেলের সাথে এ ডিভাইসের পার্থক্য হল, এক্ষেত্রে "কাঁটা" হয় মূলত পোড়ানোর মাধ্যমে। এ পদ্ধতির সুবিধা হল সৃষ্ট হওয়া ক্ষতের প্রান্তগুলো তাপের কারণে পুড়ে যেতে থাকে। যার ফলে বন্ধ হয়ে যায় রক্তনালী মুখগুলো এবং ব্লিডিং তুলনামূলক ভাবে কম হয়। পদ্ধতিটিকে ইলেক্ট্রো-কটারাইযেশান (electrocautery) বলা হয়। মূলত আঁচিল জাতীয় গ্রোথ ফেলে দেয়ার জন্য ইলেক্ট্রোকটারাইযেশানকে কার্যকরী মনে করা হয়। কিন্তু সারকামসিশান বা খৎনার ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রোকটারাইযেশান ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বিপদজনক।

১৯৬৬ –র এপ্রিলের ঐ সকালে বারবার ঝামেলা করছিল ডাঃ যন মারির হাতের ডিভাইসটা। প্রথমে ইলেক্ট্রো-কটারি মেশিনের ডায়াল সেট করা হয় 'মিনিমামে'। কিন্তু ডাঃ যন মারি প্রথমবার চামড়া বিচ্ছিন্ন করতে ব্যর্থ হন। এবার হেমোস্ট্যাট ডায়াল বেশ অনেকদূর বাড়িয়ে দেয়া হল। তৃতীয় বার ব্রুসের যৌনাঙ্গের চামড়ার সাথে ইলেক্ট্রোড স্পর্শ করানোর সাথে সাথে রুমের সবাই মাংস পোড়ার শব্দ ও গন্ধ পেলো। ডাক্তাররা বুঝতে পারলেন খুব বড় ধরণের একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। হসপিটালের বেডে ঘুমন্ত ব্রুসের দু'পায়ের মাঝখানে জ্যানেট আর রনাল্ড পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া সুতোর মতো কিছু একটা দেখতে পেল। পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে ব্রুসের সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যাওয়া লিঙ্গ ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ডাক্তাররা ব্রায়ানের উপর সার্জারি

না করার সিদ্ধান্ত নেন। অন্য আরো অনেকের মতোই কিছু দিন পর আপনাআপনিই ঠিক হয়ে গেল ব্রায়ানের ফিমোসিসের সমস্যা। কিন্তু অপরিমেয় ক্ষতি হয়ে গেল ব্রুসের। আজ থেকে প্রায় ৫৫ বছর আগে, ১৯৬৬ তে প্লাস্টিক সার্জারি ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে। রি-কনস্ট্রাকটিভ সার্জারির মাধ্যমে ভুল শুধরে নেয়ারও কোন উপায় ছিলো না।

কীভাবে কী হয়ে গেল, জ্যানেট আর রনাল্ড বুঝতে পারছিলো না। যেন মুহূর্তের মাঝে এক ঝড় এসে লণ্ডভণ্ড করে দিল সব কিছু। চিন্তা করতে বসলে অনেকে সময় পুরো ব্যাপারটা জ্যানেটের কাছে অবাস্তব মনে হতো। ব্রুস আর কোনদিনই আর দশটা ছেলের মতো হতে পারবে না, এ চিন্তাটা ওদের ভেতরে থেকে ওদের কুড়ে কুড়ে খেতো। ওরা নিজেদের দোষী ভাবছিল।

ডঃ জন মানিকে ওরা প্রথম দেখে টিভি পর্দায়। দুর্ঘটনার প্রায় দশ মাস পর, মধ্য ফেব্রুয়ারির এক সন্ধ্যায়। This Hour Has Seven Days নামের ক্যানেইডিয়ান ব্রডক্যাস্টিং কর্পোরেশানের জনপ্রিয় টক শো-তে। কালো মোটা ফ্রেমের চশমার পেছনে শান্ত চোখ দুটোতে বুদ্ধির ছাপ। ডানদিকে সিঁথি করা চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। নীরবতায় এবং কথা বলার সময়, ভেতর থেকে ঠিকরে বের হয় নিয়ন্ত্রিত আত্মবিশ্বাস। বুদ্ধিমান, ক্যারিশম্যাটিক। সাইকলোজিস্ট, পিএইচডি, হার্ভার্ড। মানুষটা কথা বলেন খুব ঠাণ্ডা মাথায়। দেখে মনে হয় এমন মানুষের উপর আস্থা রাখা যায়। জ্যানেট আর রনাল্ড রাইমার মনে মনে এমন একজনকেই খুঁজছিলো। টকশোতে জন মানি কথা বলছিলেন বাল্টিমোরে খোলা জনস হপকিন্স হসপিটালের নতুন একটি ক্লিনিক নিয়ে। মানির উদ্যোগে খোলা এ ক্লিনিকের উদ্দেশ্য ছিল সার্জারির মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক হিজড়া বা Hermaphrodite/Intersex নারী ও পুরুষদের লিঙ্গ পরিবর্তন করা। এটা ছিল অ্যামেরিকাতে এধরনের প্রথম ক্লিনিক। মানির গবেষণা ছিল মূলত এ বিষয় নিয়েই। রাইমাররা টিভির পর্দায় ড. মানিকে বলতে শুনলো –

"আমাদের কাছে গুরুতর মনে হলেও, যেসব মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছেন, একটা সমাধানের জন্য মরিয়া হয়ে আছে, তাদের জন্য এধরনের সার্জারি সারকামসিশানের চেয়ে তেমন আলাদা কিছু না।"

নিঃসন্দেহে ড. মানির সাক্ষাৎকার অত্যন্ত ইন্টেরেস্টিং ছিল। তবে পুরো ব্যাপারটা হয়তো রাইমারদের জন্য বিচ্ছিন্ন একটা স্মৃতি হিসেবেই থাকতো। কিন্তু অনুষ্ঠানের শেষ দিকে প্রশ্নোত্তর পর্বে একজন দর্শক ডঃ মানিকে এমন একটি প্রশ্ন করে বসলো যা রাইমারদের বাধ্য করলো মনোযোগ দিতে। প্রশ্নটি ছিল অসম্পূর্ণ যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্ম

নেয়া শিশুদের সম্ভাব্য চিকিৎসার ব্যাপারে। জবাবে মানি বললেন, জনস হপকিন্স ক্লিনিকে সার্জারি এবং হরমোন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে এধরনের শিশুদের নারী বা পুরুষে পরিণত করা সম্ভব। ডঃ মানি বলছিলেন – কোন শিশু নারী বা পুরুষ হিসেবে জন্ম নিলো কি না, সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না। শৈশবে শিশুদের লিঙ্গ পরিবর্তন করা সম্ভব। কোন ঝামেলা ছাড়াই ছেলে শিশুকে মেয়ে আর মেয়ে শিশুকে ছেলে হিসেবে বড় করা সম্ভব।

রাইমাররা ঠিক করলো ওরা ভুল শুধরে নেয়ার চেষ্টা করবে। অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্র ডঃ মানিকে চিঠি লিখতে বসলো জ্যানেট। কয়েক মাস পর ওরা হাজির হল বাল্টিমোরে, ড. জন মানির অফিসে।

ব্রেন্ডা

ব্রুসের কেইস হিস্ট্রি শোনা আর ফিযিকাল চেকআপের পর জন মানি পরামর্শ দিলেন ব্রুসকে মেয়ে হিসেবে বড় করার। খুব সহজ সুরে পুরো প্রক্রিয়াটা ব্যাখ্যা করে গেলেন মানি। প্রথমে castration এর মাধ্যমে ব্রুসের শরীর থেকে বাদ দেয়া হবে যৌনাঙ্গের বাকি অংশ। হরমোন ট্রিটমেন্ট দিতে হবে কৈশোরের শুরুতে। আর ট্রিটমেন্টের শেষ পর্যায়ে সার্জারি মাধ্যমে ওর শরীরে স্থাপন করা হবে কৃত্রিম যোনি। ও কখনো মা- হতে পারবে না, কিন্তু একজন সাধারণ নারীর মতো যৌন জীবন পাবে। একজন অসম্পূর্ণ পুরুষের বদলে ও হতে পারবে একজন পরিপূর্ণ নারী। ডঃ মানি রাইমারদের অভয় দিলেন, প্রথমবার শোনায় যতোটা গুরুতর মনে হয় আসলে ব্যাপারটা তেমন কিছুই না। একজন মানুষ পুরুষ নাকি নারী এটা পাথরে লেখা কিছু না। জন্মসূত্রে একজন মানুষ নারী বা পুরুষ হয়ে জন্মায় না। বরং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে একজন মানুষ বেড়ে ওঠে 'পুরুষ' অথবা 'নারী' হিসেবে। প্রকৃতি না, একজন মানুষকে 'পুরুষ' অথবা 'নারী' বানায় পরিবেশ। কাজেই, কে কোন ধরণের শরীর নিয়ে জন্মাচ্ছেন তার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল মানসিকভাবে কোন লৈঙ্গিক পরিচয় (Gender Identity/Gender Role) সে গ্রহণ করছে। জন্মের প্রথম দুই বছর একজন মানুষের লৈঙ্গিক পরিচয় ফ্লুয়িড বা পরিবর্তনশীল থাকে। এসময়টাতে মধ্যে একজন মানুষকে ঠিক কীভাবে বড় করা হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করবে সে নিজেকে নারী হিসেবে চিনবে নাকি পুরুষ হিসেবে। একই কথা খাটে যৌনতার ক্ষেত্রেও। কে নারীর প্রতি আর কে পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, এটা ঠিক করে দেয় পারিপার্শ্বিকতা আর পরিবেশ। প্রকৃতি না। তাই ব্রুসকে মেয়ে হিসেবে বড় করা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। শুধু এটুকু নিশ্চিত করতে হবে, ব্রুস যেন সবসময় নিজেকে একজন মেয়ে হিসেবে চিন্তা করে।

ডঃ মানির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তীব্র আত্মবিশ্বাস আর ক্যারিযমার প্রভাব তো ছিলই, সাথে আরো ছিল জনস হপকিন্স আর স্টেইট অফ দি আর্ট ট্রিটমেন্টের নিশ্চয়তা। বিশ্ববিখ্যাত গবেষক ব্যক্তিগতভাবে ব্রুসের কেইস হ্যান্ডেল করছেন, ব্রুস নিশ্চয়তা পাচ্ছে সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসার। উইনিপেগের ছোট্ট গ্রাম থেকে উঠে আসা রনাল্ড আর জ্যানেটের কোন কারণ ছিল না মানির কথা না শোনার। রাইমার দম্পতি যে ব্যাপারটা জানতো না তা হল, যা কিছু জন মানি তাদের বলেছিল তার পুরোটুকুই ছিল অনুমান। অপ্রমাণিত। ডঃ মানি হিজড়াদের উপর করা কিছু অপারেশানের ভিত্তিতে উপসংহার টানছিলেন যে স্বাভাবিক অবস্থায় জন্ম নেয়া একজন ছেলে শিশুকে কোন জটিলতা ছাড়াই মেয়ে হিসেবে বড় করা সম্ভব। এ উপসংহারের মূল ভিত্তি ছিল তার এই বিশ্বাস যে, লৈঙ্গিক পরিচয় ও যৌনতা দুটোই নির্ভর করে পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের ওপর। এগুলো প্রাকৃতিক ভাবে নির্ধারিত, অপরিবর্তনীয় কোন বিষয় না। এটা কেবল হিজড়াদের জন্য না, বরং সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দীর্ঘদিন ধরে এ মত প্রচার করলেও বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণের কোন সুযোগ মানি পাচ্ছিলেন না। কারণ কোন বাবা-মাই সুস্থ-স্বাভাবিক সন্তানের ওপর এধরনের পরীক্ষা করার অনুমতি দেবে না। ব্রুস ছিল তাই জন মানির হাইপোথিসিস প্রমাণের পারফেক্ট টেস্ট সাবজেক্ট। দু বছরের কম বয়স। স্বাভাবিক ছেলে সন্তান, দুর্ঘটনার কারণে যার যৌনাঙ্গ নষ্ট হয়ে গেছে। এবং ব্রুসের ছিল একজন আইডেন্টিকাল টুইন। অর্থাৎ বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে টেস্ট সাবজেক্ট ব্রুসকে, স্বাভাবিক ব্রায়ানের সাথে তুলনা করার সুযোগ ছিল। অন্যদিকে জন মানির দেয়া ট্রিটমেন্ট ছিল বিপর্যস্ত রাইমার দম্পতির খড়কুটো ধরে বাচার চেষ্টা। নিজ থিওরি প্রমাণে মরিয়া জন মানির জন্য ব্রুস ছিল কল্পনার সোনার হরিণ।

সোমবার, ৩ জুলাই, ১৯৬৭। বাল্টিমোরের জনস হপকিন্স হসপিটালে বাইল্যাটারাল অর্কিডেকটমির মাধ্যমে বাইশ মাস বয়েসী ব্রুসের শরীর থেকে অণ্ডকোষ অপসারণ করা হল। ঠিক হল নিয়মিত চিঠির মাধ্যমে ডঃ মানিকে ব্রুসের ব্যাপারে আপডেট জানাবে জ্যানেট। আর চেকআপের জন্য বছরে একবার ব্রুসকে নিয়ে যাওয়া হবে বাল্টিমোরে। মানি বারবার রাইমারদের বলে গেলেন, ব্রুস যেন নিজেকে মেয়ে মনে করেই বেড়ে ওঠে, এখন এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওর জীবনের প্রথম বাইশ মাসের ব্যাপারে দুই যমজকে কিছু না জানানোই ভালো হব। আর হ্যাঁ, ওর একটা নতুন নামের প্রয়োজন হবে। বাড়ি ফিরে জ্যানেট আর রনাল্ড দ্বিতীয়বারের মতো তাদের সন্তানের নামকরণ করলো। ব্রুস পরিণত হল ব্রেন্ডায়।

ব্রেন্ডার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন থেকে ডঃ মানি তার বক্তব্য, গবেষণা ও বইতে চাঞ্চল্যকর এ কেইসের কথা প্রকাশ করা শুরু করলেন। তবে সংগত কারণেই প্রকাশ

করলেন না রাইমারদের পরিচয়। প্রায় রাতারাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো ব্রুস/ ব্রেন্ডার কেইসের খবর। জন মানি প্রচার করা শুরু করলেন – নারী বা পুরুষ হওয়া মানুষের সত্ত্বাগত কোন বৈশিষ্ট্য না। পরিবেশ, প্রেক্ষাপটের দ্বারা একজন মানুষ নারী বা পুরুষ হতে শেখে। আর এর অকাট্য প্রমাণ হল দুই যমজ ভাইয়ের মধ্যে একজন ছেলে হিসেবে আর অন্যজন সুস্থ সবল মেয়ে হিসেবে বেড়ে উঠছে।

ব্রুস/ব্রেন্ডার কেইস ব্যাপকভাবে প্রচারিত হল। সাইকোলজি, সেক্সোলজি, জেন্ডার স্টাডি ইত্যাদি ডিসিপ্লিনের পাঠ্যবইয়ে যুক্ত করা হল এ কেইসের কথা। মানবিক যৌনতা, লিঙ্গ ও মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে পশ্চিমা চিন্তায় যেন নতুন এক দিগন্ত উন্মোচন করলো এ কেইস। ব্রুসের সফলভাবে ব্রেন্ডায় পরিণত হওয়া ছিল প্রকৃতি বনাম প্রশিক্ষণের (Nature vs Nurture) যুদ্ধে প্রশিক্ষণের বিজয়ের অবিসম্বাদিত প্রমাণ। এ উপসংহার বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মানির জন্য এটা ছিল শিশু যৌনতা এবং লিঙ্গ ও যৌনতার মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তার প্রিয় থিওরির প্রমাণ।

সমকামী এবং অন্যান্য বিকৃত যৌনাচারে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের জন্যেও এ কেইস এবং এর উপসংহার গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের কারণে যদি একজন ছেলে, মেয়েতে পরিণত হতে পারে, তাহলে একজন পুরুষ বা নারীর সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণকে কেন অস্বাভাবিক, বিকৃতি বা অসুস্থতা মনে করা হবে? খোদ নারী বা পুরুষ পরিচয়ই যদি পূর্ব-নির্ধারিত না হয়, অপরিবর্তনীয় না হয়, বরং অর্জিত (learned/ acquired) হয়, তাহলে কীভাবে যৌনতা পূর্ব নির্ধারিত হতে পারে?

অন্যদিকে ফেমিনিস্টদের জন্য এ কেইস গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করছিল নারী ও পুরুষের মধ্য মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। ছেলেরা যা পারে, মেয়েরাও তাই পারে। ছেলেরা যতোটুকু পারে ততোটুকুই পারে। তাই কিছু কাজে, যেমন ম্যাথম্যাটিকস বা শিল্পে (art), ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে দক্ষ – এ কথার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। পুরুষ ম্যাথম্যাটিশিয়ানদের সমান সংখ্যক নারী ম্যাথম্যাটিশিয়ান দেখা যায় না, কিংবা নারীদের মধ্যে কোন বেইতোভেন, মোৎযার্ট কিংবা মাইকেলেঞ্জেলোকে পাওয়া যায় না - এটা জাস্ট শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা পুরুষতন্ত্রের প্রভাব।

১৯৭৩ এর জানুয়ারি সংখ্যায় টাইম ম্যাগাযিন মন্তব্য করে – "চাঞ্চল্যকর এই কেইস নারীবাদীদের বক্তব্যের পক্ষে জোরালো সমর্থন দেয়।"

ডেইভিড

কিন্তু মিডিয়ার রঙ্গিন আর অ্যাকাডেমিকদের আলঙ্কারিক তত্ত্বের জগত থেকে দূরে

উইনিপেগের ছবিটা ছিল অন্যরকম। একবারে শুরু থেকেই রাইমাররা বুঝতে পারছিল কোন একটা জায়গায় হিসেবে মিলছে না। কোথাও কোন একটা সমস্যা রয়ে যাচ্ছে। তবে দু'জনের কেউই সেটা স্বীকার করতে চাচ্ছিলো না। একেবারে ছোটবেলা থেকেই মেয়েলিপনার কোন ছাপ ছিল না 'ব্রেন্ডা'র আচরণে। ওর পছন্দের কাজের লিস্টে ছিল দৌড়ানো, ব্রায়ানের গাড়ি নিয়ে খেলা আর ছেলেদের সাথে পুরো দমে মারপিট করা। পুতুল খেলা ছিল দু চোখের বিষ। স্কুলে ও ছিল একা। রাগী, একগুঁয়ে। মেয়েদের সাথে খেলতে চাইতো না। ছেলেরা ওকে খেলায় নিতো না। বাসাতেও খেলার সময় নেতৃত্ব দিতো ও। ব্রায়ান ওর অনুসরণ করতো। হাটা, চলা, কথা সবকিছুতে ব্রুসকে দেখা যেতো। ব্রেন্ডাকে না।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে সমস্যাগুলো বাড়লো। বাড়তে থাকলো সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, রাগ, কষ্ট। ও বুঝতে পারছিল ও অপরিচিত, অদ্ভুত। ও খাপ খায় না। এসবের প্রভাব পড়ছিল ওর পড়াশোনায়। প্রথমে গোপন রাখতে চাইলেও স্কুলে ক্রমাগত খারাপ রেযাল্টের পর টিচারদের নানা ধরণের প্রশ্নের জবাবে রাইমাররা ওর অতীত সম্পর্কে জানাতে বাধ্য হয়। স্কুল থেকেই ওর জন্য ঠিক করে দেয়া হয় সাইকলোজিস্ট। কিন্তু একের পর এক সাইকলোজিস্ট এ সিদ্ধান্তেই পৌছাতে বাধ্য হন - যদিও ব্রুস হওয়ার কোন স্মৃতি ওর নেই তবুও কোন এক কারণে 'ব্রেন্ডা' তার রূপান্তরকে মেনে নিচ্ছে না। জ্যানেট তার নিয়মিত চিঠিতে মানিকে ব্যাপারগুলো জানান। কিন্তু প্রতিবরই ডঃ মানি বিষয়টিকে উড়িয়ে দিল "টমবয়ের স্বাভাবিক দস্যিপনা" বলে।

তবে এক পর্যায়ে ডঃ মানিও বাধ্য হল ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিতে। কারণ ক্রমেই এগিয়ে আসছিলো তার পূর্নাঙ্গ থিওরি প্রমাণ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। মানির থিওরি অনুযায়ী ব্রেন্ডার রূপান্তরকে সম্পূর্ণ করতে কৈশোরের আগেই সার্জারি মাধ্যমে ওর শরীরে যোনি স্থাপন করা আবশ্যিক। এটা হল রূপান্তরের ফাইনাল স্টেপ। কিন্তু ব্রেন্ডাকে কোন ভাবেই সার্জারির জন্য রাজি করানো যাচ্ছিলো না। সার্জারি কথা শুনতেই ও রাজি না। ডঃ মানি বিভিন্ন ভাবে ব্রেন্ডাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। নিজ অফিসের নির্জন রুমে তিনি ব্রেন্ডাকে ছবি দেখালেন। নারী ও পুরুষের নগ্ন ছবি। যৌনাঙ্গের ছবি। মিলনের ছবি। প্রসবের ছবি।

মানির যুক্তি ছিল, নারীত্ব ও যোনির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ব্রেন্ডাকে মানব যৌনতা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার দরকার ছিল। মানি বিশ্বাস করতেন জন্ম থেকেই মানবশিশুর মধ্য যৌনতার অনুভূতি থাকে, তাই তার মতে এতে বিপদের কোন আশঙ্কা ছিল না। জ্যানেট এবং রনাল্ডকে, ডঃ মানি পরামর্শ দেন বাসায় বাচ্চাদের সামনে, বিশেষ করে

ব্রেন্ডার সামনে, সঙ্গম করার। এতে করে যৌনতা সম্পর্কে ওদের ধারণা আরো পরিষ্কার হবে। ওরা অস্বীকৃতি জানালে, মানি পরামর্শ দেন জ্যানেট যেন কমসেকম গৃহস্থালির কাজ করার সময় নগ্ন থাকে। যাতে করে নারী পুরুষের পার্থক্য এবং নিজের নারীত্ব সম্পর্কে ব্রেন্ডার বিশ্বাস আরো গাঢ় হবে।[৮৭] বিশ্ববিখ্যাত ডঃ-এর এই প্রেসক্রিপশান রাইমাররা মেনে চলার চেষ্টা করে। পুরো ব্যাপারটা ব্রেন্ডাকে আরো বিভ্রান্ত, আরো দিশেহারা করে তোলে। তখন ব্রেন্ডার বয়স ছিল ৭।

ব্রেন্ডার "ট্রিটমেন্ট" চলতে থাকে। কিন্তু সময়ের সাথে সবার কাছে পরিষ্কার হতে থাকে ও আর দশটা মেয়ের মতো না। আসলে ব্রেন্ডার কোন কিছুই মেয়ের মতো না। ব্রেন্ডার বয়স বারো হলে ডঃ মানির পরামর্শে ওকে হরমোন ট্যাবলেট খেতে বাধ্য করা হয়। বন্ধুহীন, নিরাপত্তাহীন নিষ্ঠুর এক পরিবেশে বড় হতে থাকে ব্রেন্ডা। নিজের মেয়েলি পোশাক, নিজের অস্বাভাবিকতা, ভাঙ্গতে থাকা কণ্ঠস্বর, নিজের শারীরিক অসম্পূর্ণতা, সার্জারির জন্য বাবা-মার চাপাচাপি, একের পর একে সাইকলোজিস্টের সাথে সেশন, বাল্টিমোরের নির্জন রুমের অন্ধকার স্মৃতি, নিজের একাকীত্ব, সার্জারির ভয় – সব কিছু মিলিয়ে ক্রমেই গভীর হতে থাকা রাগ আর হতাশার এক ঘূর্ণিপাকে নিজেকে আবিষ্কার করে ব্রেন্ডা। ওর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত লোকাল সাইকলোজিস্টের পরামর্শে, ডঃ জন মানির অমতে রনাল্ড আর জ্যানেট সিদ্ধান্ত নেয় ব্রেন্ডাকে ওর অতীত সম্পর্কে জানাবার।

১৯৮০-র মার্চের এক পড়ন্ত দুপুরে সাইকলোজিস্টের সাথে সাপ্তাহিক সেশনের পর ব্রেন্ডাকে সব কিছু খুলে বলে রনাল্ড। গাল বেয়ে পড়া পানি আর হাতের গলতে থাকে কোন আইসক্রিমের ফোটা জমতে থাকে ওর কোলে। নিজের ভেতর মুক্তির স্বাদ অনুভব করে ও। বোধশক্তি হবার পর থেকে বিভ্রান্তি আর দুর্বোধ্য, অজানা বাস্তবতার যে বোঝা ওর ওপর চেপে ছিল, মনে হল শেষ পর্যন্ত তা তুলে নেয়া হয়েছে। রনের কথা শেষ হবার প্রায় সাথে সাথেই ব্রুস ওর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল। ও একজন ছেলে আর ও ছেলে হিসেবেই জীবন কাটাবে। অতীতের সব চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টায় ও নিজের জন্য বেছে নেয় নতুন নাম।

ডেইভিড।

বাইবেলের সেই ছেলেটার মতো যে বিশাল দানবকে যুদ্ধ হারিয়েছিল। ডেইভিড

---

[৮৭] In Sexual Signatures, Money emphasized the importance of such parental genital displays for correct heterosexual child development, and even went so far as to recommend that parents engage in sexual intercourse in front of their children. "With a little calm guidance," he wrote, "the experience can be integrated into the child's sex education and serve to reinforce his or her own gender identity/role

রাইমার।

ছোটকালে হওয়া দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ হিসেবে হসপিটাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিছু টাকা পেয়েছিল রাইমাররা। এ টাকা সার্জারির জন্য খরচের সিদ্ধান্ত নেয় ডেইভিড। তবে জন মানির প্রস্তাবিত সার্জারি না। বরং তার উল্টোটা। ডেইভিডের ডান কবজি থেকে মাংস, নার্ভ আর্টারি আর বাম পাজড় থেকে কার্টিলেজ নিয়ে ওর শরীরে একটি কৃত্রিম লিঙ্গ স্থাপন করার চেষ্টা করা হবে এই ফ্যালোপ্ল্যাস্টি সার্জারিতে। বারো ধাপের এ সার্জারি শেষ করতে তিন জন সার্জেনের সময় লাগে ১৩ ঘণ্টা। সার্জারি সফল হয়। ১৯৯০ এর সেপ্টেম্বরের ২২ তারিখ ডেইভিড রাইমার বিয়ে করে জেইন ফন্টেইনকে বিয়ে করে।

গল্পটা এখানে শেষ হলে ভালো হতো।

ডেইভিড সুখে-শান্তিতে তার বাকি জীবন কাঁটিয়ে দিল। ক্ষতবিক্ষত, ভ্রমণ ক্লান্ত, কিন্তু সন্তুষ্ট একজন মানুষ হিসেবে – এমন উপসংহার হয়তো সবার জন্যই ভালো হত। কিন্তু বাল্টিমোরে জন মানির সাথে নির্জন সেশনগুলোতে এমন কিছু হয়েছিল যার বীজ নিজেদের ভেতরে বয়ে বেড়াচ্ছিল ও আর ব্রায়ান। এমন এক অন্ধকারে উঁকি দিতে ওরা বাধ্য হয়েছিল, শত চেষ্টার পরও যার কবল থেকে ওরা মুক্ত হতে পারেনি।

ব্রায়ান

খুব কম বয়সে ব্রায়ান মদ ধরে। সপ্তাহান্তে ফুর্তির জন্য মদ খাওয়া না। দুনিয়ার উপর জেদ নিয়ে, নিজের সাথে নিজে পাল্লা দিয়ে মদ খাওয়া। দিনের পর দিন কেটে যেত, কিন্তু কখনো ও 'মাতাল না' এমন পাওয়া যেতো না। ওর মাথার ভেতর, ওর মনে ভেতর কিছু একটা ওকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিলো। ডেইভিডকে নিয়ে সবসময় অনুতপ্ত, আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রণ আর জ্যানেটের হয়তো ব্যাপারটা খেয়াল করার মতো অবস্থা ছিল না। কিন্তু ডেইভিডের অতীতের ব্যাপারে সত্যটা দু ভাইকে জানানোর পর সমস্যাটা সামনে আসতে শুরু করে। পুরো ঘটনায় সবার মনোযোগ ছিল ডেইভিডের উপর। সংগত কারণেই। ব্রায়ান ব্যাপারটা কীভাব হ্যান্ডেল করছে সেই দিকে মনোযোগ দেয়ার তেমন সুযোগ ছিল না। তাই কিছুদিন পর যখন ব্রায়ানের নার্ভাস ব্রেক ডাউনের মতো হল, তখন সেটা ছিল অপ্রত্যাশিত। দীর্ঘদিন ধরে একের পর এক দুর্ঘটনা আর বিপর্যয়ের মোকাবেলা করতে করতে অনেকটাই অবশ হয় আসা রাইমার পরিবার ঘটনাকে দেখলো তাদের লম্বা দুর্ভাগ্যের লিস্টের আরেকটি দুর্ভাগ্য হিসেবে। কিন্তু সমস্যা বাড়তে থাকলো। ব্রায়ানের মানসিক সমস্যাকে রাইমাররা সিরিয়াসলি নিতে বাধ্য হয় যখন ডেইভিডের সার্জারির দু সপ্তাহ আগে প্রথমবারের মতো আত্মহত্যার

চেষ্টা করে ব্রায়ান। কদিন পরই ছিল দু'জনের ষোলতম জন্মদিন।

কিছুদিন পর ব্রায়ান পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়। চাকরি নেয় এক পেট্রোল পাম্পে। বাসা থেকে বের হয়ে আলাদা থাকা শুরু করে গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে। প্রথমবার বিয়ে করে ১৯ বছর বয়সে। কিন্তু দু সন্তানের জন্মের পরও বিয়েটা টেকে না। ডিভোর্স হয়ে যায় কয়েক বছরের মধ্যে। নেশাতুর কয়েক বছর কাটাবার পর আবারো বিয়ে করে ব্রায়ান। কিন্তু আবারো একই পরিণতি।

ভেতরের অস্থিরতা ওর জীবনকেও অস্থির করে তুলছিল। কিছু একটাকে ভুলে থাকতে, চাপা দিতে চাইছিল ও। নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে বেড়ানোর চেষ্টায় মদ আর ঘুমের ওষুধের নেশার গাড়, অবশ অনুভূতির চাদরে মনকে, চিন্তাকে ঢেকে রাখছিল ও। রন আর জ্যানেট বুঝতে পারছিল না, ঠিক কোন জিনিসটা থেকে ব্রায়ান পালাতে চাইছিল। ওদের বোঝার উপায়ও ছিল না। পৃথিবীতে কেবল একজনই জানতো জাগ্রত মুহূর্তগুলোতে কোন স্মৃতি থেকে ব্রায়ান পালিয়ে বেড়াতো, আর অচেতন অবস্থায় কোন স্মৃতি দুঃস্বপ্ন হয়ে ওর সামনে হাজির হতো। কিন্তু ডেইভিড সংকল্প করেছিল সেই স্মৃতিগুলো ভুলে থাকার।

ডেইভিড আর ব্রায়ানের শৈশব কোন অর্থেই সহজ ছিল না। খুব অল্প বয়স থেকেই ডেইভিডকে মুখোমুখি হতে হয়েছে তীব্র কষ্ট, হতাশা, প্রতিকূলতা আর ভয়ের। একই মাত্রায় না হলেও একই কথা খাটে ব্রায়ানের ক্ষেত্রেও। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে ডেইভিড এবং ব্রায়ানের সবচেয়ে অপছন্দের, সবচেয়ে ভয়ের স্মৃতি ছিল বাল্টিমোরের দিনগুলো। ডঃ মানির অফিসে কাটানো নির্জন সময়গুলো দু ভাইয়ের মনে কী গভীর ক্ষত তৈরি করেছিল তার একটা ধারণা পাওয়া যায় ডেইভিডের এক দুর্লভ স্বীকোরোক্তি থেকে। ডেইভিড আর জেইন ডকুমেন্টারি দেখছিল। ডকুমেন্টারিটা ছিল সিআইএ- এর টর্চার নিয়ে। একটা সিনে দেখানো হচ্ছিল কীভাবে বন্দীদের যৌনাঙ্গে ইলেকট্রিক শক দিয়ে অত্যাচার চালানো হয়। হঠাৎ জেইন আবিষ্কার করলো ডেইভিড চিৎকার করে কাঁদছে। প্রলাপ বকছে। ভিডিওর দৃশ্য ওকে মনে করিয়ে দিয়েছিল ভয়ঙ্কর কোন স্মৃতির কথা। কান্নার দমকে এলোমেলো হয়ে যাওয়া কথাগুলো বুঝতে না পারলেও সেদিন জেইন একটা নাম চিনতে পেরেছিল...জন মানি।

জন মানি

রাইমাররা বছরে একবার বাল্টিমোরে যেতো, রেগুলার চেকআপের অংশ হিসেবে। প্রথমে ওরা চারজন ডঃ মানির অফিসে বসতো। রন আর জ্যানেটের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার পর ব্রায়ান আর ব্রুসকে আলাদা রুমে নিয়ে যেতেন ডঃ মানি। প্রাইভেট

সেশনের জন্য। একজন নারী হিসেবে স্বাভাবিক "বিকাশের" জন্য ব্রুস/ব্রেন্ডাকে নগ্নতা ও যৌনতার মুখোমুখি দাড় করিয়ে দেয়া, ডঃ মানির মতে অপরিহার্য ছিল। "স্বাভাবিক বিকাশের" অংশ হিসেবে তিনি ব্রুস আর ব্রায়ানকে পর্ণোগ্রাফি আর নগ্ন ছবি দেখান। যখন ওদের বয়স ৭, এক সেশনে ডঃ মানি ওদের দু জনকে নির্দেশ দেন কাপড় খুলে নগ্ন হবার। ৭ বছরের নগ্ন ব্রুসকে জন মানি বাধ্য করে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে মেঝেতে চার হাত-পায়ে ভর দিতে। তারপর মানি নগ্ন ব্রায়ানকে বলেন ব্রুসের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে। আবার কোন কোন সেশনে মানি ব্রুসকে বলেন দু পা ছড়িয়ে করে চিত হয়ে শুতে। আর তারপর ব্রায়ানকে বাধ্য করেন ব্রুসের উপড়ে উঠতে। ছোট্ট এ যমজ শিশু দুটিকে সেক্সুয়াল রোল-প্লে তে বাধ্য করে জন মানি।[৮৮] এ অবস্থায় ওদের ছবি তোলেন জন মানি। তিনি ওদের এমন এক দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য করেন যা ওদেরকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয় সারা জীবনের জন্য। অন্য সব কিছুকে ছাপিয়ে দুই যমজের উপর সবচেয়ে গভীর প্রভাব ফেলে এই "থেরাপি" সেশনগুলো। জীবনভর শত চেষ্টার পরও এ ভয়ঙ্কর স্মৃতি মুছে ফেলতে ব্যর্থ হয় ওরা। শেষ পর্যন্ত ডেইভিডের অতীত সম্পর্কে সত্য জানার পর অন্য সব কিছু পেছনে ফেলে আসতে পারলেও এই বিকৃত যৌন নির্যাতনকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা দু ভাইয়ের জন্য সম্ভব ছিল না।

চিন্তা করুন তো, ১৩ বছর বয়সে ব্রায়ান যখন বুঝতে পারলো ওর বোন আসলে ওর ভাই, এবং জন মানি ওদেরকে দিয়ে যা করিয়েছিলেন তা অজাচার এবং সমকামের অনুকরণ – তখন পুরো ব্যাপারটা ওর মনের উপর ঠিক কী রকম প্রভাব ফেলেছিল? এ ধরণের স্মৃতি একজন মানুষকে দুমড়ে মুচড়ে, ভেঙ্গে চুড়ে দিতে বাধ্য।

ব্রায়ান চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এ স্মৃতি, এ অন্ধকারের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ও ব্যর্থ হয়। তীব্র হতে থাকে ওর ডিপ্রেশন, মুড সুইংস, মদ আর ঘুমের ওষুধের নেশা। ২০০২ এর বসন্তে ৩৬ বছর বয়সে আত্মহত্যা করে ব্রায়ান রাইমার। ব্রায়ানের মৃত্যু গভীর প্রভাব ফেলে ডেইভিডের উপর। বিভিন্ন কারণে ওর আর্থিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। ডিপ্রেশনের চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে শুরু করে ডেইভিড নিজেও। ব্রায়ানের মৃত্যুর প্রায় দু' বছর পর, মে-র এক দুপুরে জেইন ওকে জানায় কিছু দিনের জন্য ও আলাদা থাকতে চাচ্ছে। যদিও জেইন আশ্বস্ত করে বলে ও ডিভোর্সের কথা ভাবছে না। কিন্তু ডেইভিড সবচেয়ে খারাপ পরিণতিকেই অবধারিত বলে ধরে

---

[৮৮] Money made Bruce assume the passive position and then ordered Brian to go behind him and mimic a thrusting motion. He repeated the same thing when he instructed Bruce to lay with legs spread and then ordered Brian to mount him. He forced them into sexual role play. Can't find the words to describe the ordeal in Bengali.

নেয়। ও নিজেকে ব্যর্থ মনে করছিল। স্বামী হিসেবে, পুরুষ হিসেবে। সেদিন রাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় ডেইভিড। অঘটনের আশংকায় থানায় রিপোর্ট করে জেইন। পরদিন পুলিশ জানায় ডেইভিড সুস্থ আছে, বেঁচে আছে। তবে কোথায় আছে সেটা ও জেইনকে জানাতে চায় না। বিপদ এড়ানো গেছে ভেবে জেইন সেদিনকার মতো অফিসে যায়। ও বেড়িয়ে যাবার পর বাসায় আসে ডেইভিড। খুঁজে বের করে গ্যারেজে নিয়ে ধীর স্থির ভাবে চেছে নেয় ওর শটগানের ব্যারেল। তারপর বেড়িয়ে যায় গাড়ি নিয়ে।

২০০৪ সালের ৪ই মে ওর বাসার কাছে এক সুপারস্টোরের পার্কিং লটে পাওয়া যায় ডেইভিডের বিস্ফোরিত খুলির মৃতদেহ। ওর বয়স ছিল ৩৮ বছর।[৮৯]

জন মানি মারা যান ২০০৬ সালে, ৮৫ বছর বয়সে, পার্কিন্সন্সে ভুগে। বিশ্বখ্যাত, নন্দিত অ্যাকাডেমিক, মনস্তত্ত্ব ও যৌনতার গবেষণায় নব দিগন্তের সূচনাকারী পথিকৃৎ হিসেবে। মানির অনেক থিওরি মানবিক যৌনতা সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তকগুলোতে গৃহীত হয় প্রমাণিত সত্য হিসেবে। Gender Role, Gender Identity এবং Gender Fluidity –এর মতো হাল আমলে জনপ্রিয়তা পাওয়া অনেক ধারণা ও পরিভাষা সরাসরি ডঃ মানির কাছ থেকে নেয়া। ডেইভিড রাইমারের জীবনের প্রথম দিকে ডঃ মানি ব্যাপকভাবে কেইসটিকে প্রচার করেন তার থিওরির অকাট্য প্রমাণ হিসেবে। ডেইভিডের কেইসকে সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেন মানি। এ কেইসকে মডেল হিসেবে নিয়ে এরকম আরো অনেক সার্জারি ও "ট্রিটমেন্ট" করা হয় জনস হপকিন্সে।

পুরো ব্যাপারটা যে রাইমার পরিবারের জন্য এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন ছিল, তা বোঝার জো ছিল না মানির লেখা থেকে। মানি এক সুখী পরিবারের ছবি একেছিলেন যেখানে হাসিখুশি বাবা-মা পরম যত্নে তাদের দুই সুস্থ-স্বাভাবিক সন্তানকে বড় করছে। আর লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি মধ্যে দিয়ে যাওয়া শিশুটি সবদিক দিয়ে একজন স্বাভাবিক মেয়ে হিসেবে বেড়ে উঠছে।[৯০] অথচ বাস্তবতা ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। ১৩ বছর বয়সে ডেইভিড যখন সিদ্ধান্ত নেয় একজন পুরুষ হিসেবে জীবন কাটাবার, তখন সেটা জানানো হয় ডঃ মানিকেও। কিন্তু তার প্রকাশিত বই, জার্নাল, আর্টিকেল, বক্তব্য – সব জায়গাতেই এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি উল্লেখ করতে ভুলে যান মানি। তবে ডেইভিডের কেইস সম্পর্কে কথা বলা কমিয়ে দেন। শেষমেশ ১৯৯৭-এ যখন ডেইভিডের কেইসের আসল অবস্থা জানাজানি হয়ে যায়, মানি তখন তার এক্সপেরিমেন্টের ব্যর্থতার জন্য

---

[৮৯] Sex reassignment at birth. Long-term review and clinical implications. Diamond, M. & Sigmundson, H. K. (1997) John Colapinto wrote "As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl http://www.bbc.co.uk/sn/tvradio/programmes/horizon/dr_money_prog_summary.shtml

[৯০] http://www.nytimes.com/1975/05/04/archives/nature-and-nurture-and-gender-sexual-signatures.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FBook+Reviews

দায়ী করেন মিডিয়া হট্টগোলকে। কখনো রক্ষণশীল মিডিয়ার ষড়যন্ত্রের কথা বলেন আবার কখনো প্রশ্ন তোলেন অভিভাবক হিসেবে রন আর জ্যানেটের যোগ্যতা নিয়ে। অথচ এর নিজের মেডিকাল নোটসে দু'জনের ভূয়সী প্রশংসা করেছিল মানি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ডেইভিড রাইমারের জীবন ও মৃত্যুর নিয়ে বিন্দুমাত্র অনুতাপ দেখা যায় নি জন মানির ভেতরে।

মানি স্বীকার না করলেও রাইমার যমজের দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবন আর আত্মহত্যার পেছনে তার এক্সপেরিমেন্ট এবং থেরাপি সেশনগুলোর ভূমিকা কোন সুস্থ, সুবিবেচক মানুষ অস্বীকার করতে পারার কথা না। ক্রমাগত তীব্র যৌনতার উপস্থাপন, যৌন সঙ্গম অনুকরণে বাধ্য করা, ছবি তোলা, ক্রমাগত যৌনাঙ্গ এবং যৌন পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা, সর্বোপরি একজন ছেলেকে জোর করে মেয়েতে পরিণত করার চেষ্টা – এ বিষয়গুলো খুব সহজে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যেকোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওপরই এধরনের ঘটনার তীব্র ও গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। আর ডেইভিড আর ব্রায়ানের সাথে এ ঘটনাগুলো ঘটেছিল শৈশব থেকে।

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, একজন বিখ্যাত, সম্মানিত সাইকলোজিস্ট কেন শিশুদের এধরনের আচরণে বাধ্য করবেন? কোন মেডিকাল ডিগ্রিহীন একজন সাইকলোজিস্ট কীভাবে একের পর এক রোগীকে এতো বড় মাপের একটা সার্জারি করার পরামর্শ দিয়ে যেতে পারেন, প্রশ্ন জাগতে পারে সেটা নিয়েও। কিন্তু যৌনতা, বিশেষ করে শিশু যৌনতা সম্পর্কে ডঃ মানির দর্শন সম্পর্কে জানার পর ব্যাপারটা অসুস্থ-বিকৃত মনে হলেও, আর অস্বাভাবিক মনে হয় না। দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে তার বিভিন্ন বই, জার্নাল পেপার ও বক্তব্যে বার বার জন মানি ব্যাখ্যা করেছেন কেন শৈশবেই শিশুদের যৌনতার শিক্ষা দেয়া 'উচিৎ'। টাইম ম্যাগাযিনের এপ্রিল, ১৯৮০ সংখ্যা মানি বলেন –

> *শৈশবের যৌন অভিজ্ঞতা - যেমন তুলমামূলক ভাবে বয়স্ক কোন ব্যক্তির সাথে যৌন মিলন – শিশুর জন্য নেতিবাচকই হবে এমন কোন কথা নেই।* [৯১]

যদি কোন কোন পাঠক মানির উপরের কথার মধ্যে পেডোফিলিয়া বা শিশুকামিতার গন্ধ পেয়ে থাকেন তাহলে ডাচ পেডোফিলিয়া ম্যাগাযিন "পাইডিকা"-তে ১৯৯১ এর সাক্ষাতকারে বলা জন মানির নিচের কথাগুলো হয়তো অস্পষ্ট ছবিকে আরেকটু পরিষ্কার করবে –

---

[৯১] "A childhood sexual experience, such as being the partner of a relative or of an older person, need not necessarily affect the child adversely." [ATTACKING THE LAST TABOO (Time Magazine, April 14, 1980.)]

"ধরুন আমি যদি দেখি ১০ বা ১১ বছর বয়সের একটি ছেলে বিশের বা ত্রিশের কোঠার কোন পুরুষের প্রতি তীব্র শারীরিক আকর্ষণ বোধ করছে, যদি তাদের সম্পর্ক পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হয়, তাদের বন্ধন যদি পারস্পরিক হয়, তাহলে আমার মতে এধরনের সম্পর্ককে কোন ভাবেই বিকারগ্রসথ বা অসুস্থ (pathological) বলা যায় না।" [১২]

পেডোফিলিয়া বা শিশুকামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একই সাক্ষাৎকারে জন মানি বলেন –

"স্নেহময় শিশুকাম (affectional pedophilia) হল সহজ ভাষায় শিশুদের প্রতি স্নেহময় আকর্ষণ। অভিভাবক সুলভ ভালোবাসা ও বন্ধনের যৌন ভালোবাসা ও বন্ধনে পরিণত হওয়া। এই স্নেহময় সম্পর্ক, পুরুষ শিশুকামের ক্ষেত্রে পিতৃ সুলভ ভালোবাসার মতো। এতে কেবল পিতৃ সুলভ ভালোবাসার সাথে যৌন বা প্রেমময় বন্ধন যুক্ত হয়েছে। স্নেহময় ভালোবাসার সাথে প্রেম ও কামনা যুক্ত হয়েছে।" [১৩]

পাইডিকার এডিটোরিয়াল বোর্ডের সদস্য ডাচ প্রফেসর থিও স্যানফোর্টের -Boys & Their Contacts with Men: A Study of Sexually Expressed Friendships – নামের বইয়ের ভূমিকাও লেখেন জন মানি। বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল এগারো থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের ছেলেদের সাথে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের পায়ুকামের আনন্দঘন বর্ণনা। থিও স্যানফোর্টের দাবি বইয়ের প্রতিটি বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। জন মানি এ বইয়ের ভূমিকায় লেখেন –

"২০০০ সাল ও তার পরে জন্ম নেওয়া প্রজন্মের জন্য আমরা হব ইতিহাস। শিশু যৌনতা ও এর মূলনীতির ব্যাপারে আমাদের আত্মকেন্দ্রিক, নৈতিকতা নির্ভর অজ্ঞতা নিঃসন্দেহে পরবর্তী প্রজন্মকে বিস্মিত করবে...শিশুকামিতা ততোটুকই ঐচ্ছিক, বাঁহাতি হওয়া বা অন্ধ হওয়া যতোটুক ঐচ্ছিক...এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত ইতিবাচক বই।" [১৪]

Development of paraphilia in childhood and adolescence – নামক

---

[১২] If I were to see the case of a boy aged ten or eleven who's intensely erotically attracted toward a man in his twenties or thirties, if the relationship is totally mutual, and the bonding is genuinely totally mutual ... then I would not call it pathological in any way. [Interview: John Money. PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 1991, vol. 2, no. 3, p. 5.]

[১৩] Paedophilia is...affectional paedophilia in layman's terms...the straight forward affectional attraction to children...a paedophilic attraction to children...an overflow of parental pairbonding into erotic pair bonding... The affectional relationship, in male paedophilia at least, is a fatherly relationship...with erotic or lover-lover pairbonding...a combination of affectionate love as well as the lust factor...[until] puberty. [Interview: John Money. PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 1991, vol. 2, no. 3, p. 5.]

[১৪] "For those born and educated after the year 2000we will be their history, and they will be mystified by our self-important, moralistic ignorance of the principles of sexual and erotic development in childhood... Pedophilia and ephebophilia are no more a matter of voluntary choice than are left-handedness or color blindness...It is a very important book, and a very positive one." [Introduction - Boys & Their Contacts with Men] https://www.scribd.com/document/65967317/Boys-on-Their-Contacts-With-Men

প্রবন্ধে জন মানি বলেন –

> *"শিশুকাম স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া না, আর ইচ্ছে করলেই একজন শিশুকামি একে ছেড়ে আসতে পারে না। শিশুকামি যৌনতার ব্যাপারে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বা অনুরক্তি বা, বরং এটি যৌন-মনস্তাত্ত্বিক গঠন। একজন মানুষের শিশুকামি হওয়া বাঁহাতি বা কালার ব্লাইন্ড হবার মতো (অর্থাৎ বিষয়টি তার সিদ্ধান্ত এবং ইচ্ছার ঊর্ধ্বে)।"* [৯৫]

শিশুকাম ছাড়া অন্যান্য যৌন বিকৃতির ব্যাপারেও মানির অবস্থান কম বিস্ময়কর না। জন মানি তার পাবলিক লেকচার এবং ক্লাসগুলোতে ইচ্ছাকৃত এমন সব বিষয় উপস্থাপন করতেন যে কোন বিবেচনায় যা চরম মাত্রার অশ্লীল হিসেবে গণ্য হবে। উইনিপেগের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি বক্তা হয়ে এসে উপস্থিত দর্শক, সাংবাদিক, প্রফেসর ও ফার্স্ট ইয়ার মেডিকাল ছাত্রদের সামনে প্রথমদিন দেখান পশু কাম, মানব মূত্র পান, মানব বর্জ্য খাওয়া, অ্যাম্পুটেইশান ফেটিশসহ বিভিন্ন যৌন বিকৃতির ছবি ও ভিডিও। পরের দিন দেখান গ্রুপ সেক্সের ভিডিও। ভিডিও শেষে ঘোষণা করেন, বিয়ে হল নিছক একটি অর্থনৈতিক বোঝাপড়া যেখানে হৃদয় মানিব্যাগের অনুসরণ করে। আর অযাচারকে অপরাধ বিবেচনা করা অনুচিত।[৯৬]

আধুনিক সেক্সোলজির অন্যান্য আরো অনেক শব্দের মতো প্যারাফিলিয়া (Paraphilia) শব্দটিও উদ্ভাবন করেন ব্যক্তিগত জীবনে উভকামি জন মানি। বিকৃত যৌনাচারের ক্ষেত্রে এর আগে ব্যবহৃত শব্দটা ছিল "Perversion" বা "বিকৃতি"। কিন্তু জন মানি প্রচলন ঘটান 'প্যারাফিলিয়া'-এর। "বিকৃতি"- এর সাথে নেতিবাচকতা যুক্ত থাকে। শিশুকাম, অজাচার ও উভকামিতাসহ নানা বিকৃত যৌনাচারকে নেতিবাচকতার কবল থেকে মুক্ত করে কেবল "অপ্রচলিত" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন জন মানি। অন্যদিকে স্বাভাবিক যৌনাচারকে মানি সংজ্ঞায়িত করেন Normophilia হিসেবে। মানির ভাষায় Normophilia হল এমন সব ধরণের যৌনাচার, যা সমাজের বিদ্যমান মানদণ্ড অনুযায়ী স্বাভাবিক (Norm) হিসেবে গণ্য হয়। অর্থাৎ যৌনতা কেবল প্রচলিত আর অপ্রচলিত। প্রথাগত আর প্রথাবিরোধী। প্রাকৃতিক ভাবে যৌনতার মধ্যে কোন ভালো বা মন্দ নেই। নেই কোন সুস্থ আর বিকৃত যৌনতা। যৌনতার ব্যাপারে কেবল সমাজের ধারণা আছে।

এভাবে ভাষার অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে আসলে সব ধরণের যৌনাচারকে

---

[৯৫] Pedophilia is not voluntarily chosen, nor can it be shed by voluntary decision. It is not a preference but a sexuerotic orientation or status. It maybe viewed as analogous to left-handedness or color blindness. [John Money -Development of paraphilia in childhood and adolescence]

[৯৬] As Nature Made Him - John Colapinto

স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করেন জন মানি। যদি কোন সমাজে শিশুকাম গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে সেই সমাজের সেটাই প্রথা। এখানে নৈতিক বিচারে কোন জায়গা আর থাকে না। পুরো ব্যাপারটাই আপেক্ষিক। জন মানির জগতে কোন যৌনাচারই বিকৃত না। সব কিছুই স্বাভাবিক। তাই ৬/৭ বছরে বাচ্চাদের সমকামী যৌনতার অনুকরণে বাধ্য করা, যমজ দুই ভাইকে অজাচারের অনুকরণে বাধ্য করার সাথে "ঠিক বা ভুলের" কোন সম্পর্ক নেই।

ডেইভিড রাইমারের গল্পকে নিছক একজন ম্যাড সায়েন্টিস্টের পাগলাটে এক্সপেরিমেন্ট কিংবা একজন বিকৃতকামীর বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে উড়িয়ে দেওয়া সহজ। কিন্তু বাস্তবতা হল তার নিজ দর্শনের জায়গা থেকে ডঃ জন মানি নির্দোষ। মানির অপরাধ এবং রাইমারদের ট্র্যাজিক পরিণতি একটি নির্দিষ্ট দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল। যদি এথেকে আলাদা করে পুরো ব্যাপারটিকে একজন ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন বিকৃতি হিসেবে চিত্রিত করা হয় তাহলে মূল সমস্যা ঢাকা পড়ে যায়। বিকৃতকামী, বিকৃত চিন্তার জন মানি নিঃসন্দেহে জঘন্য অপরাধী। কিন্তু তার অপরাধ হল উপসর্গ। মূল রোগ হল মানব যৌনতা ও যৌন- মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে ঐ দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি যার উপর ভর করে জন মানি তার কাজগুলোকে জায়েজ করছিল। আর এ দর্শনের মূলনীতিগুলো হল –

১) প্রতিটি মানুষ সর্বকামী (pansexual/omnisexual) হিসেবে জীবন শুরু করে। তারপর সে কোন এক বা একাধিক ধরনের যৌনাচারকে বেছে নেয়। এটি জন্মের সময় নির্ধারিত বা প্রাকৃতিক ভাবে নির্ধারিত না। প্রাকৃতিক ভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌনতা সীমাবদ্ধ, এ কেবলই একটি সামাজিক প্রচলন।

২) মূলত সব ধরণের যৌনতাই স্বাভাবিক। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন যৌনতার ব্যাপারে আমাদের ধারণা বদলায়। আমাদের সামাজিক চিন্তার কারণে আমরা কিছু যৌনাচারকে স্বাভাবিক আর কিছু যৌনাচারকে অস্বাভাবিক মনে করি।

৩) জন্মের পর থেকেই একজন শিশুর মধ্যে যৌনতার ধারণা ও বোধ বিদ্যমান থাকে। একারণেই শিশুকাম বা অজাচার অস্বাভাবিক কিছু না। কালার ব্লাইন্ড বা বাঁহাতি হবার মতো। সমাজের বিদ্যমান নৈতিকতার কাঠামো কারণে আমরা এ কাজগুলোকে অপরাধ বা বিকৃতি মনে করি।

***

ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা হল এই চিন্তাগুলো জন মানির একার বিচ্ছিন্ন চিন্তা না। বরং পশ্চিমের আধুনিক যৌন-চিন্তা এ মূলনীতিগুলোকে সর্বজনীনভাবে স্বীকার করে। এবং গত চার দশক বা আরো বেশি সময় ধরে এর অসংখ্যবার এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এই

যুক্তিগুলো দিয়েই জায়েজ করা হয়েছে সমকামিতার মতো বিকৃত যৌনতাকে। মৃত্যুর পরও জন মানির চিন্তা তার প্রভাব জানান দিচ্ছে।

গত বেশ ক'বছর ধরে পশ্চিমে গড়ে উঠেছে "ট্রান্সজেন্ডার রাইটস" আন্দোলন। মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে এ আন্দোলনকে সমর্থন দেওয়া হচ্ছে।

"৫২ বছর বয়েসী ৭ সন্তানের ব্যাপারে এখন ৬ বছরের ট্রান্সজেন্ডার মেয়ে হিসেবে পরিচিত হতে চান",

"ব্রিটেনের প্রথম জেন্ডার ফ্লুয়িড পরিবার: বাবা নিজেকে নারীতে পরিণত করছেন, মা নিজেকে পুরুষ মনে করেন, আর ছেলে বড় হচ্ছে জেন্ডার নিউট্রাল হিসাবে"

আশঙ্কাজনক বেড়ে গেছে এধরনের খবর। সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট অনুযায়ী ব্রিটেনে প্রতি সপ্তাহে ৫০ জন শিশুকে Gender Dysphoria ও Gender Change সংক্রান্ত ক্লিনিকে পাঠানো হচ্ছে, যার মধ্যে ৪ বছর বয়েসী শিশুও আছে।

ব্যাপারটা কী? পশ্চিমা বিশ্বে সবাই কি রাতারাতি হিজড়া হয়ে যাচ্ছে?

সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী প্রতি ২০০০ জনে ১ জন True Hermaphrodite বা intersex ব্যক্তিকে পাওয়া যায়। জনসংখ্যার ০.০৫% । এছাড়া বাকি ৯৯/৯৫% মানুষ হয় নারী অথবা পুরুষ। অর্থাৎ মানুষের পরিচয় বাইনারি। অথচ এখন যে কোন মানুষ বা শিশু যদি দাবি করে সে একজন নারী হিসেবে, বা পুরুষ হিসেবে, বা অন্য কোন "কিছু" হিসেবে পরিচিত হতে চায়, তবে তাই ধরে নিতে হবে, শারীরিকভাবে, জন্মসূত্রে যাই হোক না কেন! নিউ ইয়র্কে আইনি ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ৩১ টি লৈঙ্গিক পরিচয়কে (Gender Identity)। ফেইসবুকে দেওয়া আছে কোন জায়গায় ৬০টি, কোন জায়গায় ৭১ টি জেন্ডার আইডেন্টিটির লিস্ট থেকে "নিজের পরিচয়" বেছে দেওয়া অপশান। ল'রিয়েল, ফোর্ড, নাইকি, টার্গেটসহ বিভিন্ন মেগা ব্র্যান্ড তাদের বিজ্ঞাপনে খোলাখুলি ব্যবহার করছে ট্রান্সজেন্ডার মডেলদের। বিভিন্ন ফ্যাশন বের করা শুরু করেছে হাউস জেন্ডার নিউট্রাল/জেন্ডার ফ্লুয়িড পোশাক। ব্রিটিশ ডিপার্টমেন্ট স্টোর জন লুইস ঘোষণা করেছে তারা বাচ্চাদের পোশাক আর "ছেলে" বা "মেয়ে" ট্যাগ দিয়ে আলাদা করবে না। এখন থেকে তারা বাচ্চাদের শুধু "Unisexz"/"Gender Neutral" পোশাক বিক্রি করবে।

২০১৭ এর মার্চে মানুষের মৌলিক পরিচয় ও যৌনতার পরিবর্তনশীল সংজ্ঞার এ যুগ নিয়ে কাভার স্টোরি করেছে টাইম ম্যাগাযিন। Beyond 'He' or 'She': The Changing Meaning of Gender and Sexuality – শিরোনামের এ লেখায়

সমকামী অধিকার নিয়ে কাজ করা অ্যাডভোকেসি গ্রুপ GLAAD এর জরিপের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে অ্যামেরিকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তরুণ এখন আর নিজেদের পুরোপুরিভাবে স্বাভাবিক যৌনাচারে আকৃষ্ট (Heterosexual) কিংবা সমকামিতায় আকৃষ্ট মনে করে না। বরং বেছে নেয় এ দু'ইয়ের "মাঝামাঝি কিছু একটাকে"। একইভাবে অ্যামেরিকান তরুনদের এক-তৃতীয়াংশ এখন আর "পুরুষ" বা "নারী" হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয় না।[৯৭] অ্যামেরিকাসহ পশ্চিমের অনেক দেশে আন্দোলন চলছে "ট্রান্সজেন্ডার টয়লেট অধিকার" নিয়ে। যার মূল দাবি হল একজন পুরুষ যদি নারী হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তাহলে নারীদের জন্য নির্ধারিত টয়লেট ব্যবহার করতে পারা তার আইনগত অধিকার। এমনকি কিছু কিছু জায়গায় যদি একজন পুরুষ যদি নিজেকে মেয়ে বলে পরিচয় দিতে চায় আর আপনি যদি তার ক্ষেত্রে he/him/his - ইত্যাদি সর্বনাম ব্যবহার করেন তবে সেটাকে বেআইনি ঘোষণা করার চিন্তাভাবনা চলছে। এটা নাকি ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ করা এবং বৈষম্য। এমনকি কিছুদিন আগে বাংলাদেশের ডেইলি স্টার তাদের সাপ্তাহিক সাপ্লিমেন্ট "Lifestyle" এ Gender fluidity/ Gender Neutrality – কে সমর্থন করে কাভার স্টোরি করেছে।[৯৮]

ঠিক দু'দশক আগে যেভাবে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরন ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরির জন্য মিডিয়াকে ব্যবহার করা হয়েছিল, বর্তমানে ঠিক একই কাজ করা হচ্ছে "ট্রান্সজেন্ডার রাইটস"-এর নামে। "যৌনতা, ব্যক্তি পরিচয় এসবই আপেক্ষিক। ব্যক্তির স্বাধীন সিদ্ধান্তের বিষয়। একজন মানুষ ভেতরে কেমন তাই মুখ্য। সামাজিক প্রথা আর পশ্চাৎপদতার কারণে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি উচিৎ না। যখন কারো ক্ষতি হচ্ছে না তখন বিরোধিতা কেন?" – ইত্যাদি নানান কথার মাধ্যমে চলছে এই বিকৃতি ও অসুস্থতাকে স্বাভাবিক ও নির্দোষ হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা। আর এসব কিছুর মূলে আছে ডঃ জন মানির থিসিস ও ধারণা। তার কিছু অনুসিদ্ধান্ত বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু সার্বিক ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তার এসব ধারণাকে। তার তৈরি করা (কু)যুক্তি, ভাষা ও অপ-বিজ্ঞানের কাঠামোর মধ্যে দিয়েই এ বিকৃতিকে জায়েজ করার চেষ্টা করছে মিডিয়া, সাইকলোজিস্ট এবং সেক্সোলজিস্টরা। তৈরি করছে এর পক্ষে বয়ান। যৌনতার ব্যাপারে পশ্চিমের বর্তমানের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা অনেকাংশেই জন মানির অবয়বে গড়া। ডেইভিড রাইমারের গল্প আর জন মানির অপরাধকে বুঝতে হলে ও বাস্তবতার আলোকেই বুঝতে হবে।

---

[৯৭] http://time.com/4703309/infinite-identities-gender-sexuality-young-people/
http://time.com/4703058/time-cover-story-beyond-he-or-she/

[৯৮] "Androgyny in a fair world" [Lifestyle, The Daily Star, 8th August, 2017]

আপেক্ষিক নৈতিকতা ও পেডোফিলিয়া

কিছুদিন আগে টিএসসির ভাইরাল হওয়া ছবির প্রসঙ্গে বলেছিলাম নৈতিকতার মানদন্ডের গুরুত্বের কথা। কোন মানদন্ডের ওপর ভিত্তি করে আমরা কোন কিছুকে ভালো বা খারাপ বলবো? আমরা কি মানদন্ড হিসেবে নেবো প্রচলন, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা কিংবা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চল বা জাতির ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিকে? নাকি একটি সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় মানদন্ড থাকতে হবে। বলেছিলাম - ইসলামের বদলে সামাজিকতা, গ্রহণযোগ্যতা ও ঐতিহ্যকে মানদন্ড হিসেবে নিলে পশ্চিম থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসা প্রচন্ড ও সর্বব্যাপী নৈতিক অধঃপতনের স্রোতের মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। সময়ের সাথে বদলাতে থাকা নৈতিকতার কম্পাস বাঁধ দিতে পারে না, বরং অধঃপতন আর অবক্ষয়ের কারণ হয়ে ওঠে। পাবলিক পারসেপশান বদলায়, খুব দ্রুতই বদলায়। এক প্রজন্মের কাছে যা অকল্পনীয়, অন্য প্রজন্মের কাছে তাই হয়ে ওঠে স্বাভাবিক। গত এক শতাব্দী জুড়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পাবলিক পারসেপশান এবং জনমত পরিবর্তনের কাজ করে আসছে ম্যাস মিডিয়া। আধুনিক প্রপাগ্যান্ডার জনক এবং আনসাং হিরো (বা অ্যান্টিহিরো) এডওয়ার্ড বারনেইস তার বই "প্রপাগ্যান্ডা"-তে মিডিয়ার মাধ্যমে সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধাপগুলো তুলে ধরেছেন খুব সহজবোধ্য ও খোলামেলাভাবে।

একটা বাস্তব উদাহরণ দেই। গত সপ্তাহ দুয়েক ধরে ধরে ইন্টারনেটে একটা বিষয় নিয়ে তুলকালাম হচ্ছে। জনপ্রিয় মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম TEDxTalk এর একটি পর্বে মিরজাম হেইন নামে একজন জার্মান মেডিক্যাল স্টুডেন্ট বলেছে - পেডোফিলিয়া বা শিশুকাম একটি অপরিবর্তনীয় যৌন প্রবৃত্তি (unchangeable sexual orientation)। একজন নারী ও পুরুষের পারস্পরিক যৌন কামনা যেমন স্বাভাবিক তেমনি কিছু মানুষ শিশুদের প্রতি যৌন আকর্ষন বোধ করে – এটাও স্বাভাবিক। তাই যারা পেডোফাইল- শিশুকামী - এই তাড়না, এই আকর্ষনবোধের কারণে তাদের দোষারোপ করা উচিৎ না। ভিডিওটি প্রকাশিত হবার সাথেসাথে ব্যাপক তর্কবিতর্ক শুরু হয় এবং তুমুল বিরোধিতার কারণে TEDxTalk বাধ্য হয় তাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে ভিডিও সরিয়ে নিতে।

মজার ব্যাপারটা হল শিশুকামের প্রবণতা স্বাভাবিক, অপরিবর্তনীয় এসব বলার পাশাপাশি হেইন এটাও বলেছে যে, শিশুকামের বাস্তবায়ন অপরাধ ও অনৈতিক। অর্থাৎ শিশুদের প্রতি যৌন আকর্ষন থাকা স্বাভাবিক কিন্তু এই কামনা বাস্তবায়িত করা, এই অ্যাট্রাকশানের ওপর কাজ করা অপরাধ।

এখানেই নৈতিকতার মানদন্ডের ব্যাপারে আমাদের আলোচনা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

পেডোফিলিয়া যদি নারীপুরুষের পারস্পরিক শারীরিক আকর্ষনের মতোই যদি স্বাভাবিক এবং অপরিবর্তনীয় বিষয় হয় তাহলে এই আকর্ষনের ওপর আমল করা কেন অপরাধ হবে? কারণ একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যখন কোন শিশুর সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয় তখন ব্যাপারটা দুজনের সম্মতিতে হয় না। অর্থাৎ এটা অপরাধ কারণে এখানে পারস্পরিক সম্মতি (Consent) অনুপস্থিত। একই কারণে পশুকামও অপরাধ, কারণ এক্ষেত্রেও পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যৌনকর্ম হচ্ছে না। সম্মতি একপাক্ষিক। এটা হেইনের উত্তর। যদিও পশ্চিমের অনেকেই এখন তার বিরোধিতা করছে, কিন্তু যৌনতার ব্যাপারে আধুনিক পশ্চিমের ধারণা অনুযায়ী এ উত্তর সঠিক।

চিন্তা করে দেখুন, বিবাহবহির্ভূত সেক্স (যিনা), সমকামিতা, উভকামিতা, সুইঙ্গার সেক্স, হুকআপ কালচার (বহুগামীতা), গ্রুপসেক্সের মতো যৌনবিকৃতিগুলোর পক্ষে উদারনৈতিক পশ্চিমের ডিফেন্স কী?

"আমরা তো কারো ক্ষতি করছি না!"

"যতোক্ষন পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিয়ে কিছু করছি, ততোক্ষন কী সমস্যা?"

"ভালোবাসা কোন বাঁধা মানে না"

"দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যা ইচ্ছে করার অধিকার আছে, এবং এতে হস্তক্ষেপ করার স্বাধীনতা কারো নেই"

"আমার এ ব্যাপারটা (যেকোন যৌনবিকৃতি) জন্মগত"

মূলত এধরণের উত্তরই বিভিন্নভাবে আমরা শুনে আসছি। সুতরাং পেডোফিলিয়ার ব্যাপারে মিরজাম হেইন যা বলেছে তা পুরোপুরিভাবে পশ্চিমের এ দৃষ্টিভঙ্গি – এ মানদণ্ডের – সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এখন প্রশ্ন করতে পারেন – এ মানদন্ডে সমস্যা কোথায়? হ্যাঁ এটা ইসলামের নৈতিকতার সাথে যায় না, কিন্তু পারস্পরিক সম্মতির শর্ত দিয়ে তো অ্যাটলিস্ট শিশুকামিতা ও পশুকামিতার মতো ব্যাপারগুলো আটকানো যায়, এটাই বা কম কিসে?

সমস্যা হল, এ শর্ত দিয়ে শিশুকামিতাকে আটকানো যায় না। ব্যাখ্যা করছি।

বলা হচ্ছে – শিশুর সাথে সেক্স একটি অপরাধ এবং অনৈতিক কাজ কারণ এখানে উভয়পক্ষের পারস্পরিক সম্মতি (consent) নেই।

পারস্পরিক সম্মতি নেই কেন?

কারণ একটা নির্দিষ্ট বয়সের আগে, বয়ঃপ্রাপ্ত হবার আগে শিশুর মধ্য যৌনতার ধারণা গড়ে ওঠে না। যেহেতু শিশুর মধ্যে যৌনতার ধারণা, নিজের যৌনতা সম্পর্কে সচেতনতাই নেই। তাই তার পক্ষে কোন যৌনকর্মে সম্মতি দেয়া (consent করা) সম্ভব না। অতএব শিশুর সাথে সেক্স আবশ্যিকভাবেই সম্মতি ছাড়া হচ্ছে, তাই এটি একটি অনৈতিক ও অপরাধ। যেমন একজন নারীর সাথে তার সম্মতি ছাড়া যৌনকর্ম করা রেইপ।

রাইট?

রং।

এ পুরো যুক্তির ভিত্তি হল "Consent" – সম্মতি। যদি আমি প্রমাণ করতে পারি যে এখন শিশুর যৌনতার ব্যাপারে সম্মতি দেয়ার মতো ম্যাচিউরিটি আছে, তাহলে কি এ যুক্তি আর দাড়াতে পারবে?

যদিও এখনো বিষয়টা ঠিক এভাবে আলোচনা করা হচ্ছে না, কিন্তু শিশুরাও যে "যৌনতা সম্পর্কে সচেতন" এটা অলরেডি পশ্চিমা অ্যাকাডেমিয়া এবং মিডিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত একটি বিষয়। বিশ্বাস হচ্ছে না?

সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই পশ্চিমা মনোবিজ্ঞানের অবস্থান হল শিশুরা জন্ম থেকেই যৌনতা সম্পর্কে সচেতন। যৌনতা সম্পর্কে আধুনিক সেক্সোলজির জনক ড. অ্যালফ্রেড কিনসি এবং আরেক মহারথী ড. জন মানির অবস্থানের দিকে তাকালেই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়। এ দুজনের অবস্থানের সারসংক্ষেপ হল –

১) জন্মের পর থেকেই শিশুরা যৌনতা সম্পর্কে সচেতন, সেক্সুয়ালি অ্যাক্টিভ এবং যৌনসুখ অর্জনে সক্ষম।

২) ১০-১১ বছর বয়েসী শিশু যৌন আকর্ষন অনুভব করতে পারে। তুলমামূলক ভাবে বয়স্ক কোন ব্যক্তির সাথে যৌন মিলন – শিশুর জন্য নেতিবাচকই হবে এমন কোন কথা নেই।

[রেফারেন্স ও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, 'মিথ্যের শেকল যত' - "মুক্তো বাতাসের খোঁজে" ইলমহাউস পাবলিকেশন]

যদি কিনসি আর জন মানির দেয়া যৌনতার ধারণা গ্রহণ করা হয় – যদি মানব যৌনতার ব্যাপারে আধুনিক পশ্চিমা চিন্তার মূলনীতিগুলো মেনে নেয়া হয় - তাহলে আর এ যুক্তি দেয়া যায় না যে শিশুকাম একটি অপরাধ কারণ শিশুদের পক্ষে Consent করা বা যৌনকর্মে সম্মতি দেয়া সম্ভব না। যদি কেউ যৌনতা সম্পর্কে সচেতন হয়,

যৌনসুখ অর্জনে সক্ষম হয় এবং সক্রিয়ভাবে যৌনকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারে, তাহলে সে সম্মতি কেন দিতে পারবে না?

শিশুকামের পক্ষে প্রচারণা চালানো অ্যামেরিকান ও ইউরোপিয়ান বিভিন্ন সংস্থা সত্তরের দশক থেকে ঠিক এ যুক্তিই ব্যবহার করে আসছে। দেখুন অ্যামেরিকান সমকামি শিশুকামি সংস্থা NAMBLA - North American Man Boy Love Association এর সদস্যদের বক্তব্য - https://www.youtube.com/watch?v=Ygrd-29_O3I

এতো গেল অ্যাকাডেমিয়ার কথা। সাধারণ মানুষের কী অবস্থা? অধিকাংশ সময়ই অ্যাকাডেমিকদের তত্ত্বকথার কচকচির সাথে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের তেমন কোন সম্পর্ক থাকে না। এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা কি এরকম? সাধারণ মানুষও কি মনে করছে একজন শিশু যৌনতা সম্পর্কে সচেতন, নিজের যৌনতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম ?

জি মনে করছে। কিংবা বলা ভালো তাদের মনে করানো হচ্ছে। এব্যাপারে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর জন্য মিডিয়া, এডুকেইশান সিস্টেম, পশ্চিমা সরকার এবং গ্লোবাল অর্গাইনাইযেইশানগুলো (ইউএন, WHO ইত্যাদি) পুরোদমে কাজ করছে। ব্যাপারটা সম্ভবত আপনারও চোখে পড়েছে, তবে হয়তো কানেকশানটা ধরতে পারেননি।

গত দশ বছরে ট্র্যান্সজেন্ডার আইডেন্টিটি নিয়ে ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলো একটু মনে করার চেষ্টা করুন তো! কিছু শিরোনাম আবার মনে করিয়ে দেই –

"ব্রিটেনের প্রথম জেন্ডার ফ্লুয়িড পরিবার: বাবা নিজেকে নারীতে পরিণত করছেন, মা নিজেকে পুরুষ মনে করেন, আর ছেলে বড় হচ্ছে জেন্ডার নিউট্রাল হিসাবে"।

নিউ ইয়র্কে আইনি ভাবে ৩১ টি লৈঙ্গিক পরিচয়কে (Gender Identity) স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ব্রিটিশ ডিপার্টমেন্ট স্টোর জন লুইস ঘোষণা করেছে তারা বাচ্চাদের পোশাক আর "ছেলে" বা "মেয়ে" ট্যাগ দিয়ে আলাদা করবে না। এখন থেকে তারা বাচ্চাদের শুধু "Unisexz"/"Gender Neutral" পোশাক বিক্রি করবে।

২০১৭ এর মার্চে টাইম ম্যাগাযিন মানুষের মৌলিক পরিচয় ও যৌনতার পরিবর্তনশীল সংজ্ঞার এ যুগ নিয়ে কাভার স্টোরি করেছে। Beyond 'He' or 'She': The Changing Meaning of Gender and Sexuality – শিরোনামের এ লেখায় সমকামী অধিকার নিয়ে কাজ করা অ্যাডভোকেসি গ্রুপ GLAAD এর একটি

জরিপের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে অ্যামেরিকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তরুণ এখন আর নিজেদের সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক যৌনাচারে আকৃষ্ট (Heterosexual) অথবা সম্পূর্ণ ভাবে সমকামিতায় আকৃষ্ট মনে করে না। বরং "মাঝামাঝি কিছু একটাকে" বেছে নেয়। একইভাবে অ্যামেরিকান তরুনদের এক-তৃতীয়াংশ "পুরুষ" বা "নারী" হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয় না।

কিছুদিন আগে বাংলাদেশের ডেইলি স্টার তাদের সাপ্তাহিক সাপ্লিমেন্ট "Lifestyle" এ Gender fluidity/ Gender Neutrality – কে সমর্থন করে কাভার স্টোরি করেছে। [লিঙ্ক - https://bit.ly/2OngXCN]

নার্সারির বাচ্চাদের জেন্ডার ফ্লুয়িডিটির ব্যাপারে ক্লাস নিচ্ছে ড্র্যাগ কুইনরা। [https://nbcnews.to/2tkr4P2]

ব্রিটেনে প্রতি সপ্তাহে ৫০ জন শিশুকে Gender Dysphoria ও Gender Change সঙ্ক্রান্ত ক্লিনিকে পাঠানো হচ্ছে, যার মধ্যে ৪ বছর বয়েসী শিশুও আছে। শিশুদের মধ্যে লিঙ্গ পরিবর্তন অপারেশন বৃদ্ধি পাচ্ছে। [https://bit.ly/2LUsKai]

সংক্ষেপে ট্র্যান্সজেন্ডার আইডিওলজির মূল কথা হল – মানুষের ধরাবাঁধা কোন যৌনতা ও লৈঙ্গিক পরিচয় নেই। এ ব্যাপারটা একটা স্পেক্ট্রাম একটা রংধনুর মতো (হ্যাঁ এই জন্যই রংধুন সিম্বল ব্যবহার করা হয়)। কোন কিছু সাদাকালো না। এখানে আছে অনেক, অনেক রং। যে কোন মানুষ বা শিশু যদি বলে সে একজন নারী হিসেবে, বা পুরুষ হিসেবে, বা অন্য কোন "কিছু" হিসেবে পরিচিত হতে চায়, তবে তাই ধরে নিতে হবে। সে শারীরিকভাবে, জন্মসূত্রে যাই হোক না কেন!

মজার ব্যাপার হল ট্র্যান্সজেন্ডার মুভমেন্টের পক্ষে দেয়া যুক্তিগুলো দিয়ে খুব সহজে সমকামিতার পক্ষে দেয়া যুক্তিগুলো খন্ডন হয়ে যায়। সমকামিতার পক্ষে বহুল ব্যবহৃত একটি যুক্তি হল কিছু মানুষ জন্মগতভাবেই সমকামি হয় ('born this way')। আবার অনেকে বলার চেষ্টা করে একটি বিশেষ জিন (the gay gene) আছে যার কারণে কিছু মানুষ সমকামি হয়ে জন্মায়। অর্থাৎ তারা দাবি করে সমকামিতদের যৌনতা বায়োলজিকালি নির্ধারিত।

আবার দেখুন ট্র্যান্সজেন্ডার উন্মাদনার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে এরা বলছে যৌনতা, লৈঙ্গিক পরিচয়, এসবই পরিবর্তনশীল। কোন কিছুই পাথরে লেখা। যে নারী হিসী জন্মেছে সে একসময় পুরুষ হতে পারে, যে নারীদের প্রতি আকর্ষনবোধ করতো একসময় সে আকর্ষনবোধ করতে পারে পুরুষের প্রতি। এগুলো খুবই স্বাভাবিক ইত্যাদি। যদি তাই হয়, তাহলে নিশ্চয় সমকামিতা জন্মগত হতে পারে, যেহেতু জন্মগত লিঙ্গকেই স্বীকার

করা হচ্ছে না। সমকামি জিন বলেও তাহলে কিছু থাকতে পারে না। এই যুক্তি অনুযায়ী সমকামিতা, উভকামিতা, পশুকামিতা, কিংবা নারী পুরুষের স্বাভাবিক যৌনতা - কোন কিছুই জিনগত না, বায়োলজিকালি নির্ধারিত না। এসবই এগুলো বদলাতে পারে। যার অর্থ একজন সমকামি, একসময় সমকামিতা থেকে বের হয়ে আসতে পারে। আর যদি সাধারণভাবেই একজন সমকামি সমকামিতা থেকে বের হয়ে আসতে পারে, তাহলে ট্রিটমেন্টের মাধ্যমেও এটা করা সম্ভব। অর্থাৎ ট্র্যান্সজেন্ডার উন্মাদনার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে মিলিট্যান্ট সেক্যুলারিযম সমকামিতার পক্ষে চালানো নিজেরদের প্রপাগ্যান্ডাকেই খন্ডন করে বসে আছে। তাদের এক কথা আরেক কথার সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। অসংলগ্ন ধ্যানধারণা ও মতাদর্শের মধ্যে এ প্যাটার্নটা বারবার দেখতে পাবেন।

লক্ষণীয় বিষয় হল এখানে সত্যিকারের ইন্টারসেক্স বা ট্রু হারমাফ্রোডাইটের কথা বলা আচ্ছে না। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী প্রতি ২০০০ জনে ১ জন True Hermaphrodite বা intersex ব্যক্তিকে পাওয়া যায়। জনসংখ্যার ০.০৫%। অর্থাৎ এরা এমন মানুষ সংখ্যায় খুবই কম। ট্র্যান্সজেন্ডার মুভমেন্টে এমন মানুষ/শিশুদের কথা বলা হচ্ছে যাদের শারীরিক কোন সমস্যা নেই। শারীরিকভাবে তারা পুর্নাংঙ্গ নারী বা পুরুষ। কিন্তু তারা মনে করেছে তারা ভুল দেহে আটকা পড়েছে। মিডিয়ার ভাষ্য অনুযায়ী চার বছর বয়েসী শিশুদেরও এখন এমন মনে হচ্ছে, এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ফ্রি-তে এমন ওষুধ দিচ্ছে যেগুলো তাদের স্বাভাবিক বয়ঃসন্ধিকে বিলম্বিত বা বন্ধ করবে (Puberty Blockers – horomone therapy) [https://to.pbs.org/2uUu1rt, https://bit.ly/2K1zjpy]

ট্র্যান্সজেন্ডার উন্মাদনা নিয়ে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড রিডিং এর জন্য দেখুন –
https://bit.ly/2NLQbD9,
https://bit.ly/2NPyvX9

নিচে দুটো দশ বছর বয়েসী ছেলের ভিডিও দিচ্ছি যারা দাবি করছে ২ এবং ৩ বছর বয়স থেকে "ড্র্যাগ" করা শুরু করেছে। এ বয়সেই তারা আবিষ্কার করেছে যে তাদের স্বাভাবিক শারীরিক পরিচয়ের বাইরেও তাদের মধ্যে অন্য একটি "সত্ত্বা" আছে। ড্র্যাগ (Drag) হল পশ্চিমা সমকামিদের একটি সাবকালচার যেখানে সমকামি পুরুষরা নারীদের মতো ড্রেসআপ ও মেইকআপ করে বিভিন্ন ধরণের স্টেইজ শো – রানওয়ে, গান, নাচ ইত্যাদি-তে অংশগ্রহণ করে। কাজটা যখন সমকামি পুরুষরা করে তখন তাকে বলা হয় "ড্র্যাগ কুইন"। "ড্র্যাগ কিং" এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো। সমকামি নারীরা পুরুষের মতো ড্রেসআপ ও মেইকআপ করে। এধরণের অনুষ্ঠানগুলো হাইলি

সেক্সুয়ালাইযড হয়ে থাকে। ভিডিওও অংভঙ্গি দেখলেই বুঝতে পারবেন। এবাচ্চাগুলো টিভিতে বড়দের যা করতে দেখেছে তাই কপি করছে।

'ডেযমন্ড' - https://www.youtube.com/watch?v=Qk0WA3VlFfA

'ল্যাকট্যাশিয়া' - https://www.youtube.com/watch?v=bdCXxUxI-WE

[দুটো ভিডিওতেই নানা জাতের অসভ্য মানুষের ফুটেজ আছে, সো নিজ দায়িত্বে দেখবেন বা দেখবেন না। ট্র্যান্সজেন্ডার মুভমেন্টের উন্মাদনার মাত্রা বোঝানো এবং প্রমাণ হিসেবে লিঙ্কগুলো দেয়া। আমি পারসোনালি ভিডিওগুলো দেখতে সাজেস্ট করবো না।]

আসুন এবার ডটগুলো মেলানো যাক। পুরো ব্যাপারটা এবার একটু স্টেপ বাই স্টেপ চিন্তা করুন –

১০ বছর বয়েসী বাচ্চারা বলছে তারা ২/৩ বছর বয়েস থেকেই নিজেদের মধ্যে এই 'সত্ত্বা' অনুভব করছে। কেউ অনুকরণ করছে ড্র্যাগ কুইনদের, আবার কেউ বলছে সে নিজের নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চায়। অভিভাবক, সমাজ, রাষ্ট্র ও মিডিয়া তাদেরকে সমর্থন করছে, এবং এই বাচ্চাদের "অনুভূতির" ওপর বেইস করে জীবনকে আমূল বদলে দেয়া বিভিন্ন মেডিকাল প্রসিজারের দিকে যাচ্ছে। লক্ষ করুন, এ সিদ্ধান্তগুলোর সাথে যৌনতার ব্যাপার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ৮ বছর বয়েসী একটা ছেলে যদি বলে সে হাইলি সেক্সুয়ালাইযড সমকামি সাবকালচারের সাথে আইডেন্টিফাই করে, অথবা যখন সে বলে সে আসলে পুরুষের দেহে আটকে পড়া একজন নারী – এবং আমরা যখন সেটা মেনে নেই, তখন মূলত আমরা এটাই মেনে নিচ্ছি যে নিজের যৌনতা ও শরীরের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্তগুলো দেয়ার মতো ম্যাচিউরিটি তার মধ্যে এসেছে। অর্থাৎ এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার মাধ্যমে আমরা মেনে নিচ্ছি এ বয়েসী একটা বাচ্চার সম্মতি দেয়ার – consent করার – সক্ষমতা আছে।

"নিজের পুরো শরীরকে বদলে ফেলার ব্যাপারে, নিজের লিঙ্গ বদলে ফেলার ব্যাপারে যে মানুষ সিদ্ধান্ত দিতে পারে, কার সাথে শোবে সেই ব্যাপারে সে সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না?"

একজন পেডোফাইল যদি প্রশ্ন করে, কী জবাব দেবেন? যদি যৌনতা এবং যৌন বিকৃতির ব্যাপারে পশ্চিমা চিন্তার মূল কাঠামোকে মেনে নেন, যদি আপনি মেনে নেন একটা শিশু তার লিঙ্গ পরিবর্তনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তাহলে আপনাকে

এটাও মানতে হবে যে এই শিশু তাহলে যৌনকর্মের ব্যাপারেও সম্মতি দিতে পারে। সুতরাং যে যুক্তি দিয়ে মিরজাম হেইন এবং অন্যান্য আরো অনেকে শিশুকামকে অনৈতিক ও অপরাধ বলছেন তা ধোপে টেকে না। ট্র্যান্সজেন্ডার আইডিওলজি আমাদের দেখাচ্ছে যে শিশুরাও যৌনতার ব্যাপারে সচেতন, সক্রিয় ও সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম। এবং এভাবেই যৌনতার ব্যাপারে আধুনিক পশ্চিমা দর্শন – যা আমরা আধুনিকতার নামে গদগদ হয়ে গ্রহণ করেছি – সেটা শিশুকামীতাকে বৈধতা দেবে।

অলরেডি একে বৈধতা দেয়ার থিওরেটিকাল এবং রেটোরিকাল ফ্রেইমওয়ার্ক পুরোপুরি প্রস্তত। এখন শুধু প্রয়োজন নিয়মিত কিছু আবেগঘন নভেল, সিরিয়াল, সিনেমা আর দেশে দেশে হাই-প্রোফাইল কিছু শিশু ট্র্যান্সজেন্ডার সেলিব্রিটি। ঠিক দু'দশক আগে যেভাবে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরন ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরির জন্য মিডিয়াকে ব্যবহার করা হয়েছিল, বর্তমানে "ট্রান্সজেন্ডার রাইটস"-এর নামে ঠিক একই কাজ করা হচ্ছে।

[সমকামিতার স্বাভাবিকীকরন কিভাবে হল – তা আমরা ইতোমধ্যে ভয়ের জগতের শুরুতে জেনে এসেছি]

"যৌনতা, ব্যক্তি পরিচয় এসবই আপেক্ষিক। ব্যক্তির স্বাধীন সিদ্ধান্তের বিষয়। একজন মানুষ ভেতরে কেমন তাই মুখ্য। সামাজিক প্রথা আর পশ্চাৎপদতার কারণে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি উচিৎ না। যখন কারো ক্ষতি হচ্ছে না তখন বিরোধিতা কেন?" – এসব আর্গুমেন্টের মাধ্যমে এই বিকৃতি ও অসুস্থতাকে স্বাভাবিক, নির্দোষ কিছু হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা চলছে। এবং একবার এই বিকৃতি গৃহীত হবার পর এই যুক্তি ব্যবহার করে বৈধতা দেয়া হবে পেডোফিলিয়ারও। আমার কথাটা স্মৃতিতে মজুদ করে রাখতে পারেন, বছর দশেক পর মিলিয়ে নেবেন।

এই অর্থহীন যৌনমানসিক বিকৃতির জট ইসলামের আলোতে খোলা খুব সহজ। আমরা জানি, আল্লাহ মানুষকে ফিতরাহর (natural disposition) ওপর সৃষ্টি করেছেন। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হল বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষন। জীবনের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে প্রতটি মানুষ বয়ঃপ্রাপ্ত (বালেগ) হয়, এবং তখন থেকে সে যৌনতায় সক্রিয় হবার সক্ষমতা অর্জন করে। অঞ্চল, আবহাওয়া ও পরিবেশভেদে এই বয়সের মধ্বেঁযে কিছু পার্ধেথক্য পরিলক্ষিত হয়। সমকামিতা জন্মগত না, স্বাভাবিক না। বরং একটি যৌনমানসিক বিকৃতি। আমরা জানি আল্লাহ ভুল করেন না। কাজেই ভুল করে, ছেলের দেহে মেয়ে বা মেয়ের দেহে ছেলে আটকা পড়েছে – এধরণের কিছু হওয়া সম্ভব না। হয় এটা মানসিক রোগ, বিকৃতি, বাহ্যিক কোন ফ্যাক্টরের

প্রভাব (অ্যাবিউয, শক, ট্রমা ইত্যাদি) অথবা সিহর বা জ্বিন শায়াত্বিনের প্রভাব। আর যারা সত্যিকার অর্থে, শারীরিকভাবে ইন্টারসেক্স (ট্রু হারমাফ্রোডাইট) তাদের হুকুম আহাদিস থেকে স্পষ্ট, এবং এটা তাদের জন্য একটি পরীক্ষা।

কিন্তু যখনই আপনি পরম মানদন্ডকে ছেড়ে আপেক্ষিকের গলিতে ঢুকে পড়বেন, কোন কূলকিনারা পাবেন না। আপেক্ষিক নৈতিকতা আর সামাজিকতাকে নৈতিকতার মানদন্ড হিসেবে নেয়ার এই হল ফলাফল। যৌনতা এবং যৌনবিকৃতি এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে শক্তিশালী কারণ এ বিষয়গুলো সহজাতভাবে মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। কিন্তু একই ধরণের বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান পশ্চিমা চিন্তা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অন্যান্য ক্ষেত্রেও। পশ্চিমা সভ্যতা তাদের উৎকর্ষের চরমে পৌছানোর পর এখন আছে অবক্ষয় আর অধঃপতনের পর্যায়ে। প্রত্যেক সভ্যতায় এই পর্যায়ে এসে নানান ধরণের যৌনবিকৃতি ও সীমালঙ্ঘন দেখা দেয়। লেইট স্টেইজ ডেকাডেন্স। পশ্চিম এখন এই অবস্থায় আছে। তাদের মধ্যে অনেকে এটা বুঝতেও পারছে। [https://bit.ly/2HtHdsg] কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা মুসলিমরা এখনো অনিমেষ নয়নে মুগ্ধ হয়ে পচতে শুরু করা অতিকায় এই কাঠামোর দিকে চেয়ে আছি। তাদের অনুকরণে নিজেদের উন্নতির স্বপ্ন দেখছি। অথচ সত্যিকারের দিকনির্দেশনা, সত্যিকারের পরশপাথর, পরম মানদন্ড – আল ফুরকান আমাদের হাতের কাছেই। কী বিচিত্র ইচ্ছাঅন্ধত্ব, কী অদ্ভূত আত্মঘৃণা!

পাঠ ৪৫।। চেপে যাওয়া ইতিহাস

না বলা কথাঃ

এই লেখাটা লিখতাম না। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু ঘটনা নৈতিকভাবে বাধ্য করল চিন্তাগুলো অভিজ্ঞতা গুলো শেয়ার করতে। বিষয়টা নিয়ে আমরা ডিসেনসিটাইজ হয়ে গেছি, মনে হচ্ছে। যাদের এই বিষয়ে সবচেয়ে ইনটলারেন্ট (সহ্য করার কথা না) হবার কথা ছিল, তাদের মাঝেই অদ্ভূত নীরবতা, ধামাচাপা দেবার চেষ্টা, ফরমেট পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছাই না থাকা এগুলো আমাকে কষ্ট দেয়। কারণ আমি বিষয়টার আগাপাশতলা বুঝি, জানি এর ব্যাপ্তি ও ধরনধারণ।

আমি এক বিশেষ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমার কৈশোর পার করেছি। ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস টুয়েলভ। বয়ঃসন্ধি থেকে তারুণ্যের শুরু অব্দি। তখন এতকিছু বুঝতাম না, ইনফ্যাক্ট আমি আমার সহপাঠীদের চেয়ে কমই বুঝতাম সবকিছু, আমোদউল্লাসে মেতে থাকতে পছন্দ করতাম। ১২-১৮ বয়সটা আমাদের আবাসিক থাকতে হয়েছে। যখন সবকিছু বুঝার সময়, আবেগের সময়, আকর্ষণটা টের পাওয়ার সময়। এসময় চিন্তাভাবনা থাকে কম, আবেগ থাকে বেশি, অপরিণামদর্শী বয়স। তখন নতুন নতুন ক্লাস সেভেনে, বোর্ডিং জীবন, সিনিয়রদের বকাঝকা তখনও শুরু হয়নি। আমরা ঢুকলাম, আর এক ব্যাচ ২ মাস পর বেরিয়ে যাবে। তো বিদায়ী ব্যাচের এক নেতা (লীডার কর্তৃপক্ষ নিয়োগ দেয়, প্রিফেক্ট বলা হয়) আমাদের বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে গল্পের আসর জমালেন। দাদু যেমন নাতিদের নিয়ে বসে। গভীর রাত অব্দি কত গল্প, কত কাহিনী, তাঁর ৬ বছরের জীবনের। আমরা বাচ্চারা খুব মজা নিয়ে শুনছিলাম।

নারী-পুরুষ নর্মাল প্যাটার্নটা আমি বুঝতাম ক্লাস টু থেকে (খারাপ সঙ্গে পড়ে)। হঠাৎ ভাই এমন একটা কথা বললেন, আমার মত এঁচোড়ে পাকা ছেলেও আসমান থেকে পড়ল, বলে কী ভাই এগুলো? ভাই আমাদের সতর্ক করছিলেন, সিনিয়র কেউ রাতে লাইটস অফের পর রুমে ডাকলে যাবা না। একজন আরেকজনের বিছানায় লাইটস অফের পর থাকবানা। আদরের নামে আপত্তিকরভাবে শরীর স্পর্শ করলে আমাকে এসে জানাবা। আর আপত্তিকর কিছু ভয়ভীতি/প্রলোভন দেখিয়ে করতে চাইলে আগে টাস করে একটা চড় মারবা, তারপর আমাকে এসে বলবা, বা কোন সিনিয়র যাকে বিশ্বাস কর তাকে জানিয়ে রাখবা। সেদিন থেকে আমার চিন্তার জগত একটা বিরাট ঝাঁকি খেল। এও সম্ভব? আমি জানলাম, নারীপুরুষ স্বাভাবিক আকর্ষণের

বাইরে একটা বিকৃত চিন্তার ধরন।

প্রতি ব্যাচেই কিছু না কিছু ঘটনা ঘটত। তবে সেগুলো প্রকাশ পেত না। 'ব্যাচের বদনাম' রোধে সেগুলোকে চেপে যাওয়া হত। প্রকাশ পেত শুধু সেগুলো, যেগুলোতে ঘটনাগুলো হত সিনিয়র-জুনিয়র। কারণ তখন জুনিয়র ব্যাচও ইনভলভড, সিনিয়র ব্যাচ কোন স্টেপ না নিলে জুনিয়র ব্যাচের কাছেও মানসম্মান থাকে না। সেসব ক্ষেত্রে অথোরিটিকে জানানো, বা নিজেরা শাসানো ইত্যাদি করা হতো। আমি এই মনস্তত্ত্বটার প্রতি শুরু থেকেই কৌতূহলী, কেন এমন হয়? 'গে-জীন' মতবাদ আমাদের বলছে, সৃষ্টিগতভাবেই কেউ কেউ সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষিত হয়। তবে এই মত মেনে নেয়ার আগের বিষয়টা হল, এই মতের প্রবক্তা নিজেই সমকামী ছিলেন। তাই, বলে দেয়া যায় না যে, নিজের বিকৃতিকে একটা সামাজিক স্বীকৃতির রূপ দেবার মোটিভ তাঁর ছিলো না। আমি বিষয়টার মনস্তাত্ত্বিক দিক নিয়েও ভেবেছ, পড়াশুনো করার চেষ্টা করেছি। কলেজের শেষ বছরে হঠাৎই ঘটনাগুলো খুব বেড়ে গেল, আমরা সচেতন কয়েকজন ব্যাচের সম্মান বাঁচাতে দ্রুত কিছু স্টেপ নিলাম যাতে জুনিয়ররা পুরো ব্যাচটাকে না গাইলায়। সেসময় অনেক কিছু জানলাম। বিকৃতির বহু প্রকাশ, এমনকি নিজ ব্যাচের ভিতরকার অনেক চেপে রাখা কাহিনীও সামনে চলে এল।

সমকামী হবার পিছনে দুটো মূল কারণ আমার সিদ্ধান্তে এলো। দুটোই বয়সন্ধিকালের আগেই গড়ে ওঠে। মানে কারও সমকামী হয়ে ওঠাটা তার বয়ঃসন্ধির আগেই ঠিক হয়ে যায়। প্রথম কারণ, বোনদের মাঝে বেড়ে ওঠা। নিজের লৈঙ্গিক স্বকীয়তা অনুভব না করা। এরকম একাধিক কেস আমি পেয়েছি। দুই বা তিন বোনের এক ভাই। ছোটবেলা থেকেই বোনদের সাথে থাকে, বোনরা সাজায়, বোনরা ছেলেদের গল্প করে, সে শোনে, মুগ্ধ হয়। মা হয়তো ভাবে, বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। বাবাও কেয়ার করে না, বা সময় দেন না। ধীরে ধীরে নারীর বদলে পুরুষের প্রতি আকর্ষণ গড়ে ওঠে। অতীত নোংরা জীবন থেকে তাবলীগের মাধ্যমে দীনের বুঝ পেয়েছেন, এখন ট্রান্সজেন্ডার-হিজড়াদের মাঝে মেহনত করছেন, এক ভাই জানিয়েছেন: আপনারা যেমন নারী থেকে নজরের হিফাজত করেন, আমাকে সব ছেলে থেকে চোখ বাঁচিয়ে চলতে হয়। কত কষ্ট করে ইজতেমায় আসি আমি জানি। আরেক মেডিকেল পড়ুয়া, খুব চেষ্টা করছেন সংশোধনের, ৩ বোনের একভাই। বাবা প্রবাসী। ঝরঝর করে কেঁদে দিলেন, বাবা না থাকায়, বয়ঃসন্ধির আগে কেউ চিনিয়ে দেয়নি যে তুমি ছেলে। মেয়েদের মত সাজাতো বোনেরা, সবাই মজা পেত দেখে। ধীরে ধীরে নারীসুলভ মুভমেন্ট এসে গেল।

ইসলামের বিধান খুব ক্লিয়ারকাট। একটা বয়সের পর ভাইবোন এক বিছানায় শোবে

না, একসাথে থাকবে না। পুরুষ কখনোই নারীর পোশাক পরবে না, নারী পুরুষের পোশাক পরবে না। বাবার সংস্পর্শে শিশু পুরুষ হয়ে ওঠে, শিশুরা বাবার মত হতে চায়। এজন্য বাবারা ছেলেশিশুদের সময় দেবেন। হাত ধরে মসজিদে নেয়া, একসাথে বল খেলা, বিকেলে বাবার হাত ধরে বেড়াতে নেয়া। এগুলো করতে হবে, বিশেষ করে যদি বড়বোনেরা থাকে, তাদের প্রভাব ও জীবনাচার থেকে শিশুকে বের করে আনতে হবে।

আর দ্বিতীয় কারণ হলো। খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে। এটাই আমার আলোচনার মূল কারণ। কলেজের ঘটনাগুলোর প্রায় শতভাগ ঘটনার একটা কমন বৈশিষ্ট্য ছিল। হয় একটিভ বা প্যাসিভ এজেন্টের একজন অবশ্যই পাওয়া যেত যে কলেজে ভর্তির জন্য আবাসিক কোচিং করত। আবাসিক ক্যাডেট কোচিংগুলো ক্লাস ফাইভ-সিক্স-সেভেন পড়িয়ে ক্যাডেট কলেজে সেভেনে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ানো হয়। বড় বড় কিছু প্রথিতযশা কোচিং এ বাচ্চারা আবাসিক থাকে। ১০-১১-১২-১৩ বছর বয়সী সব বাচ্চা। কলেজে ঘটা ঘটনার প্রায় শতভাগে একজন থাকে যে এমন শিশু বয়সে আবাসিক কোচিং করেছে। এবং প্রথম অভিজ্ঞতাটা হয়েছে এখানে, বয়সে বড় কারো দ্বারা। সমকামের মনস্তত্ত্ব গড়ে ওঠার ২য় কারণ হলো, ছোটবেলায় সমকামের অভিজ্ঞতা বা ভিকটিম হওয়া। বয়ঃসন্ধির আগেই বিকৃত অভিজ্ঞতা তাকে পরিণত বয়সে সমকামী করে তোলে। আর পায়ুকামে 'প্রোস্টেটিক ম্যাসাজ' এর ফলে বীর্যপাতও হয়, ফলে একটা অভ্যস্ততাও কাজ করে। এই ছেলেগুলোই পরবর্তীতে কলেজে ভর্তি হয়ে হয় নতুন কাউকে প্ররোচিত করে, বা নিজের মতই কাউকে খুঁজে নেয়। একটা ব্যাচে ৫০-৫৫ টা ছেলের মধ্যে ১-২ জন এমন পাওয়া যেত। আবাসিক কোচিং থেকে যারা আসত, তারা সবাই এমন তা কখনোই নয়। তবে যারা এরকম, তাদের প্রায় শতভাগ আবাসিক কোচিং এর হিস্ট্রি আছে। মানে তাদের প্রথম এক্সপোজার হয়েছে কোচিং-এ।

আমার পয়েন্ট হচ্ছে, বিভিন্ন বয়সী বাচ্চাদের একসাথে আবাসিক রাখা একদমই অনুচিত, তাও এই পর্নোগ্রাফির যুগে। ১৫ বছর আগে তো পর্নো এত সহজলভ্য ছিল না, তাতেই এসব কেস হত। এখন তো বিকৃতির সুযোগ আরও বেশি। আর এমন বাচ্চাদের আবাসিক দেয়ার আমি ঘোর বিরোধী যাদের ভালোমন্দ বুঝার বয়স হয়নি। এদেরকে হুমকি ধামকি বা ভয়ভীতি দেখিয়ে বড় বয়েসীরা ভিকটিমাইজ করতে পারে। বয়সে বড় কেউ বয় দেখিয়ে সম্মতি আদায় করতে পারে, এতটা অবুঝ বয়সে আবাসিক কখনোই দেবেন না, তাও এই নষ্ট যুগে।

এবার কিয়াসে আসেন। আমি নিজের ছেলে সন্তানকে অবশ্যই আলিম বানাবো

ইনশাআল্লাহ। দিলের তামান্না। সওয়াবে জারিয়া হবে। কিন্তু অবশ্যই বালেগ হওয়া বা ভালোমন্দ বুঝার মত বয়সের আগে আবাসিক মাদরাসায় দেবনা। বর্তমানে আমাদের প্রচলিত হিফজ সিস্টেম এক্সক্লুসিভলি আবাসিক। এখানেও ক্যাডেট কোচিং এর মত ৮-১৪ বছর বয়েসী বাচ্চারা আবাসিক থেকে পড়ে। আমার আগের বিশ্লেষণগুলো আমরা আবার স্মরণ করি ও মিলিয়ে দেখি:

১. যে ঘটনাগুলো আপনাআপনি বেরিয়ে আসে সেগুলো আমরা জানি।

২. আরও বহু ঘটনা বেরিয়ে আসে না, বা সম্মতিক্রমে হয়। সেগুলো আমরা জানি না।

৩. নাবুঝ বাচ্চাকে বয়সে বড় কেউ ভয়ভীতি দেখিয়ে ভিকটিম করতে পারে। মাদরাসার বেরিয়ে আসা ঘটনাগুলোতে আমরা পাই, বিকৃতমনা ওস্তাদ এভাবে ভয় দেখাচ্ছেঃ করতে না দিলে পড়া ভুলে যাবি/ কাউকে বলে দিলে আল্লাহ কঠিন আজাব দিবে/ কোনোদিন আলেম হতে পারবি না/ করতে না দিলে শরীরে খারাপ হয়ে যাবে, মারাত্মক সব অসুখ হবে। এই কথাগুলো ধরতে না পারার বয়সে কেন আপনারা বাচ্চাদের দেন?

৪. আর প্রলোভন দিয়ে বা একটা মানসিক বন্ধন তৈরি করে যে ঘটনাগুলো ঘটে সেগুলো আমি-আপনি কখনোই জানবো না। এমন হতে পারে ভিকটিম নিয়মিত গিফট, খাবার দাবার পায়। বা একটিভের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়, ইমোশন তৈরি হয়। এমন বহু ঘটনা আছে, ভিকটিমরা জানিয়েছে। একটা ঘটনায় ভিকটিমকে একটিভের নামে ধর্ষণের অভিযোগ আনতে বলা হচ্ছিল। ভিকটিম বলল: কেন অভিযোগ করব, আমি ওকে ভালোবাসি। এই ঘটনাগুলোই বেশি। এগুলো আবাসিক শিশু প্রতিষ্ঠানে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। খুবই অহরহ ঘটা ঘটনা।

৫. এরা বড় হয়ে নতুন কাউকে ভিকটিম বানাচ্ছে।

ঝেড়ে কাশি:

ক্যাডেট কলেজ, ভার্সিটি হল, বোর্ডিং স্কুল/কোচিং, ব্যারাকে বেশি হয়? নাকি মাদরাসাগুলোতে বেশি হয়? এই স্ট্যাটিস ও পাওয়া অসম্ভব, সেই বিচার করতেও আমি বসিনি। ওসব জায়গায় সবাই সমকামী হয়ে গেলেও আমার কিচ্ছু যায় আসে না। কিন্তু মাদরাসায় বছরে একটা ঘটলেও আমার যায় আসে। কেননা, আমি আমার সন্তানকে ওসব জায়গায় দেব না। আমি আমার সন্তানকে আলিম বানাবো, সুতরাং আমি নিজের চরকাতেই আছি এখনও।

আমি কখনোই বিশ্বাস করি না, আমাদের উলামা হযরতগণ এই নাবালেগ ছেলেশিশুর ফিতনার ব্যাপারে জানেন না। এই ফিতনা যে নারীর ফিতনার চেয়ে খারাপ এটা তারা জানেন না, আমি বিশ্বাস করি না। আমি কখনোই বিশ্বাস করি না, প্রচলিত হিফজ সিস্টেমে নাবালেগ বাচ্চাদের সাথে যুবক উস্তাদের একসাথে থাকাটা নারী-

পুরুষ একসাথে থাকার চেয়েও শয়তানের কাছে পছন্দনীয়, এটা তাঁরা জানেন না। তাঁরা অবশ্যই জানেন যে এভাবে নাবালেগ শিশুদের সাথে রাতযাপন শরীয়াসম্মত নয়। আমি কখনোই বিশ্বাস করি না, এই শরীয়াবিরোধী ফরমেট পরিবর্তন করে নতুন অনাবাসিক বা বালেগ হবার পরের নতুন ফরমেট আনার যোগ্যতা তাদের নেই। অবশ্যই তাঁরা যোগ্য, তাঁদের যোগ্যতা আছে নতুন ফরমেট আনার। তাহলে কেন তাঁরা করছেন না? এখানেই আমার কষ্ট। কথা উঠছে, ঘটনা ঘটছে, তাঁরাও জানেন এটা শরীয়াসম্মত না, পরিবর্তনের যোগ্যতা ও এখতিয়ারও তাঁদের আছে। এরপরও কেন হচ্ছে না? ছাত্র কমে যাবার ভয়? তাহলে কেন? আদীব হুজুরের ফরমেট কেন গ্রহণ করা হচ্ছে না? যদিও উলামায়ে কিরাম এসব ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক অবস্থানে আছেন, বিশেষ করে বড় বড় মাদরাসাগুলোতে। কিন্তু মোড়ে মোড়ে হাফিজিয়া মাদরাসা এবং মফস্বলের মাদরাসাগুলো ঝুঁকিমুক্ত নয়। একজন ভবিষ্যত অভিভাবকের দৃষ্টিতে আমার কিছু প্রস্তাব আছে। ছোট মগজের চিন্তাগুলো পেশ করার গোস্তাকি মাপ করবেন।

আমি খুব সম্ভবত কিশোরগঞ্জেই হবে, এক বড় মাদরাসায় উস্তাযগণের যিয়ারতে যাই এশার পরে। তো, লম্বা রুমের এক পাশে একজন উস্তাযের বিছানা, বিছানা আর বাকি রুমের মাঝে উঁচু পর্দা। পর্দার ভিতরেই উস্তাযের সাথে আরেক ছাত্রের বিছানা ফ্লোরে। আমরা উস্তাযের সাথে কথাবার্তা বললাম, আর ঐ খাদেম ছাত্র আমাদের পানি-বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করল। আমার দেখে পছন্দ হল না, পর্দার এক পাশে ২০ জন ছাত্র, আর একপাশে উস্তায আর এক নাবালক খাদেম। কিন্তু দিলে দিলে ভালো ব্যাখ্যা করলাম, যুবক উস্তাযের ছেলে তো না, তবে হয়ত ভাগ্নে-ভাস্তে হবে। বড় বড় মাদারিস এমন পর্দা ব্যবহারের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক। কোন ধরনের পর্দা থাকবে না।

ছেলেদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেই বোধহয় ছাত্রদের সাথেই উস্তায ঘুমান। আমার খেয়ালে, এক বয়সের বাচ্চাদের একসাথে রাখলে (মিক্সিং না) নজর রাখার প্রয়োজন কমে যাবে। উস্তাযদের থাকার জায়গা আলাদা হবে। রাতে উস্তাযের রুমে কোনো ছাত্র থাকবে না।

সব বয়সী ছাত্রকে এ বিষয়ে খোদ অধ্যক্ষ শিক্ষিত করবেন, যাতে তারা বিষয়ের গুরুত্ব বোঝে। যে কোন আপত্তিকর কিছু নজরে এলে, খোদ অধ্যক্ষকে এসে জানাবে।

মাদরাসায় স্কুলের মত টিসি (ট্রান্সফার সার্টিফিকেট) ব্যবস্থা থাকবে। এক মাদরাসায় ভর্তি হতে হলে আগের মাদরাসার টিসি লাগবে। কোন ছাত্র ধরা পড়লে পুরো মাদরাসার সব ছাত্রের সামনে তাকে রেডটিসি দেয়া হবে, যেন সবাই শিক্ষা নেয়। তার আর এলম হাসিলের দরকার নাই, সে জেনারেল লাইনে পড়ুক। আবাসিক থাকার যোগ্যতা সে

হারিয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো দয়ামায়া নেই। হদ কায়েম তো পারছেন না, এটুকু করতে দয়া দেখানো যাবে না।

উস্তাদ নিয়োগের সময় তাদের সার্টিফিকেটের কপি তো বোধ হয় রাখা হয় অফিসে। কোন উস্তায ধরা পড়লে তাৎক্ষণিক তার মাদরাসায় (সে যেখানে পড়েছে) যোগাযোগ করে সনদ কাটা হবে।

ওস্তায নিয়োগের সময় তার মাদরাসায় খোঁজ নেয়া হবে, কোন রিপোর্ট আছে কি না। এই সিস্টেমে সমকামের রিপোর্ট আছে এমন লোক উস্তায হবার যোগ্যতা হারাবে। বহু পেশা আছে দুনিয়ায়, কেউ না খেয়ে মরে না।

কোন ওস্তায ধরা খেলে তাকে সাধারণত বহিষ্কারই করা হয়। তবে সবার সামনে এসেম্বলী ডেকে বহিষ্কার করা হবে। যাতে বহু সাক্ষী থাকে। নবীজী ব্যভিচার গোপন করার চেষ্টা করেছেন, এই দলিল সমকামের ক্ষেত্রে খাটে না। সমকাম অতিগর্হিত ও ঘৃণ্য কাজ, ফিকহে এর শাস্তিও দৃষ্টান্তমূলক। যেহেতু হদ কায়েম করতে পারছেন না, অন্তত এমন ব্যবস্থা নেন, যা সবার জন্য দৃষ্টান্ত হবে।

বিশেষ করে হিফজখানায় বিবাহিত উস্তাদ রাখা। তাঁদেরকে স্ত্রীসহ আবাসিক থাকার ব্যবস্থা থাকতে হবে। সম্ভব না হলে (অধিকাংশ মাদরাসায়ই সম্ভব হয় না) প্রতি পাক্ষিক বা মাসিক ২/৩ দিনের ছুটিতে স্ত্রীর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা থাকা চাই।

তাবলীগে মাস্তুরাতসহ জামাত (মহিলাসহ পুরুষের জামাত) সবচেয়ে সেনসিটিভ কাজ। কোন বাসায় জামাতের মহিলারা উঠবে কি না, বেপর্দা হবার সম্ভাবনা আছে কি না, কোন বাসা মহিলাদের সাপ্তাহিক তালিমের উপযোগী কি না, মোটকথা মহিলাদের প্রতিটি ইস্যুই প্রথমে স্থানীয় জিম্মাদাররা দেখে অনুমোদন দেন, কয়েকবার করে দেখেন। সব শর্ত পুরা হয়েছে কি না নিশ্চিত হয়ে এরপর অনুমোদন দেন। এখন আল্লাহর রহমতে মাদরাসা ও হিফজখানা সংখ্যায় অগণিত। আমার খেয়াল হয়, হাইয়া বা বেফাক কিংবা সংশ্লিষ্ট বোর্ডে একটা শৃঙ্খলা কমিটি থাকবে যারা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার শর্ত গুলো যাচাই করে দেখবেন। তাদের গ্রীন সিগন্যাল পেলে মাদরাসা করা যাবে, নতুবা হবে না।

কিছু বিষয় সবাই খেয়াল রাখবে:

দুজনকে বার বার একই বিছানায় পাওয়া যাচ্ছে। নিষেধ করলেও পাওয়া যাচ্ছে।

বিভিন্ন ছুতোয় দুজন একই সাথে বা একটু আগে পরে টয়লেটের নাম করে বাইরে যায় কি না

কোনো উস্তাদ কোনো ছাত্রকে অকারণে বার বার ভুল ধরে বা অকারণে শাস্তি দেয় কি না (চাপে ফেলার জন্য)

কোনো উস্তায কোনো ছাত্রকে অতিরিক্ত মুহাব্বত করে, বেশি বেশি হাদিয়া দেয়া (চোখে লাগার মত)।

পৃথক অভিযোগ বাক্স থাকবে। পরিচয় প্রকাশ না করেও অধ্যক্ষ বরাবর সমস্যা জানাতে পারবে।

প্রায় প্রায়ই এসকল বিষয়ে অধ্যক্ষ ছাত্রদের ও উস্তাযদের সতর্ক করবেন।

বাচ্চাদের মাঝে পৌরুষ গড়ে উঠছে কি না সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখা। সাহাবীদের বীরত্ব ও সাহসের মুযাকারাগুলো তাদের মাঝে পুরুষালি রুক্ষতা ও মেজাজ তৈরিতে সহায়ক হবে।

আদীব হুজুরের হিফজ ফরমেটকে মূলধারায় কীভাবে নেয়া যায়, কিছু পরিবর্তন করেই নেয়া হোক। আর আমি যদি ভুল না হই, সৌদি আরবে তাহফীজই একটা তাখাসসুস। বিষয়টা আরও জেনে বিবেচনা যোগ্য।

অভিভাবকদের প্রতি আরজ:

পয়লা আপনাকে খুব গভীরভাবে বর্তমান যুগটাকে বুঝতে হবে। বাপমাদের সবচেয়ে বড় ভুল তারা এটা বুঝে না যে, তাদের ছেলেবেলা আর সন্তানদের ছেলেবেলা এক না। তাদের যুগ আর এই যুগ এক না। তারা মনে করে সবই এক। বর্তমান যুগ স্মার্ট ফোনের। পকেটের মধ্যে সব আছে। কেউ নষ্ট হতে হলে এখন তাকে পতিতালয়ে গিয়ে নষ্ট হতে হয় না, একটা স্মার্টফোন হলেই হয়। পর্নোগ্রাফির ছোবল থেকে কোন বয়সের মানুষই নিরাপদ নয়, মাদরাসাগুলোও নয়, উস্তাযগণও নয়। যেহেতু কেউ-ই ফেরেশতা নয়, সুতরাং যেকোন দুর্ঘটনা আমার-আপনার দ্বারাও ঘটতে পারে, এই আশঙ্কার নামই ঈমান। গুনাহের ব্যাপারে নির্ভীক হওয়া ঈমানের মজবুতির লক্ষণ না, মূর্খের লক্ষণ। আর গুনাহের ব্যাপারে সতর্ক থাকাই মজবুত ঈমানের লক্ষণ।

এত ছোট বাচ্চাকে আবাসিক দিবেন না, যে হালাল হারাম বোঝে না, যাকে সহজে একটা ভুল বুঝিয়ে ফেলা যায়। হাফেজ বানানোর চেয়ে বহু জরুরি তাকে গুনাহ থেকে বাঁচানো। ৮ বছরের আগে তো আবাসিক নয়ই। 'করতে না দিলে পড়া ভুলে যাবি' 'বলে দিলে আল্লাহ আজাব দিবে' জাতীয় কথা ধরার বয়স না হলে, নিজেকে রক্ষা করার মত বুঝ না হলে আপনারা এতটুকুন বাচ্চাকে কীভাবে ছাড়েন আমার বুঝে আসে না। অনেকে বলেন, ছোট বাচ্চাকে আবাসিক না রাখলে 'ভালো হাফেজ'

হওয়া যায় না। আচ্ছা, ভালো হাফেজ কেন হতে হবে? এটা কি ক্যারিয়ার? হিফজ করার পর তিলওয়াত করতে করতে, তারাবীহ্ পড়াতে পড়াতে, লোকমা খেতে খেতে ভালো হাফেজ হবে। এটাতো ক্যারিয়ার না, যে ভালো হাফেজ বের করতে হবে। যেসব হাদিসে সন্তানের কুরআন হিফজ করানোর ফাযায়েল আছে, কোথাও নেই যে আপনার সন্তানকে ভালো হাফেজ বানাতে হবে, যাতে ভালো জায়গায় তারাবী পায়, কোনো লোকমা ছাড়া ভাল জায়গায় পড়াতে পারে, আন্তর্জাতিক পুরস্কার এনে দিতে পারে।

আপনাদের চাহিদা সাপেক্ষে সমাজে সেবার ধরন নির্ধারিত হবে। আদীব হুজুরের হিফজ ফরমেটটা সবাই জেনে রাখেন। আগে ২/৩ বছরে উনার লিখিত 'এসো আরবি শিখি' বইটা শেষ করানো হয়। আরবি ভাষা জানা থাকায় হিফজ হয় দ্রুত। নর্মাল সিস্টেমে যেখানে ২-৩ বছর লাগে, সেখানে আদীব হুজুরের ফরমেটে লাগে ছয় মাস থেকে দেড় বছর। এটা মূল সিস্টেম হওয়া এখন সময়ের দাবি।

মাদরাসায় দিয়েই দায়িত্বমুক্ত হবেন না। মাদরাসায় বাচ্চা কী করে খোঁজখবর নেন। উস্তাদদের সাথে বসেন। বাচ্চার বন্ধুদের সাথে গল্প করেন। মাদরাসায় দিয়েছি, সন্তান ফেরেশতা হয়ে বের হয়ে আসবে, সে যুগ এখন আর নাই।

সন্তান মাদরাসায় যেতে না চাইলে, কেন যেতে চায় না শোনেন। বের করেন। প্রয়োজনে মাদরাসা বদলান। জোর করে পাঠাবেন না।

বাচ্চাকে দিয়ে ঠেকে যাননি। অধ্যক্ষের সাথে দেখা করে অভিভাবক হিসেবে মতামত দিন।

বাচ্চাকেও কিছু শিক্ষা দিন। ইঙ্গিতে বিষয়গুলো আগেই নলেজে দিন। তার সাথে খারাপ কিছুর আভাসে সে যেন গোপন না রাখে।

সম্ভব হলে বালেগ হওয়া পর্যন্ত, পুরুষালি ভাব আসা অব্দি অনাবাসিক পড়ান।

বাসায় সুন্নাহসম্মত পরিবেশ বানান। টিভি বের করে দেন, বদদীনী সামান বের করে দেন। ঘরের দীনী পরিবেশ তৈরি করেন।

আরও ভালো হয়, নিজে ৬-৯ বছর পর্যন্ত পড়ানোর মত অনলাইন মাদরাসায় বা বয়স্ক মাদরাসায় কিছু দীনী পড়াশোনা করেন। নূরানী কোর্স করে ফেলেন। উলামা হযরতগণ আমাদের জন্য 'হোম স্কুলিং সনদ কোর্স' খুলতে পারেন।

উলামাগণ কর্তৃক অনুমোদিত হোমস্কুলিং ফরমেট আসা সময়ের দাবি। হোমস্কুলিং সনদপ্রাপ্ত পিতামাতা বাচ্চাকে একটা বয়স পর্যন্ত বাসায়ই পড়াবে। এরপর মাদরাসা একটা পরীক্ষা নিয়ে তাদেরকে ভর্তি করে নেবে।

মক্কার উম্মুল কুরা ভার্সিটির প্রফেসর আবদুর রহমান সাহেব আমাকে জানিয়েছেন, উনি যখন কানাডা ছিলেন, উনার নিজ সন্তানসহ বিবিসাহেবার কাছে বিভিন্ন দেশের বহু মুসলিম সন্তান হিফজ করেছে। তার মানে ঘরেও হিফজ সম্ভব। পরিবারে একজন হাফেজ (পুরুষ/মহিলা) থাকলে বাসায়ই সম্ভব। আকাবিরীনরা অধিকাংশই বাসায়ই হিফজ করেছেন।

পিতা সন্তানকে সময় দেন। নিজের মত পুরুষালি বানান। সে যেন বাবার মত হবার স্বপ্ন দেখে।

মেয়েদের ব্যাপারে আরও সতর্ক হতে হবে। মেয়েদের শিক্ষা পুরোটাই হোমস্কুলিং এ নিয়ে আসতে হবে। সনদপ্রাপ্ত পিতামাতা হোমস্কুলিং করে মাদরাসা একটা পরীক্ষা নেবে। চাচা ভাতিজীকে মেশকাতের ইজাজাহ দিল, মামা/ভাই পড়ালো। সন্তানদের পড়ানোটাকে একটা কাজ বানান। মায়ের চোখের বাইরে একটা মেয়েশিশু তো এখন খোদ বাবার কাছেও নিরাপদ না, অন্যভাবে নিয়েন না। এটাই বর্তমান যুগবাস্তবতা। কষ্ট হলেও মেনে নিতে হবে। আল্লাহ সহজ করুন। আমাদের ঈমান-আমল-আওলাদ হিফাজত করুন। মেয়ে বাচ্চাকে গায়ে হাত তুলে মারবেন না। একটু বড় হয়ে গেলে ছোটবেলার মত আদর করবেন না। এক ঘরে অবস্থান করবেন না। মায়ের চোখের আড়াল যেন না হয়, আবাসিক মাদরাসায় দেয়া তো দূর কি বাত।

নিজেদের হোমস্কুলিং এর জন্য গড়ে তোলা ছাড়া অভিভাবকদের সামনে আর উপায় নেই। সত্যিই নেই। সামনের দিনগুলোতে আমার এই কথার বাস্তবতা আরও স্পষ্ট হবে।

সেবাগ্রহীতাদের চাহিদার উপর ভিত্তি করে সেবার কৌশল পরিবর্তন হয়। আপনারা অনাবাসিকে আগ্রহ দেখালে, অনাবাসিক প্রতিষ্ঠান গড়তে থাকবে। বালেগ হবার আগে ছেলেশিশুদের মাঝে নারী-সিফত থাকে। চপলতা, চিকন কণ্ঠ, কমনীয়তা, ত্বকের মসৃণতা। বিকৃতমনা বা বয়ঃসন্ধিতে আগেই পৌঁছানো আরেক বালক (যে কিনা নারীসিফতগুলোর প্রতি আকর্ষণ বুঝছে), সে নারীর অবর্তমানে বাচ্চার ঐ সিফতে আকৃষ্ট হতে পারে। আমার আপনার সন্তানও হতে পারে বিকৃতির ভিকটিম। সেটা প্রকাশ পেতে পারে, আবার গোপনও রয়ে যেতে পারে। সেটা আর উঠে আসবে না। আপনি হয়ে যেতে পারেন অভ্যস্ত সমকামীর পিতা। যুগকে বুঝুন, যুগের প্রভাবকে বুঝুন। এটা পীর-মাশায়েখের যুগ না[৯৯] , এটা পর্নোগ্রাফি আর সাতরঙের যুগ।

এটা না লিখে গেলে অপরাধী হয়ে যেতাম নিজের কাছে। এ থেকে বাঁচতে কী করণীয়, উলামায়ে কেরাম জানেন। আল্লাহ আমাদের সন্তানদের হিফাজত করুন।

---

[৯৯] অর্থাৎ, নেককারদের যুগ নয়। [শারঈ সম্পাদক]

পাঠ ১৬।। আর নয় সংশয়

আমাদের সমাজে এমন কিছু ধার্মিক মানুষের দেখা পায়, যারা ইসলামের কিছু বিষয় যেমন- নারী অধিকার, জিহাদ, হদ-কিয়াস ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে লজ্জা পায়। তাদের অন্তরে এরকম চিন্তা গেঁথে বসেছে যে- ইসলাম এক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত দেয় নি বা যা দিয়েছে তা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে ভিকটিম এর প্রাপ্য অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্যে বলতে পারে না- এই বিষয়গুলো ইসলামের ঠিক না। এই শ্রেণীর মানুষরা মুসলমান কেউ বৃত্তের বাইরে (কেন্দ্রচ্যুত) বের হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর বলে – এই দেখো ইসলাম তাকে এই অধিকার দিয়েছে। এই ধরনের মানুষরা সাধারণত নৈতিকতার ফ্রেইমওয়ার্ক সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না। ড্যানিয়েল হাকিকাতজু ভাইয়ের লেখাগুলো একটু জটিল এবং মুসলিমদের নৈতিকতার ফ্রেইমওয়ার্ক ভিত্তিক। তাই কেউ হঠাৎ করে কেউ তার লেখা পড়লে নাও বুঝতে পারেন, কয়েকবার উনার লেখা পড়তে হয়। তবে আপনি যদি নৈতিকতার ফ্রেইমওয়ার্ক সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তাহলে আমাদের বইয়ের উল্লেখিত হাকিকাতজু ভাইয়ের লেখাগুলো সহজ হবে। তাই মূল লেখাতে যাওয়ার আগে আমরা এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা নিয়ে নিব।

নৈতিকতার ফ্রেইমওয়ার্ক

ধরুন সাদা পাঞ্জাবী পরে আপনি কারো জানাযায় গেলেন। আপনার পোশাক নিয়ে দুজন মন্তব্য করলো।

প্রথমজন বললো : ও সাদা পাঞ্জাবী পরে এসেছে

দ্বিতীয়জন বললো : ও কালো পাঞ্জাবী পরে আসলে ভালো হত

এ দুজনের মন্তব্যের মধ্যে পার্থক্য কী? অনেক ধরণের পার্থক্যই আছে তবে আমরা মৌলিক একটা পার্থক্যের ওপর ফোকাস করবো।

প্রথমজনের কথা একটা statement of fact - সে জাস্ট একটা তথ্য জানাচ্ছে। নিরেট ইনফরমেইশান। এর সাথে আর কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া নেই। দ্বিতীয় জনের বক্তব্য হল তার ব্যক্তিগত মত, কোন ফ্যাক্ট না। জানাযাতে সাদার বদলে কালো পরে আসলেই ভালো? কালোই কি বেস্ট চয়েস নাকি রঙটা অফ-ওয়াইট কিংবা নীল বা অন্য কিছু হতে পারে?

এধরনের প্রশ্নের অনেক রকমের উত্তর হতে পারে। একেকজনের কাছে একেক রঙ ভালো লাগতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়জনের এ বক্তব্য কোন নিরেট তথ্য না। অনেক মতের মধ্যে একটা মত কেবল। প্রথম জনের বক্তব্য একটা পযিটিভ স্টেইটমেন্ট। দ্বিতীয়জনের বক্তব্য নরম্যাটিভ। যে বক্তব্য শুধুমাত্র কোন বাস্তব সত্য বা তথ্যকে তুলে ধরে সেটা পযিটিভ। অন্যদিকে নরম্যাটিভ বক্তব্য হল যা নির্দিষ্ট মত (যেমন ঔচিত্য) বা নৈতিকতা প্রকাশ করে।

এ পার্থক্যটা মাথায় রাখুন।

২. লক্ষ্য করবেন ইসলামের সাদা ও কালো চামড়ার (এবং অন্যান্য সব শেইডের) সমালোচকরা ঘুরেফিরে কিছু পয়েন্টে ফিরে আসে। ইসলামের বিরুদ্ধে তোলা তাদের আপত্তিগুলো এ মূল পয়েন্টগুলোর শেকড় থেকে বের হয়ে বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার দিকে যায়। এ শাখাপ্রশাখাগুলোর অনেকগুলোই আপনার চেনা। যেমন,

- *ইসলামে নারীকে পূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা দেয়া হয় না*
- *ইসলামে বাক স্বাধীনতা নেই*
- *সমকামীদের প্রতি ইসলামের অবস্থান উগ্র*
- *ইসলাম মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেয় না*
- *ইসলাম ধর্মের স্বাধীনতা দেয় না*
- *ইসলাম সাম্প্রদায়িক*
- *ইসলাম মানবাধিকার রক্ষার দিকে যথাযথ গুরুত্ব দেয় না*
- *নারীপুরুষের মেলামেশা ও যৌনতার ব্যাপারে ইসলামের ধারণা ব্যাকডেইটেড*
- *ইসলাম সহিংসতাকে সমর্থ করে", ইত্যাদি*

দেখবেন কাফিরদের মধ্যে যারা ইসলামের সমালোচনা করে অথবা মুসলিম পরিবারের জন্ম নিয়ে যারা নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী অথবা ইসলামবিদ্বেষী হয় ইসলাম মানার ব্যাপারে তাদের অস্বস্তি, আপত্তি ও অভিযোগের বিশাল একটা অংশ এগুলোর মধ্যে ঘুরপাক খায়। অনেকের সংশয় কিংবা বিদ্রোহের শুরুটা হয় এমন কোন চিন্তাকে কেন্দ্র করে।

অন্যদিকে এ অভিযোগগুলো করা হলে মুসলিমদের মধ্যে অনেকে প্রমাণ ব্যস্ত হয়ে যান যে ইসলামেও নারী অধিকার আছে, ইসলাম সবচেয়ে মানবিক ধর্ম, ইসলাম মানে শান্তি, ইসলাম সবচেয়ে সহনশীল - ইত্যাদি।

কিন্তু এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের দিকে মনযোগ দেয়া দরকার, যদিও

আমরা কেউই দেই না বললেই চলে। সেটা কী? দেখুন এই যে সমালোচনাগুলো করা হচ্ছে এগুলোর প্রতিটির পেছনে ভালো-মন্দের একটি নির্দিষ্ট ধারণা কাজ করছে। নৈতিকতার একটি নির্দিষ্ট ফ্রেইমওয়ার্ক থেকে এ আপত্তিগুলো তোলা হচ্ছে। আচ্ছা বলুন তো

নারীকে পুরুষের সমান অধিকার কেন দিতে হবে? কেন সমকামিতাকে বিকৃতি মনে না করে সমকামীদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করতে হবে? কেন একজন মুসলিম আর একজন অমুসলিমকে সমান মনে করতে হবে? নারীপুরুষের যৌনতার ব্যাপারে বর্তমান পৃথিবী যে অবস্থান গ্রহণ করেছে সেটাকে কেন ঠিক মনে করতে হবে?

কেন এটা খারাপ আর ওটা ভালো? কীসের ওপর ভিত্তি করে? কোন মাপকাঠি অনুযায়ী?

বিজ্ঞান? ওপরের একটা প্রশ্নের সাথেও বিজ্ঞানের কিংবা আরো নির্দিষ্টভাবে বললে নিরেট তথ্য, বাস্তবতা কিংবা ফ্যাক্টের কোন সম্পর্ক নেই।

ইনফ্যাক্ট বিজ্ঞান আপনাকে বলবে নারী এবং পুরুষের ব্রেইনের গঠন এবং ফাংশান ভিন্ন যা তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য উপযোগী করে। ফ্যাক্ট আপনাকে বলবে যুদ্ধ রাষ্ট্রের নামে হয়, দর্শনের নামে হয়, স্বার্থের জন্য হয়, গায়ের রঙের জন্যও হয়। যখনই মানুষের দু দলের মধ্যে মতবিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা যায় না এবং কোন এক বা উভয়পক্ষ মতবিরোধ মেনে নিয়ে সহাবস্থান করতে চায় না, তখন সংহিসতার মাধ্যমে এ মতবিরোধের ফয়সালা করতে হয়। এটা মানবজাতির ইতিহাসের এক ধ্রুব সত্য।

কেন বহুবিবাহ খারাপ আর 'সমকামী বিয়ে' ভালো? কেন মুরতাদের জন্য মৃত্যুদন্ড বর্বর কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহীর জন্য মৃত্যুদণ্ড জায়েজ? কেন আর কেউ শক্তি ব্যবহার করলে সেটা বেআইনি কিন্তু রাষ্ট্র করলে সেটা বৈধ? এরকম অনেক প্রশ্ন ওঠানো যায়। কেন এটা খারাপ আর ওটা ভালো? হতে পারে যে কোন কোন ক্ষেত্রে যেটাকে ভালো বলা হচ্ছে সেটা আসলেই ভালো। কিন্তু এ ভালোমন্দটা ঠিক করা হচ্ছে কীভাবে? বন্ধ ঘড়িও ২৪ ঘন্টায় দুবার ঠিক টাইম দেয় তাই বলে বন্ধ ঘড়ির ওপর ভরসা করা যায় না।

আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি তা হল, এসব সমালোচনার পেছনে নৈতিকতার একটি নির্দিষ্ট ফ্রেইমওয়ার্ক আছে। ভালোমন্দের একটি নির্দিষ্ট ধারণা থেকে এই উপসংহারগুলো বের হচ্ছে। সেই ফ্রেইমওয়ার্কটা কী? সেই মতাদর্শটা কী?

লিবারেলিযম, সেক্যুলার হিউম্যানিযম। এনলাইটেনমেন্টের গর্ভ থেকে বের হয়ে

আসা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি।

এ ফ্রেইমওয়ার্ক আমাকে যেসব উপসংহার দিচ্ছে সেগুলো নরম্যাটিভ, পযিটিভ না। আপনার কাছে মনে হতেই পারে যে জানাযার জন্য সবার গোলাপী রঙের ফতুয়া পরে আসা উচিৎ। কিন্তু আপনার মনে হওয়া আপনার মতকে ঠিক প্রমাণ করে না। দাবিকে সত্যে প্রমাণিত করতে হলে প্রমাণ লাগবে। সেক্যুলার হিউম্যানিযম বা লিবারেলিযমের উপসংহারগুলোকে ধ্রুব সত্য বলে আমার ওপর চাপিয়ে দেয়ার আগে আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে যে এটা নিছক আপনার মত না, বরং এটাই সত্য। ২+২ সমান ৪ এটা একটা ফ্যাক্ট। এটা অস্বীকার করা সম্ভব না। কিন্তু ২+২ = ২২ হওয়া উচিৎ ছিল, এটা নিছক দাবি।

৩. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, ভালোমন্দের এই ফ্রেইমওয়ার্ক কেন আমি মেনে নিতে বাধ্য? কয়েকশো বছর আগে ইউরোপের ঔপনিবেশক লুটেরারা নিজেরা নিজেরা ভেবে ভেবে যে মানদন্ড বানিয়েছে সেটা আমি মানবো কেন? নাস্তিক-ইসলামবিদ্বেষীরা প্রশ্ন করে – 'আমি স্রষ্টার অস্তিত্ব মেনে নেব কেন? কুরআনে আছে বলে আমাকে মানতে হবে কেন'?

অথচ এই একই স্ট্যান্ডার্ড তারা নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে না।

তুমি যেটাকে ভালো বলছো সেটাকে আমার ভালো বলে মেনে নিতে হবে কেন? তোমার দেয়া মানবাধিকার, অগ্রগতি আর উন্নতির সংজ্ঞাকেই কেন গ্রহণ করতে হবে? তোমাদের ঠিক করা ভালোমন্দের কনসেপ্টকে আমার কেন মানতে হবে তুমি আমাকে বলছো পুরো মানবজাতির ইতিহাস থেকে মাত্র দু-তিনশো বছরের অল্প একটা টাইম পিরিয়ড নিয়ে, ইউরোপের অল্প কিছু মানুষের চিন্তাভাবনাকে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিতে? এবং আমার পুরো দৃষ্টিভঙ্গিকে এই 'সত্যের' ওপর ভিত্তি করে সাজাতে? অথচ তোমার দাবিগুলোর পক্ষে কোন প্রমাণ তোমার কাছে নেই?

এটা হল পশ্চিমের চাপিয়ে দেয়া ন্যারেটিভের সবচেয়ে বড় বুদ্ধিবৃত্তিক অসততার একটি। পশ্চিম আমাকে বলে বস্তুবাদী প্রমাণ ছাড়া স্রষ্টার আনুগত্য করা যাবে না। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া মানুষের আনুগত্য করতে হবে। বিনা প্রশ্নে! দুঃখজনক বিষয়টা হল পশ্চিমের এ দাবিগুলোকে আমরা অনেকে নিজের অজান্তেই সত্য বলে মেনে নেই। এবং এগুলোকে সত্য ধরে নিয়ে এমনভাবে নিজেদের পরিচয় ও ইসলামকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি যাতে তা এই মানুষের বানানো ফ্রেইমওয়ার্কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আমরা ইসলামকে যখন সমর্থন করি তখনও সেটা পশ্চিমের শেখানো ভাষায় করি। সেক্যুলার হিউম্যানিযমের কাছে উপাদেয় করা চেষ্টা নিয়ে করি।

আর এটা; আমার ব্যাক্তিগত মতে, আমাদের সবচেয়ে বড় বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরাজয়।

মনে কত প্রশ্ন

সমকামিতার বিপক্ষে তর্ক[১০০]

'সমকামি বিয়ে'র ব্যাপারে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক আইনের প্রেক্ষিতে আমরা দেখেছি একদল মুসলিম স্কলার এই ব্যাপারে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। ইসলামি আইনে কেন এ ধরণের সম্পর্ককে নিষেধ করা হয়েছে তার যৌক্তিক আলোচনা আমরা খুব বেশি দেখতে পাইনি। পরিস্কারভাবেই, মুসলিমসহ অন্যান্য অনেককেই আজ বুঝতে বেগ পেতে হয় কেন ইসলাম বা অন্য কোনো ধর্ম সমকামিতাকে খারাপ চোখে দেখেছে। যেমনটি প্রায়ই বলা হয়- যদি দুইজন মানুষ পরস্পরকে কেবল 'ভালোবাসে' এবং সেই ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটাতে চায়- তাহলে তাঁরা একই লিঙ্গ কিংবা বিপরীত লিঙ্গ হওয়াতে কিই-বা যাই আসে? এতে খারাপের কি আছে?

এখানে 'খারাপের কি' তা বুঝতে হলে যৌনতা এবং নৈতিকতা সম্পর্কে কিছু বড়সড় অনুমিতি আছে যেগুলো ভিত্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে সেগুলোর উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই অনুমিতিগুলোর কারণে আজকের মানুষের জন্যে সমকামিতার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান,এর নেপথ্যে নৈতিক কারণ এবং সহজাত ফিতরাহ বোঝা প্রায় অসম্ভব। তবে, এগুলোর ব্যাপারে বলা হলে এই ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান প্রত্যয় জন্মাতে শুরু করে। অন্ততপক্ষে ইসলামের অবস্থান একেবারে ঘৃণাদায়ক, গোঁড়া, অতি রক্ষণশীল বলে অনুমিত হওয়ার অবসান হয়।

আমি এই লেখাটিতে আমার চিন্তাভাবনাকে নিজের সাথে একটি বিতর্ক হিসেবে উপস্থাপন করেছি। বেশ কিছু বছর ধরে, আমরা বিভিন্ন পরিচিত যুক্তি এবং সমকামিতার পক্ষে এতবেশি একপেশে কথাবার্তা শুনেছি যে ব্যাপারে চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের বেশিরভাগের মাথার ভেতরে গেঁথে গিয়েছে। এখানে ডিবেটটিতে প্রশ্নকর্তাকে একজন সমকামিতা সমর্থক হিসেবে রেখেছি, যে সমকামিতার ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। আর আমি একে একে সেই প্রশ্নগুলোর ইসলামিক দৃষ্টিকোণ জবাব দিয়েছি।

প্রশ্ন ১- প্রথমত, কিছু মুসলিম মনে করে ইসলামের সাথে সমকামিতার কোন সমস্যা

---

[১০০] মূল লেখার লিঙ্ক- https://muslimmatters.org/2015/07/20/debating-homosexuality/
(অনুবাদ করেছেন "মুসলিম স্কেপটিক কালেকশন পেইজ", সম্পাদনা করেছেন আসিফ আদনান ও শাকিল হোসাইন)

নেই। তাহলে কি ইসলামে আদৌ সমকামি কার্যকলাপ নিষেধ?

উত্তরঃ আমি বুঝতে পারছি যে, কিছু মুসলিম দাবি করার চেষ্টা করে যে, ইসলামী আইনে সমকামি কার্যকলাপ আদৌ নিষেধ নয়, যদিও এর বিপরীতে আলিমদের ইজমা [ঐক্যমত] রয়েছে। আমি এই দাবির কথা এখানে বলতে চাচ্ছি না, মূলত কারণ হচ্ছে এই দাবি নিজেই অগ্রহণযোগ্য এবং সংশয়পূর্ণ। এটাকে দাবি হিসেবে স্বীকার করাই অনেক কঠিন, তাই খণ্ডন তো আরও দূরের ব্যাপার। সাধারণত যারা দাবি করে যে ইসলামী আইনে সমকামি যৌনক্রিয়া জায়েজ, তাঁরা মূলত এটা করে ইসলামী আইন, আইনের মূলনীতি এবং ব্যাখ্যা করার মূলনীতিকে অযাচিতভাবে 'নতুন করে' সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমে। এই 'নতুন' সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে তাঁরা তাদের দাবিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে। তাই, এই মানুষ আর সেই মানুষের ভেতরে তফাৎ নেই, যে বলে- "আমেরিকায় চৌর্যবৃত্তি জায়েজ"; আর যখন তাকে এর বিপরীতে যথেষ্ট আইনি এবং ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট দেখানো হয়, তখন সে আমেরিকার ফেডারেল ল'তে ঐসব আইনি প্রাধান্যতা, ঐতিহাসিক দলিল এবং প্রচলিত আইনি পদ্ধতির প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করে বসে।

আইনি প্রাধান্যতা এবং ঐতিহাসিক সূত্রথেকে সমকামি ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে মুসলিম ফকিহ/আইনবিদদের ঐক্যমত আমাদের নিকট ফুটে উঠে। প্রায় দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে এমনকি একটি উল্লেখযোগ্য মতও পাওয়া যায় না যাতে সমকামি যৌনকর্মকে জায়েজ বলা হয়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে নিঃসন্দেহে কুর'আন এবং হাদিসের অনেকগুলো পরিস্কার ভাষ্য-যেখানে একই লিঙ্গের দুজনের মধ্যে সকল ধরণের যৌনকর্মকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, পাশাপাশি এই ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম], সাহাবীগণ [রা] এবং প্রথমযুগের [সালাফদের] কর্মনীতি দ্বারা এটি পরিস্কারভাবে ফুটে উঠে। অবশ্য কেউ যদি ফকিহদের ইজমার প্রামাণ্যতা এবং পাশাপাশি কুর'আন এবং সুন্নাহর পরিস্কার ভাষ্যকে আজকের দিনে দ্বীন ইসলামে অকার্যকরি মনে করেন, তাহলে যারা এগুলোকে মূল্যায়ন করেন তাদের মত আর এই ব্যক্তির মত যে মিলবে না— এখানে অবাক হবার খুব বেশি কিছু নেই।

এসবের পাশাপাশি, বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ এটাও খেয়াল করবেন যে, পূর্বের মুসলিম আলিমগণ বিভিন্ন ক্যাটাগরির সেক্স এবং লিঙ্গ নিয়ে কাজ করেছেন, যেগুলো বর্তমানে আমরা যে আধুনিক ক্যাটাগরিগুলোর সাথে পরিচিত, সেগুলোর সাথে মিলে যাবে। যেমন, মুতাখান্নাতুন, আমরাদ ইত্যাদি। আমরা এইসকল প্রকারভেদের ব্যাপারে নিচে আলোচনা করব, কিন্তু আমাদের মৌলিক প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে সমলিঙ্গীয়

যৌনসম্পর্কের নৈতিক নিহিতার্থ। এই প্রকারের আচরণ নিয়েই বর্তমান সমকামিদের অধিকারসংশ্লিষ্ট মুভমেন্টগুলো প্রধানত ব্যস্ত, আর একে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করে।

প্রশ্ন ২- এত কথা বাদ দাও। কেন কোনো ব্যক্তি অন্য কেউ পর্দার আড়ালে কি করছে তা নিয়ন্ত্রণ করবে? যদি দুইজন পুরুষ ঘরের ভেতরে যৌনক্রিয়া করতে চায়, এটা কিভাবে অন্য কারও মাথা ঘামানোর কারণ হয়?

উত্তরঃ সেকুলার আইনও কিছু ক্ষেত্রে মানুষ 'পর্দার আড়ালে' কি করে তা নিয়ন্ত্রণ করে। অনৈতিক এবং অপরাধঘটিত ব্যাপার স্যাপারের ক্ষেত্রে সেটা কি 'পর্দার আড়ালে' নাকি 'সবার সামনে' করা হচ্ছে- এই আলোচনাটা অপ্রাসঙ্গিক। এর একটি কারণ হচ্ছে পর্দার আড়ালে করা আমাদের অনেক কিছুরই একটা পাবলিক ইফেক্ট বা প্রভাব আছে।

একটা সোজাসাপ্টা উদাহরণ হচ্ছে- ড্রাগের ব্যবহার। আমরা ভেবে বসতে পারি, যদি এখন মানুষ ঘরে বসে নিজে নিজে হিরোইন খায়, সেটা তো তার ব্যাপার। কারণ দিনশেষে, হিরোইনে আসক্ত একজন কেবল নিজের ক্ষতি করছে। তাহলে জনগণ তাদের নিজেদের শরীরের সাথে কি করবে সেই ব্যাপারে কি করে কোনো রাষ্ট্র কথা বলার অধিকার রাখে? কিন্তু, কোনো এলাকার যথেষ্ট সংখ্যক মানুষযদি হিরোইনে আসক্ত হওয়া শুরু করে যে ঐ জনসমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ-ই 'নেশাখোর' দিয়ে ভরে যায়, তাহলে পরিস্কারভাবেই এটা ঐ সমাজের উপর সার্বিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এমনকি আমেরিকার 'ওয়ার অন ড্রাগ'-এর উপর রাজনৈতিক বিতর্কে লিবারেল এবং রক্ষণশীল উভয়দলই ড্রাগের নেতিবাচক সামাজিক প্রভাবের কথা স্বীকার করেছে। তাদের দ্বিমত শুধু হচ্ছে ড্রাগের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্যে কোন পদ্ধতি সবচেয়ে উত্তম— এটাকে পুরোপুরি অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলা, নাকি সরকারি প্রোগ্রামের মাধ্যমে ড্রাগ ব্যবহারকারীদের চিকিৎসা করা এবং জনগণের মধ্যে ড্রাগের ব্যবহার অনুৎসাহিত করা। উভয় দিক থেকেই, ড্রাগের ক্ষেত্রে লিবারেলরাও একমত যে মানুষ বন্ধ দরজার আড়ালে কি করছে, সেটা অবশ্যই রাষ্ট্রের উচ্চ-কর্তৃপক্ষের চিন্তার বিষয়।

আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে গর্ভপাত। বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে যে, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে গর্ভপাতকে বৈধ বানানোর সাথে অপরাধ হ্রাসের সম্পর্ক আছে। গবেষকদের মতে, এর কারণ হচ্ছে গর্ভপাতকে বৈধ করা নারীদের জন্যে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে, এর মানে হচ্ছে কমসংখ্যক 'অনাকাঙ্ক্ষিত'

সন্তানের জন্ম হচ্ছে এবং কমসংখ্যক বাচ্চাকাচ্চা ক্ষতিকর পরিবেশে বড় হচ্ছে, যা তাদেরকে অপরাধের দিকে ধাবিত করতে পারত।

লিবারেলরা প্রায়ই এই স্টাডিগুলো ব্যবহার করে দাবি করতে চায় যে গর্ভপাত হচ্ছে ভাল জিনিস, এবং সার্বিকভাবে সমাজে এটা ভাল প্রভাব ফেলতে পারে। গর্ভপাত আসলেই ভালো কি খারাপ এ নিয়ে আমাদের বিতর্ক নয়, এখানে আমাদের দেখানোর বিষয় হচ্ছে এই যুক্তির মাঝে নিহিত অনুমিতি, আর তা হচ্ছে নারীর গর্ভপাত করা কিংবা না করার মত একটি ব্যক্তিগত আচরণ পুরো সমাজের উপর প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। আর যদি আমরা স্বীকার করে নেই যে মানুষের ব্যক্তিগত আচরণ সমাজের উপর সার্বিকভাবে, অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি মানুষের উপর প্রভাব রাখার ক্ষমতা রাখে, তাহলে কেন-ই-বা এগুলো উচ্চ-কর্তৃপক্ষের নাক গলানোর মত বিষয় হবে না? যেমনটি আমি অন্যত্র আলোচনা করেছি, ইসলামের জিনা নিষিদ্ধ করার পেছনে এটা একটি যৌক্তিক কারণ হতে পারে। আমরা আবার অন্যভাবে এও কল্পনা করতে পারি যে, কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত আচরণের নেতিবাচক ফলাফল হতে সমাজকে রক্ষা করার জন্যে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, তবে এখানে মূল পয়েন্ট হচ্ছে, অন্ততপক্ষে কিছু নৈতিক প্রশ্নের সামনে এবং যখন ব্যাপারটা ব্যক্তিগত আচরণের নেতিবাচক প্রভাব থেকে সমাজকে রক্ষা করার মতো কিছু, তখন "পাবলিক" এবং "প্রাইভেট"-এর মধ্যে এই পার্থক্য করার ব্যাপারটা সহজেই অকার্যকর হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ৩- ঠিক আছে, বুঝলাম, কিন্তুড্রাগ নেওয়া এবং গর্ভপাত দুটো মাত্র উদাহরণ; আর এগুলোর সাথে কিভাবে সমকামিতা সম্পর্কিত? কিভাবে দুজন পুরুষের যৌনক্রিয়া করা পুরো সমাজের উপর সার্বিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে?

উত্তরঃ আচ্ছা, এই প্রশ্নের উত্তর আসলে নির্ভর করে সমকামিতাকে আপনি প্রথমত কীরূপ দৃষ্টিতে দেখেন। আপনার প্রশ্নের মধ্যে নিহিত ধারণা হচ্ছে সমকামি যৌনক্রিয়া সহজাত ভাবেই 'ক্ষতিকর নয়'। তবে সেটা সবাই বিশ্বাস করে না। উদাহরণস্বরূপ, মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে কিছু কিছু যৌনক্রিয়া সেগুলোর ক্রিয়াকারীর জন্য আধ্যাত্মিকভাবে, মানসিকভাবে এবং শারীর বৃত্তীয়ভাবে [physiologically] গভীরভাবে ক্ষতিকর, এতে সেই মানুষ মজা বা আনন্দ উপভোগ করলেও। যদি যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ এই ধরণের যৌনক্রিয়ার অংশ নেয়, তাহলে এটি পুরো সমাজের জন্যে চরিত্র এবং স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলবে।

বরং, উপরের ড্রাগ নেবার উদাহরণ থেকে এটা আলাদা কিছু নয়। ড্রাগ নেওয়াও

কিছু মানুষের জন্যে বেশ আনন্দদায়ক, সত্য কথা হলো যেহেতু ড্রাগ একজন মানুষকে নিস্তেজ/দুর্বল করে দেয়, তাই অনেক দুর্বল মানুষের ক্রমবর্ধিত প্রভাব সমাজের উপর নেতিবাচক ফলাফল আনবে।

প্রশ্ন ৪- কিন্তু ড্রাগ নেওয়া তো অবজেক্টিভলি [সত্তাগতভাবেই, আবেগের উপর নির্ভরশীল নয়] ক্ষতিকর, কিন্তু সমকামি সেক্সে তো সেই ব্যাপারটা খাটে না। কিছু মুসলিম বিপরীত বিশ্বাস করতে পারে, তবে সেটা হচ্ছে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস। তাই পাবলিক ল' কিংবা সার্বিকভাবে নৈতিকতার সাথে এর সম্পর্ক নেই।

উত্তরঃ সত্যি বলতে, ড্রাগ নেওয়াও কিন্তু মোটেও 'অবজেক্টিভলি' ক্ষতিকর নয়। লিবারেল, রক্ষণশীল, ধার্মিক, সেকুলারদের বেশিরভাগ যদিও একমত যে ড্রাগে আসক্ত হওয়া 'ক্ষতিকর', তবুও আমরা এমন কারও কথা কল্পনা করতে পারি যে আমাদের সাথে একমত নয়!

এমন কারও কথা কল্পনা করুন, যে সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে যে কঠিন ড্রাগে আসক্ত হওয়া আসলে একটি ভাল জিনিস। আমরা এই মানুষটিকে হয়ত জিজ্ঞেস করতে পারি, "তুমি কি দেখতে পাও না ড্রাগ কীভাবে আমাদের শরীরের ক্ষতি করছে এবং তাড়াতাড়ি মৃত্যুর দিকে নিয়ে যে পারে ইত্যাদি?"

কিন্তু আমাদের কল্পিত ড্রাগ সমর্থক প্রত্যুত্তরে পারে, "হ্যাঁ, অবশ্যই আমি ড্রাগের প্রভাবের কথা স্বীকার করি, কিন্তু আমি জাস্ট এই 'প্রভাবগুলোকে' খারাপ মনে করি না!" অর্থাৎ, অন্য ভাষায় বললে, বাহ্যিকভাবে ড্রাগের পরিস্কার 'প্রভাব' রয়েছে, এই ব্যাপারটি অবজেক্টিভ। কিন্তু এই 'প্রভাব'কে খারাপ মনে করা মোটেও অবজেক্টিভ নয়, বরং এটা মানুষের আদর্শগত চিন্তার উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের এই ড্রাগ সমর্থকতার মতকে ডিফেন্ড করার জন্যে আমাদের একটি গল্প শুনাতে পারে— যে গল্পে সে আমাদেরকে জানায় কিভাবে জীবন আসলে কোনো পদার্থ-প্রবৃত্ত আনন্দের মাঝে পার করে দেওয়া উচিত, কীভাবে আমাদের শরীরের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে(অনুভবে) অন্য দুনিয়ায় চলে যাওয়া, কীভাবে আমাদের জীবনের নশ্বরতা ও আত্মার চিরন্তন প্রকৃতি অবলোকন করার জন্য নিজের শরীরের আত্ম-ধ্বংস করা জরুরি, এবং কিভাবে বেশি আয়ু ও শারীরগত জীবন থেকে কম আয়ুর এবং আনন্দময় জীবনের স্থান অনেক বেশি উপরে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন মনে করুন, এটা শুধু একটি মানুষের দৃষ্টিকোণ নয়, বরং পুরো একটি সমাজের অথবা জনগণের।

অবশ্যই, ড্রাগ ব্যবহারের ব্যাপারে আমাদের সাম্প্রতিক ধারণার ভিত্তিতে বেশিরভাগ মানুষের কাছেই এই গল্প সামান্য গ্রহণযোগ্যতা পাবে না [যদি না ড্রাগটি অ্যালকোহল

হয়, কেননা এই ক্ষেত্রে আমাদের কল্পিত ড্রাগ সমর্থকের মত বিশ্বাস অনেক মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান]। কিন্তু দিনশেষে, এটা হচ্ছে কেবল শরীর, মন আত্মা, জীবনের প্রকৃতি, মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের ভিন্নমত। এমনকি সবাই যদি ড্রাগের অপব্যবহারের ব্যাপারে পর্যালোচনাপ্রসূত এবং সায়েন্টিফিক দিকগুলোতে একমতও হয়, তবুও এ ধরণের লোকজন এইসকল মেটাফিজিক্যাল[১০১] [অধিবিদ্যাগত] এবং মূল্যমান সম্পর্কিত প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে দ্বিমত করতে পারে।

এতদসত্ত্বেও, কোন লিবারেল সেকুলার রাষ্ট্রকে এই প্রশ্নগুলোর প্রতি নির্দিষ্ট অবস্থান নিতেই হবে, এবং তা নেওয়াও হয়। এরুপ রাষ্ট্র ড্রাগ ভোগ করাকে ক্ষতিকর মনে করে এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমেএকে দমন করার প্রয়াস চালায় বিভিন্নভাবে, এক- এটাকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে, অথবা মধ্যস্থতা, শিক্ষা, বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য উপায়ে। কিন্তু আমাদের সেই ড্রাগ অ্যাডভোকেটের কাছে এইসকল সরকারি প্রোগ্রামকে তার নিজের বিশ্বাসের উপর জোর খাটানো বলে মনে হবে; সেটা হতে পারে তাদের এই 'বিশ্বাসধারী'দের [অপরাধের জন্যে] বন্দি করার মাধ্যমে, অথবা তাদের বিশ্বাসেকে কলঙ্কিতকরা ও তাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর জন্যে পাবলিক ফান্ড ব্যবহারের মাধ্যমে।

সমকামি যৌনক্রিয়ার বিরুদ্ধে ইসলামিক আদর্শগত অবস্থানকেও একইভাবে তুলে ধরা যেতে পারে। কিছু মানুষ সমকামের মধ্যে কোন ক্ষতিই খুঁজে পান না, কিন্তু ইসলামী আইনের অবস্থান এখানে ভিন্নতর। সরলভাবে আমার পয়েন্ট হচ্ছে— কোন জিনিসকে 'ক্ষতিকর' বলে মনে করা হবে আর কোনটা করা হবে না— এই ব্যাপারটা পুরোপুরি আদর্শগত, অবজেক্টিভ থেকে অনেক দূরের ব্যাপার। আর যেহেতু কোন জিনিসটা নৈতিকভাবে জায়েজ বা আর কোনটা নাজায়েজ এবং এই ধরণের কাজ আপামর জনতার পর্যালোচনার বিষয় হবে কি-না— এসব ক্ষেত্রে ক্ষতির ব্যাপারে ব্যক্তির আদর্শ/মানদণ্ড বেশ গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমরা অতি সহজেই সমাকামি যৌনক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ফেলে দিতে পারি না।

প্রশ্ন ৫- এখনো পরিস্কার নয় যে কিভাবে সমলিঙ্গে যৌনক্রিয়া কিভাবে ক্ষতিকর, এমনকি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও? এত বড় কাহিনীর কি আছে?

উত্তরঃ যৌনক্রিয়া বা সেক্সে আসলেই বড় কাহিনীর ব্যাপার আছে, আর একা ইসলামই এমন ভাবে না। সকল সংস্কৃতিতে এর গুরুত্ব, এর অর্থ, যারা এতে লিপ্ত হয় তাদের উপর প্রভাব, এবং সমাজ, পৃথিবী এবং বাইরে এর প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত

---

[১০১] বিস্তারিত দেখুনঃ https://en.wikipedia.org/wiki/Metaphysics

বিশ্বাস-মালা রয়েছে। আধুনিক ওয়েস্টার্ন কালচারের কথা ভাবুন। যদি 'সেক্স' তেমন তাৎপর্যবহ কিছু না-ই হত, তাহলে আমরা এমন পরিসরে 'সেক্সুয়াল রেভোলিউশান' দেখতাম না। সেক্স যদি এত তুচ্ছই হত, তাহলে মানুষ আজকে মনুষ্যস্বাধীনতার সাথে সেক্সকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলত না।পশ্চিমের জনপ্রিয় কালচারের দিকে তাকান, দেখতে পাবেন 'সেক্স' এবং 'সেক্স আপিলের' প্রতি কি পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফ্রয়েড তো মানুষের সকল কাজকর্মকে প্রচ্ছন্ন যৌন তাড়না এবং অবসাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। আর ডারউইন সেক্সকে শুন্য হতে জীবনের এবং নতুন প্রজাতির আবির্ভাবের পিছে মূল ফোর্স হিসেবে বিবেচনা করে আরও উপরে, প্রায় পূজনীয় স্থান দিয়েছেন; কারণ সবচেয়ে ফিট হচ্ছে সেই জীব, যে প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি উৎপাদন এবং যৌনক্রিয়া করতে পারে।

ব্যক্তিগত, সামষ্টিক, শারীরিক, অধিবিদ্যাগত [metaphysical] পর্যায়ে সেক্সের নির্দিষ্টগুরুত্ব আছে, আর তাই স্বাভাবিকভাবেই সংস্কৃতি সেক্সকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে এবং সঠিক সীমারেখা এবং সঠিকভাবে প্রকাশের পদ্ধতি সংজ্ঞায়িত করবে। এই সীমারেখাগুলো লঙ্ঘন করা অবশ্যই সবসময় একটি বড় বিষয়। আর এটাই আমরা দেখি, প্রত্যেকটি সভ্যতা ও সংস্কৃতিতেই- এমনকি আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতাও-আমরা দেখব যে নির্দিষ্ট কিছু ধরণের সেক্সুয়াল অ্যাকটিভিটি যা যৌনকর্মকে সমস্যাস্বরূপ ও অনৈতিক এবং কিছু যৌনক্রিয়াকে তাদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত বড়সড় লঙ্ঘন হিসেবে বিশ্বাস করা হয়।

আর 'ক্ষতি'র ব্যাপারে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে- আমরা মুসলিম হই বা না হই, অথবা লিবারেল সেকুলার হই কিংবা না হই- কোনকিছু 'ভাল' বা 'খারাপ' হবার ব্যাপারে আমাদের অনুভূতি অনেক জটিল এবং তা কেবল শারীরিক ক্ষতির বাইরেও অনেকগুলো বিষয়ের সমন্বয় কিছুক্ষণ পূর্বে উল্লেখিত ড্রাগ ব্যবহারের ব্যাপারটি কেবল সেটারই একটি উদাহরণ ছিল। এটাও বিবেচনা করা দরকার যে, আমাদের সকল নৈতিক বিচার বা মোরাল জাজমেন্ট পুরোপুরি 'কনসিকুয়েনশালিস্ট' নয়, অর্থাৎ কোনো কাজের বাহ্যিক ফলাফলের উপর ভিত্তিশীল নয়। যেমন, যদি কোন মানুষ পাশবিকভাবে ধর্ষণ এবং খুন করার ব্যাপারে দিবাস্বপ্ন দেখেন এবং ফ্যান্টাসিতে ভুগেন, তাহলে কি এটা অনৈতিক হবে? এটা কেবল একটি দিবাস্বপ্নের মত, তাই এই সামান্য সময়ের কল্পনা থেকে কোন বাহ্যিক ফলাফল বা শারীরিক ক্ষতি হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের বেশিরভাগ মানুষই অন্ততপক্ষে এই ধরণের কাজে বিরক্ত অনুভব করবেন, যদিও আমরা কোনো বিশুদ্ধ কনসিকুয়েনটালিস্ট পরিভাষা দ্বারা এর চিত্র অঙ্কন করতে পারি না।

আর যখন আমরা বিশেষ করে যৌনতার নৈতিকতার দিকে দৃষ্টিপাত করি, সকল সভ্যতা-সংস্কৃতিতেই, এমনকি আধুনিক পশ্চিমা সংস্কৃতিতেও, কিছু নির্দিষ্ট বিশ্বাস রয়েছে যেগুলো কেবল বাহ্যিক ফলাফল এবং শারীরিক ক্ষতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে, প্রতিটি সংস্কৃতিই তাদের নিজেদের বিশ্বাসমালাকে সবার উপরে যৌক্তিক এবং যুতসই মনে করে এবং অন্য সকল সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গিকে কেবল একদিকে অযৌক্তিক, অতি রক্ষণশীল, লম্পট এবং অশ্লীল হিসেবে দেখে।

তাই যখন পশ্চিমা লিবারেলরা সমকামি আচরণের ব্যাপারে ইসলামের আপত্তিকে ভিত্তিহীন যুক্তিতে কেবল একটি সাংস্কৃতিক অলঙ্ঘনীয় [কালচারাল ট্যাবু] বিষয় হিসেবে দেখে, আবারঅন্যান্য সভ্যতা-সংস্কৃতিও পশ্চিমের বিধিবদ্ধ ধর্ষণের আইনকে একই তীর্যকভাবে দেখে। অথবা বহুবিবাহ, যিনা, জনসম্মুখে নোংরামি, যৌন হয়রানির মানদন্ড প্রভৃতির উপর সাম্প্রতিক পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারেও অন্যান্য সংস্কৃতির অধিকারীরা পশ্চিমাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকায়।এমনকি পশ্চিমের দেশগুলোতেও যৌনতার ব্যাপারে বিভিন্ন মানদণ্ড রয়েছে এবং তারা একে অপরের ভিন্নতাকে হয়দেখে অতি রক্ষণশীলতা হিসেবে, নাহয় নোংরামি হিসেবে। আর যখন আমরা দেখি যে কীভাবে কালের পরিক্রমায় সেকুলার মানদন্ডগুলো বদলে গেছে...

প্রশ্ন ৬- মশাই, এখানেই থামুন। এনলাইটেনমেন্ট, সেক্সুয়াল রেভোলিউশান এবং এখনকার সমকামি বিয়ের বৈধতা দেওয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের যৌনচর্চার প্রতি পশ্চিমের মনোভাব গত ৩০০ বছরে বদলেছে, এটা অবশ্যই ঠিক। এই পরিবর্তন হচ্ছে লিবারেল সহিষ্ণুতা এবং নৈতিক উন্নতির উপর ভিত্তি করে। আর অন্যদিকে, মুসলিমরা সেই ৭ম শতকেই পড়ে আছে।

উত্তরঃ পশ্চিমা উন্নতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, যুক্তি এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে তাদের সভ্যতা 'অতিনৈতিকতা' এবং অন্যান্য সব ধরণের সাংস্কৃতিক অলঙ্ঘনীয়তা ও পাশবিকতার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ের আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টে সমকামি বিয়েকে বৈধ করার মত জিনিস থেকেএই পরম বিজয়োল্লাস উদ্ভুত, যাকে অনেকেই সেক্সুয়াল রেভোলিউশান কিংবা এমনকি এনলাইটমেন্টের চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে দেখে। সে অনুসারে, বিশ্বাস হচ্ছে আমরা যৌনতার দিক থেকে স্বাধীন একটি সময়ে বাস করছি- এই সময়ে কোনো কিছুতেই সমস্যা নেই! যা ঠিক মনে হয় তাই-ই করো (যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা সকল পক্ষের 'সম্মতি'তে হয়)।লিবারেল ও রক্ষণশীল, উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিন্নতা মোতাবেক এই ধরণের অবস্থা হয় কল্পলোকের স্বর্গ, অথবা শেষ যুগের প্রতিচ্ছবি। এটা উদযাপন বা আতঙ্কের কারণ, যাই হোক না হোক, উভয় ঘরানার রাজনৈতিক পক্ষ একমত যে নৈতিক বাঁধাধরা এবং ট্যাবুর মত ব্যাপারগুলো

সামষ্টিকভাবে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। দুঃখজনকভাবে, মুসলিমরাও এই ন্যারেটিভ গ্রহণ করেছে।

তবে, ভাল করে খেয়াল করলে আমরা বুঝতে পারি বাস্তবতায় এই প্রগতিশীল রূপকথার ভিত্তি অনেক দুর্বল। সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত আমাদের কানে এই ধরণের কথা শুনতে অস্বাভাবিক লাগতে পারে। কিন্তু, আজ অবধি পশ্চিমা সমাজেও প্রচুর নৈতিক বাঁধা ধরা এবং ট্যাবু বিদ্যমান, যদিও সেগুলো সাধারণত এই ধরণের 'পরিভাষা'র মাধ্যমে পরিচিত নয়। মানুষ যেমনটা ভাবে, তার 'বিপরীতে' পশ্চিমা সমাজও কিছু বিষয়ে জাজমেন্টাল, এমনকি যৌনতার বিষয়েও। সেগুলো হুবহু একইভাবে এবং একই বিষয়েই নয়। এই চিল্লাপাল্লাগুলো শোনা যায় যখন লিবারেল সেকুলারিস্টরা ইসলামের কিছু যৌন নীতি নৈতিকতার ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দেখায়, যেমন- বহুবিবাহ, রাসুলুল্লাহ [সা]-র সাথে বিয়ের সময়ে আয়শা [রা]-র বয়স, তালাক [যে যুগে পশ্চিমে তালাক ট্যাবু ছিল], এমনকি বিয়ের মত ব্যাপারেও [যখন লিবারেল তাত্ত্বিকগণ বিয়ে আর দাসত্বকে এক চোখে দেখার ব্যাপারে উচ্চবাচ্য ছিলেন]। অবশ্যই, লিবারেল সেকুলারিস্টরা মনে করে তাদের এই ধরণের প্রতিক্রিয়ার পেছনে 'উত্তম' কারণ রয়েছে। এই অনুভূতিগুলোর বাইরে এসে দেখাটা তাদের জন্যে যতই কঠিন হোক না কেন, বিশ্ব ও জগত সম্পর্কে ভিন্ন কিছু বিশ্বাস ও অনুমতির দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি যৌননীতিমালা সুনিপুণভাবে যুক্তিসঙ্গত এবং নৈতিকভাবে শক্তিশালী। ইসলামের বাইরেও আরও অনেক সংস্কৃতি এবং ধর্ম রয়েছে যাতে এমন কিছু যৌনচর্চা এবং নিয়ম রয়েছে সেসকল নিয়ম যদি সাধারণভাবে প্রচলিত এবং পশ্চিমের রাডারে ধরা পড়ার মত জনপ্রিয় হত,যেভাবে গত ২০০ বছরে ইসলামি নিয়ম-নীতি ও মুসলিমরা পশ্চিমাদের চোখে পড়েছে তবে পশ্চিমা সেগুলো নিয়েও উচ্চবাচ্য করত ও তাদেরকেও তীর্যকদৃষ্টিতে দেখত।

বিভিন্ন সংস্কৃতিতে থাকা এই পার্থক্যসমূহের বাইরেও পশ্চিমা যৌন নৈতিকতার অন্যান্য জায়গায় আরও কঠোরতা দেখা যাবে। ভয়ারিজম[১০২] , অশালীন প্রকাশ, প্রকাশ্য হস্তমৈথুন, যৌন হয়রানির মত বিষয়ে পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ নিয়ে ভাবুন। (এগুলোর) বিরুদ্ধবাদিদের জন্যে শাস্তিস্বরূপ আইনি সিস্টেম চাপিয়ে দেওয়া পশ্চিমা যৌন আদর্শের এই পয়েন্ট গুলোকে জোরালো করে।

আইনি-বেআইনির ব্যাপারটা পাশে সরিয়ে রেখে, আমরা জেন্ডার-আইডেন্টিটি পলিটিক্স এবং পলিসিং-এর ক্রমবর্ধমান জগতে আরও বিভিন্ন ধরণের সেক্সুয়াল

[১০২] অন্যদের নগ্ন অথবা যৌনকর্ম দেখার মধ্যে দিয়ে যৌনতৃপ্তি লাভ করা।

রেসট্রিকশান বা বাঁধাধরা দেখতে পাই, যেখানে সামান্যতম এবং অগুরুত্বপূর্ণ জিনিসকেও ঘৃণা এবং তৎক্ষণাৎ নিন্দার স্বীকার হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাষা ব্যবহারনা করা- ক্লীবলিঙ্গের ক্ষেত্রে 'she', 'he/she' বা 'xe' এর বদলে 'he' অধিক ব্যবহার করা কারও কারও চোখে ধর্ষণের মত গুরুতর অপরাধ। যদিও এই ধরণের অপরাধ সাধারণত আইনিভাবে মোকাবেলা করা হয় না, তবে যেগুলো আইনিভাবে মোকাবেলা করা হয় না সেগুলো জনমতের কোর্টে বিচার করা হয়- যেখানে বিশাল ঝুঁকিতে আছে মানুষের মর্যাদা, ক্যারিয়ার, জীবিকার মত সব ব্যাপার।

এই উদাহরণগুলো থেকে আমরা দেখতে পাই যে পশ্চিমাদের সেক্সুয়াল মোরালিটি অনেকগুলো সূক্ষ্ম আদর্শ এবং 'ট্যাবু' দ্বারা পরিচালিত হয়, যদিও এইসকল নৈতিক বাঁধাধরাকে ট্যাবু মনে করা হয়না, অথবা সেক্সুয়াল অভিব্যক্তি বা ইচ্ছার রাজত্বের উপর বাঁধা হিসেবে দেখা হয় না। একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে, এগুলোকে মানুষের ইচ্ছেমতো নিজেদেরকে যৌনতা প্রকাশ করার স্বাধীনতার উপর চাপিয়ে দেওয়া বাঁধাধরা হিসেবে দেখা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, যখন মানুষকে তাদের লেখার মধ্যে একটি সামান্য 'সর্বনাম' নিয়ে ভাবতে হয়, এটা ইঙ্গিত করে আধুনিক পশ্চিমা সেক্সুয়াল মোরালিটির জগত কতোটা বিস্তৃত এবং জোর-খাটানো-স্বরূপ, যদিও একেঠিক উল্টোভাবে 'ফ্রি-ফর-অল' রুপে চিত্রায়ন করা হয়। তাই এই পশ্চিমা আধিপত্যবাদ এবং প্রগতির ধারণা যে 'স্বাধীনতা' এবং অবাধ যৌন স্বাধীনতার দিকে নিয়ে যায়— এটি ভুল প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ৭- যদি ধরেও নেওয়া হয় যে পশ্চিমা সেক্সুয়াল নর্মগুলো [আদর্শ/মানদণ্ড] সংখ্যায় বেশি, এগুলো ইসলামিক নর্মগুলো থেকে কম নিষেধাজ্ঞামূলক [restrictive]।

উত্তরঃ একজন মানুষের যৌনতার স্বাধীন রাজ্যে কোনো সেক্সুয়াল নর্ম 'বেশি বা কম বাঁধাধরা হওয়া' বলতে কি বুঝায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, আমাদেরকে আগে মানুষের 'কামনা'-র [desire] ব্যাপারে ধ্যান ধারণার প্রতি তাত্ত্বিকভাবে তাকাতে হবে।

কামনা কি? এই ব্যাপারে পশ্চিমা এবং ইসলামিক আলোচনার টেবিলে অনেক ধর্মীয় এবং দার্শনিক মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। আমাদের জন্যে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, আধুনিক পশ্চিমা ধারণা অনুসারে বিশুদ্ধভাবে অভিজ্ঞতালব্ধ যেকোনো কামনাই তৃপ্ত হবার যোগ্য। আধুনিক সাইকোলজি, যা ফ্রিউডিয়ান সাইকো-এনালাইসিস থেকে উৎসারিত, আমাদের বলে- একজন মানুষযদি সেক্সুয়ালি আরেকজন পুরুষকে কামনা করে, তাহলে এই কামনাকে দমানো 'ক্ষতিকর' এবং 'অত্যাচার' হবে। যদি

একজন কিশোর/কিশোরী আরেকজন কিশোর/কিশোরীকে কামনা করে, তাহলেও সেটা দমিয়ে রাখা ক্ষতিকর এবং অত্যাচার হবে। কিন্তু তবুও, যদি কোনো মানুষ তার পরিবারের মধ্যে কাউকে কামনা করে, তাহলে সেই কামনাকে অবশ্যই দমাতে হবে।

স্বাস্থ্য [ও সাধারণভাবে মানুষের সুখ] এবং কামনার তুষ্টির মধ্যে সংযোগ বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এভাবেই আধুনিক পশ্চিমারা যৌন স্বাধীনতা কে বুঝে থাকে। একমাত্র ন্যায়বান, বৈধ ও নৈতিক সিস্টেম হচ্ছে সেটাই যেটা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক 'বিশুদ্ধ' ও 'প্রাকৃতিক' কামনাকে পূরণ করার অনুমতি দেয় এবং একই সাথে, সকল প্রকার 'অবিশুদ্ধ' ও'অপ্রাকৃতিক' কামনাকে যেগুলো নিঃসন্দেহে এর সম্পাদনকারী এবং সম্ভাব্য ভিক্টিমদের ক্ষতির দিকে নিয়ে যাবে, সেগুলোকে নিষেধ করে।

এই দিক থেকে দাবি করা হয় যে, পশ্চিমা যৌন মানদণ্ডগুলো সবচেয়ে বেশি 'ন্যায্য' এবং 'স্বাধীনতাস্বরূপ' কারণ এগুলো মানুষের প্রাকৃতিক কামনাকে বিবেচনায় আনে এবং সেগুলো বাস্তবায়নের অনুমতি দেয়। অন্যদিকে ধর্ম-কেন্দ্রিক সেক্সুয়ালিটি 'অন্যায্য' এবং 'বাঁধা-ধরামূলক' কেননা এগুলো মানুষের প্রাকৃতিক কামনাগুলোকে স্বীকার করলেও কিছু কিছু কামনাকে সৃষ্টিকর্তার জন্য দমন করতে বলে।

এই যুক্তির বিপক্ষে অনেককিছু বলা যেতে পারে, যেমন- কিভাবে পশ্চিমা চিন্তাধারা বিশ্বাস করে তারা আবিষ্কার করে ফেলেছে যে "কোন জিনিসগুলো মানুষের জন্যে কামনা করা ন্যায়সিদ্ধ ও প্রকৃতিসম্মত"। মানুষের অত্যাবশ্যক প্রকৃতি কি এ ধরণের অধিবিদ্যাগত প্রশ্নের উত্তর তাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে এর উত্তর দেওয়া যাবে না। ল্যাবরেটরীর পরীক্ষা আমাদের জানায় না মানুষের প্রকৃতি 'কি বা কতোটুকু' এবং কোন ধরণের কামনাগুলো বাস্তবিক অর্থেই 'প্রাকৃতিক'। আর পশুসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করে তাদের সাথে কিয়াস বা তুলনা করে মানুষের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে চাওয়া ন্যাচারালিস্টিক ফ্যালাসি ছাড়া আর কিছু নয়।

এভাবে, মানুষের কামনার ব্যাপারে প্রচলিত লিবারেল চিন্তাধারা মানব-প্রকৃতির কোনো বলিষ্ঠ এবং বস্তুনিষ্ঠ তত্ত্বের উপর ভিত্তিশীল নয়। আর এরকম থিওরি ব্যতীত "ইসলামিক বা অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে লিবারেলদের যৌন রীতি-নীতি মানুষের প্রাকৃতিক কামনার অধিক কাছাকাছি"- এমন দাবির ভিত্তি নেই।

অন্যদিকে, ইসলামিক অধিবিদ্যায় আলাদা তত্ত্ব আছে। ইসলামী ইলমি আঙ্গিনায় মাঝেমধ্যেই মানুষের স্বরূপ/প্রকৃতি, তাঁর কামনা, মহাবিশ্ব এবং সৃষ্টিকর্তার সাথে তাঁর সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আর এজন্যে জ্ঞানতত্ত্বের যে রাস্তার উপর আলিমরা নির্ভর করেন তা হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহি-অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা এবং তাঁর রাসুল

[সা] এইসব ব্যাপারে কি বলেছেন সেগুলো এবংপাশাপাশি ফিতরাহর ধারণা। অবশ্যই অমুসলিমরা এইসব জ্ঞানের উৎসের ব্যাপারে সংশয়বাদি হতে পারে। তবে অন্ততপক্ষে মুসলিমরা তো একে জ্ঞানের উৎস বলে দাবি করে, যেখানে লিবারেল সেকুলারর কোনো সংগতিপূর্ণ এবং মূলনীতিবদ্ধ জানার উৎস ছাড়া দিক হারা ভাবে ভেসে বেড়ায়

পোষ্ট-মডার্নিজম অন্ততপক্ষে এই আধুনিক জ্ঞানতত্ত্বের পতন এবং এর ফলাফলস্বরূপ নিহিলিজমের ব্যাপারে বলিষ্ঠ। কিন্তু অন্যদিকে আমরা দেখি, লিবারেল সেকুলারিজম ক্রমাগত অস্বীকার করেই যাচ্ছে, জোর দিচ্ছে যে তাদের লিবারেলিজম এবং সেক্সুয়াল মোরালিটি মানুষের প্রকৃতির সাথে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এরপর 'মানুষের প্রকৃতি কি' এই বিষয়টিকে অধিবিদ্যাগতভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। একইভাবে, লিবারেল এবং সেকুলাররা দাবি করে যাচ্ছে যে, ইসলাম এবং অন্যান্য ট্র্যাডিশনাল ধর্মগুলো মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ এবং অত্যাচারী [ইত্যাদি]— কিন্তু এসব বড় বড় দাবির পেছনে জোর দেবার মত 'মানব প্রকৃতি'র ব্যাপারে তাদের কোন সুনির্দিষ্ট বয়ান নেই। তাহলে কিভাবে লিবারেল সেকুলাররা ইসলামের বিপক্ষে "সমকামিদের অত্যাচার [oppress]'" করার যে দোষ দেয়, সেটাকে কিভাবে গুরুত্বের সাথে নেওয়া যেতে পারে?

প্রশ্ন ৮- দেখুন, মানুষের 'কামনা'র ব্যাপারে ইসলামের কোনো তত্ত্ব আছে কি নেই, এসব ব্যাপার নিয়ে আমার মাথাব্যথা নাই। আমি যা জানি তা হচ্ছে সমকামিরা একই লিঙ্গের সঙ্গিকে 'কামনা' করে। এই ব্যাপারে তাদের কিছু করার নেই/উপায় নেই। তাই তাদের তৃপ্তি লাভ করার পথরোধ করা অমানবিক। আমাদের কি তাহলে উচিৎ তাদের জন্যে যৌনতৃপ্তিহীন জীবন সমর্পণ করা? কি ধরণের ধর্ম মানুষকে এভাবে অত্যাচার করে?

উত্তরঃ প্রত্যেকেরই কিছু কামনা রয়েছে যেগুলো পূরণ করা যায় না, সেটা হতে পারে সামাজিক কারণে, অথবা ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে অথবা শারীরিক কারণে। এটা মানুষেরই একটি অংশ। এখন, আমরা এই 'কামনাগুলোকে' পূরণ করতে না পারার ব্যাপারটিকে কীভাবে দেখব, এটা নির্ভর করবে যৌনতার নৈতিকতার ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাসের উপর। কেউ যদি একেবারে পথচারির চোখের সামনে বসে হস্তমৈথুন না করলেতৃপ্ত হতে না পারে, তাহলে সেই মানুষকে 'যৌনতৃপ্তি ছাড়া জীবন' সমর্পণ করতে আমাদের সমস্যা হবে না। ঐ ব্যক্তি কামনা পূরণ করতে না পারায় নিজে হয়তবা হতাশ ও বিধ্বস্ত হতে পারে, কিন্তু সে নিজেও এমনকি এই হতাশাকে 'অত্যাচার' হিসেবে দেখবে না। এর কারণ হচ্ছে সে এমন একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশে বাস করছে যেখানে জনসম্মুখে মৈথুন করার প্রতি ভ্রূকুটি করা হয়।

সামাজিকভাবে প্রভাবিত হয়ে সে বুঝ পেয়েই বড় হয়েছে যে এই ধরণের আচরণ সঠিক নয় এবং এগুলো ভদ্র মানুষের কাজ নয়। নৈতিকতা, ভদ্রতা, সামাজিক সংযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ তাদের তাড়না নিয়ন্ত্রণ করতে এবং নৈতিক অভ্যাস এবং প্রথা-আচারকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে সক্ষম হয়। তাই জনসম্মুখে হস্তমৈথুন করতে চাওয়া ব্যক্তি এই শৃঙ্খলায়ন করে, কারণ সে বুঝতে পারে যে এই কাজ আবেগি এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যে কোনো সত্যিকারের এবং বস্তুনিষ্ঠ কোনো 'প্রয়োজন' নয়। বাস্তবতায়, এই তাড়নাগুলো খুব সম্ভবত পুনরাবৃত্তি এবং শক্তির দিক থেকে ধীরে ধীরে কমে যাবে এবং একসময় হয়ত পুরোপুরি চলে যাবে। আর সকলেই, এমনকি ঐ মানুষটি নিজেও এই ব্যাপারটিকে 'ভাল' হিসেবেই দেখবে।

এখানে পয়েন্ট হচ্ছে- আমরা কোন 'কামনা'গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবো এবং কোনগুলোতে সমস্যা নেই, এগুলো মৌলিকভাবে আমাদের নৈতিক দায়বদ্ধতার উপর নির্ভর করে। শুধু তাই নয়, আমাদের আদর্শিক দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে এসব কামনার ব্যাপারে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বদলে যাবে। আজকে যাদের ভেতরে সমলিঙ্গে আকর্ষণ আছে তাদের অনুভব হতে পারে সমকামি যৌনক্রিয়া করতে না পারলে জীবন ক্রমাগত হতাশার এবং কষ্টের হয়ে দাঁড়াবে। এর পেছনের বড় কারণ হচ্ছে, বর্তমান পশ্চিমা নৈতিক দায়বদ্ধতা আমাদের সেখানেই নিয়ে যায়। ভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং ভিন্ন নৈতিক ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে থাকা মানুষদের মধ্যে সমকামের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অনেক আলাদা আলাদা হবে। এই ব্যাপারটা নৃতত্ত্ববিদ্যা এবং ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে।

তাছাড়াও, মাইকেল ফুঁকো, পিয়েরে বরডিউ, যুডিথ বাটলার, তালাল আসাদ এবং অন্যান্য পশ্চিমা দার্শনিকরা দাবি করেছেন যে আমাদের কামনা নির্ণয়ে এবং গড়নের পেছনে মূল্যবোধ এবং কামনার অভিজ্ঞতাগুলো এক ধরণের সিদ্ধান্তকারী ভূমিকা পালন করে। কামনা এবং মূল্যবোধ পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এটা শুনতে সহজাত-পরিপন্থি লাগতে পারে, কারণ আমরা সাধারণত মনে করি যে আমাদের গভীরতম তাড়নাগুলো পুরোপুরি 'প্রাকৃতিক' এবং 'বিশু'দ্ধ- অর্থাৎ অন্য কোনো কিছুর 'প্রভাবের ফলাফল' নয়। কিন্তু, বাস্তবে, কোন কামনাগুলো প্রথমেই আমাদের চেতনায় ফুটে উঠবে, সেখানে বাহ্যিক প্রভাবকগুলো 'গভীরভাবে' ভূমিকা রাখতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, যে বাচ্চাগুলোকে শেখান হয় যে জনসম্মুখে হস্তমৈথুন করা খারাপ, তার ভেতরে সেই অনুজ্ঞা অন্তরে বদ্ধ হবে, যেটা জীবনে পরবর্তীতে ফলাফলস্বরূপ

তার চিন্তা এবং কামনায় প্রভাব রাখবে, প্রায়শই এই 'তাড়না'কে এমনকি জেগে ওঠা থেকেও থামিয়ে রাখবে। আর যদি এটা জেগে উঠে, তখন এই অভিজ্ঞতাটা হবে একজন কাম-লালসাপূর্ণ মানুষের 'উচ্ছৃঙ্খলতা'— যেটাকে অবশ্যই সামাজিকতা, ভদ্রতা, নৈতিকতা এবং অনুরুপ বিষয়গুলোর খাতিরে দমিয়ে রাখা হবে। অবশ্যই, বাচ্চাদেরকে একেবারে সরাসরি বা পরিস্কারভাবে এগুলো শেখানোরও প্রয়োজন নেই। যদি এই ধরণের কাজগুলো কোন সমাজে অন্ততপক্ষে 'খোলামেলাভাবে' না করা হয়, তাহলে এটাই বাচ্চাদেরকে সামাজিক এবং সুশৃঙ্খল করতে অনেক বিশাল ভূমিকা পালন করে। একইভাবে, বাচ্চাদের যদি শেখানো হয় যে জনসম্মুখে 'হস্তমৈথুন' করা সাধারণ ও সঠিক কাজ, এতে কোনো সমস্যা নেই ইত্যাদি, তাহলে তাদের মধ্যে পূর্বে এই ধরণের কাজের প্রতি প্রণোদনা বা কামনা না থাকলেও পরে এই ধরণের কামনাআসতে পারে। [উল্লেখ্য, 'সামাজিক অনুমোদন'ই সোশ্যালাইজেশন বা সামাজিকায়নের জন্যে একমাত্র রাস্তা নয়। "কোনো মানুষ জনসম্মুখে-হস্তমৈথুন-বিমুখ সংস্কৃতিতে বড় হতে পারে এবং বড় হয়ে এই কাজ করার কামনায় মানসিকভাবে বিশাল কষ্ট অনুভব করতে পারে" এই ব্যাপারটা আর "এই ধরণের কামনাগুলো সামাজিকভাবে নির্মিত-এ দুটোর মধ্যে আপাত সংঘর্ষ নেই। বরং, আশা রাখা যায় যে সংস্কৃতিগুলোতে কোনো নির্দিষ্ট ট্যাবুর উপর নিবিষ্ট এবং স্থির হয়, সেখানে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ সেটাকে লঙ্ঘন করবে কিংবা লঙ্ঘন করতে তাড়না অনুভব করবে। 'ফল' যত বেশি নিষিদ্ধ হবে, মানুষ তত বেশি সেটাকে খাওয়ার 'তাড়না' অনুভব করবে। যেখানে, যদি সেই ফলটাই সেখানে না থাকতো, কিংবা সেটা নিষিদ্ধ না হত, কিংবা যদি সেটাকে 'ফল' হিসেবে না ডাকা হত ইত্যাদি, তাহলে কমসংখ্যক মানুষের সেই 'কু-তাড়নার' অভিজ্ঞতা হত।]

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যেঅভিপ্রায় ও কারণের সহকারে কিছু কামনা কীভাবে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট দ্বারা বদ্ধমূল হতে পারে। মানুষ যা অনুভব করে সেসকল অনুভূতিকে কীভাবে সমাজ লক্ষনীয় ও উল্লেখযোগ্য করে তুলতে পারে, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমে জোরালো করে তুলতে পারে এবং পরিশেষে মানুষ এটাকেই তার 'গভীর' এবং 'সহজাত' প্রবৃত্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারে, এভাবে সে তার গভীর ও সহজাত প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য মার্কেটে মৈথুন করার দাবী করে। এভাবে সামাজিকায়ন আমাদের শারীরিক ক্ষুধাকে অনেক তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

অবশ্যই, এর মানে এই না যে সকল মানবীয় কামনাই পুরোপুরিভাবে সামাজিকায়ন থেকেই উদ্ভূত হয়, যদিও ফুঁকোর মত উত্তর-আধুনিক দার্শনিক সেই পর্যন্তও মত দিয়েছেন। তবে, ইসলাম বলে মানুষের কিছু কামনা পুরোপুরি প্রাকৃতিক, যেভাবে

আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ইসলামে এটাও স্বীকৃত যে মানুষের 'প্রাকৃতিক বা সঠিক ধরণ' দূষিত, পুনর্গঠিত হতে পারে, আবার দূষিত হয়ে গেলে তাকে পুনরুদ্ধারও করা সম্ভব।

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকেপরস্পরের প্রতি সঙ্গম করার কামনার ক্ষেত্রে একই লিঙ্গে আকর্ষণ 'প্রাকৃতিক' নয়। কুর'আনে এসেছে- "যখন সে [লুত] স্বীয় সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি ? তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমন কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।" [৭-৮১]

তবে এ-ও বলতে হয়- "কোনো পুরুষের অন্য পুরুষকে হ্যান্ডসাম মনে হওয়া" অথবা "কোনো নারীর অন্য নারীকে সুন্দর মনে হওয়া"- এই দিক থেকে সমলিঙ্গের মানুষকে আকর্ষণীয় মনে হওয়া 'অ-প্রাকৃতিক' নয়। তেমনি, কোনো পুরুষ যদি নারী থেকে অন্য পুরুষের সঙ্গকে অধিক পছন্দ করে এবং তাদের সাথে সামাজিক-কথাবার্তা চালাতে বেশি ভাল লাগে— এটাও 'অ-প্রাকৃতিক' কিছু নয়। এরপরও, একটা অতিমাত্রায় যৌনায়িত সমাজে বাচ্চা এবং বড়দের সামাজিকায়নের মাধ্যমে যেভাবে এই ধরণের প্রাকৃতিক অনুভূতিকে 'সমকামি যৌনক্রিয়া'র সুপ্ত চিহ্ন হিসেবে ব্যাখ্যা করতে শেখানোর ব্যাপারটা কল্পনা করা তেমন কঠিন নয়। বিশেষ করে যেখানে ফ্রয়েডের যৌনতত্ত্বের তত্ত্ব ধারণ করা হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে বাস্তব—যেখানে মানুষের সকল মানসিক তাড়না এবং সচেতন চিন্তাভাবনা কোনো-না-কোনোভাবে কিছু আগাম 'অডিপাল ফ্রাসটেশন' অথবা কিছু মনস্তাত্ত্বিক-যৌন অভিজ্ঞতার সাথে জড়িত। এমনকি বাচ্চাদের দুগ্ধপান করানোর মত অ'যৌন' জিনিসে যৌনতার সংযোগ আছে বলে মনে করা হয়। এরুপ সমাজে, এই ধরণের প্রাকৃতিক, যৌনতাহীন ভাব প্রবণতাকে যৌনতার আলোকে তুলে ধরা এবং এমনভাবে জোর দেওয়া হতে পারে যে কোনো মানুষ জোরালোভাবে অনুভব করতে পারে এবং তার ভেতরে প্রত্যয় জন্মাতে পারে যে সে সমলিঙ্গের প্রতি 'কামনা' অনুভব করে এবং সে একজন সমকামি- এই আবিষ্কারের ব্যাপারে সে খুশি হোক বা না হোক। সেই সমাজের আদর্শগত এবং মেটাফিজিক্যাল ধারণার পাশাপাশি মানসিক, আবেগি অথবা বিকাশগত বিষয়সমূহ "মানুষ কিভাবে নিজেদেরকে তাদের কামনার সাথে সম্পর্কিত করে দেখবে"—সেই পদ্ধতিতে বিশাল প্রভাব রাখতে পারে।

আর প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামিক আধ্যাত্মিকতা এবং অধিবিদ্যা মানুষের কামনার বিকাশ এবং বিবর্তনকে প্রায় একই চোখে দেখে— নিচে আমরা সেটা দেখব।

প্রশ্ন ৯— "দুইজন মানুষ যদি পরস্পর রাজি হয়ে কোনো যৌনকর্ম করতে চায়, তাহলে তাদের এর মধ্যে নৈতিকভাবে আপত্তির কিছু নেই"—এটা বুঝতে আমাদেরকে আধ্যাত্মিকতা বা অধিবিদ্যার নোংরা ব্যবসায়ের মধ্যে যাবার কোনো দরকার নাই। ইসলাম যে মানুষকে পরস্পরের সম্মতিতে আচরণে বাঁধা দেয়, এটাই এই ধর্মের জুলুমের জন্যে যথেষ্ট প্রমাণ।

উত্তরঃ সত্যি বলতে, 'সম্মতি' জিনিসটা স্বয়ংই অধিবিদ্যাগত ধারণায় পূর্ণ।

তাত্ত্বিকভাবে, 'সম্মতি'র ধারণা খুলে ব্যাখ্যা করা বেশ কুখ্যাতভাবেই কঠিন। যেমন, আজ অবধি নারীবাদীরা 'সম্মতি'কে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে ঝামেলায় পড়ছে যাতে একবারেই সকলের জন্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে কোন জিনিসটা 'ধর্ষণের আওতায়' পড়বে। ধর্ষণ, প্রায় সকল মানুষের জন্যেই সবচেয়ে বড় যৌনঘটিত অপরাধ। তাই পশ্চিমা যৌনতা কেন্দ্রীক মূল্যবোধ এবং লিবারেল চিন্তায় এটি অনেকভাবেই যৌনঘটিত অনৈতিকতার 'প্রতীক'স্বরূপ। আর অবশ্যই, ধর্ষণ অনৈতিক কারণ সম্মতি না থাকার কারণে। একইসাথে, যখন কোনো অচেনা মানুষ অন্য কাউকে অনিচ্ছাকৃতভাবে যৌন নির্যাতন করে— এক্ষেত্রে সম্মতির অর্থ এবং নৈতিকতার বিচারে এই কাজের সাথে সম্মতির সম্পর্ক দিনের আলোর ন্যায় পরিস্কার। কিন্তু অন্যান্য যৌন আচরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য দৃশ্যপটে সম্মতির অর্থ এবং সম্পর্ক ততটা পরিস্কার নয়।

উদাহরণস্বরূপ, কিছু চরমপন্থী নারীবাদীরা দাবি করে যে, একজন নারী এবং একজন পুরুষের মধ্যে যৌন-মিলন পুরোপুরি 'সম্মতিস্বরূপ' হতে হলে ঐ পুরুষকে পুরো সময় ধরে ক্ষণে ক্ষণে অনুমতি চাইতে হবে, কেননা একাজের যেকোনো মুহূর্তে তার সঙ্গী নারী হয়ত মন বদলাতে পারে এবং আর এগোতে চাইতে না পারে। ফলে তাহলে এই'বৈধ' মিলনও ধর্ষণে রূপান্তরিত হবে।

এই দিক থেকে দাবি করা হয়, সেক্স পুরোপুরিভাবে সম্মতিপূর্ণ এবং নৈতিকভাবে সঠিক হবার জন্যে প্রতিটি কাজের আগেই জিজ্ঞেস করতে হবে "এটা কিঠিক আছে?" আর এর উত্তরে সঙ্গী/সঙ্গিনীর পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেতে হবে। সাধারণভাবে বিবেচ্য কোনো যৌনমিলনের মধ্যে যেকোনো অবস্থান অথবা কোন স্পর্শবা চুম্বন কিংবা নড়াচড়ার পরিবর্তনের আগে একজন সঙ্গী/সঙ্গিনীকে থামতে হবে এবং অপরজনের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পেতে হবে। [তবু আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে আধুনিক পশ্চিমের "ক্যালিগুলান অনুমোদন প্রক্রিয়া" (calligulan permissiveness) থেকে ইসলামিক আইন যৌনতার নিয়মের ক্ষেত্রে অধিক স্বৈরতান্ত্রিক!]।

"বিয়ের' মত জিনিস দাসত্বপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ষণ ব্যতীত অন্য কিছু কেন হবে"—এটা ভেবে অন্যান্য নারীবাদী এবং লিবারেল তাত্ত্বিকগণ অবাক হন। কারণ দিনশেষে, আধুনিক সমাজেও যেভাবে পুরুষতান্ত্রিকতা বিদ্যমান এবং যেভাবে পুরুষরা গড়ে সম্পদ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক থেকে নারীদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, কীভাবে কোনো নারী অর্থবহ 'সম্মতি' জ্ঞাপনের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ 'স্বাধীন' হতে পারে?

নারীবাদের 'ভেতরে'র তর্কের বাইরেও, অন্য কিছু যৌন আচরণ আছে যেখানে 'সম্মতি'র তাৎপর্য এবং নৈতিকতার সাথে এর সংযোগ সুস্পষ্ট নয়। ভয়ারিজমের কথাই ভাবা যাক। মনে করুন, কোনো পুরুষ নারীদের ড্রেসিং রুমে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে কিন্তু সেই নারীরা কখনোই এই ব্যাপারে জানতে পারছে না। যেহেতু সেই নারীরা কখনোই জানতে পারছে না, তাই 'সম্মতি-ভিত্তিক যৌন নৈতিকতা অনুসারে এই লোকের কাজটি খারাপ। কিন্তু একেবারে সেকুলার বস্তুবাদি দৃষ্টিকোণ থেকে এই লোকের লুকিয়ে লুকিয়ে তাকানোর ফলে ঐ নারীগুলোর উপর কি কোনো প্রভাব পড়ে? পরিস্কারভাবেই বলা যায় এতে করে সেই নারীদের শারীরিক কিংবা মানসিক কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, কারণ তাঁরা তো তা জানতেই পারছে না! কেউ এখানে বলতে পারে, আচ্ছা, ঐ লোকটি এটা রেকর্ড করে তার বন্ধুদের নিকট ছড়িয়ে দিতে পারে, যারফলে সেই নারীদের সামগ্রিক সম্মানে আঘাত আসবে। কিন্তু যুক্তির খাতিরে, ধরে নেওয়া যাক সেই লোক রেকর্ড করছে না এবং সে দেখেই উপভোগ করে। এক্ষেত্রেও খুব সম্ভবত আমরা বিশ্বাস করবো যে এটা নৈতিকভাবে 'ভুল', কিন্তু কেন? সেকুলার বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে 'সম্মতি'র মধ্যে এমন কি আছে যে এটা শারীরিক বা মানসিক ক্ষতির গণ্ডির বাইরে গিয়েও কাজ করতে পারে? সম্মতির মধ্যে কি কোনো ধরণের অধিবিদ্যাগত ও অতিপ্রাকৃত তাৎপর্য আছে যা কোনো শারীরিক ফ্যাক্টর দ্বারা ধরা পড়ে না? তাহলে এর মানে কি ঈদ দাঁড়ায় যে, এমনকি সেকুলার যৌনতা নির্ধারণকারী মানদন্ডের মধ্যেও অধিবিদ্যাগত উপাদান আছে, যেহেতু তারা সম্মতি চাচ্ছে? অর্থাৎ এই দিক থেকে ধর্মীয় যৌন নৈতিকতা থেকে তা আলাদা নয়, যাকগে প্রসঙ্গ বদলাচ্ছি।

নিক্রোফিলিয়া[১০৩] এবং বেসটিয়ালিটি[১০৪] হচ্ছে আরও দুটো উদাহরণ যেখানে সকল অভিপ্রায় ও কারণের জন্যে সম্মতির ব্যাপারটা 'অপ্রাসঙ্গিক', কিন্তু বেশিরভাগ লিবারেলই এই কাজের প্রতি নৈতিক আপত্তি তুলবে এবং একে ভুল কাজ হিসেবে

[১০৩] মৃতদেহের সাথে যৌন সম্পর্কের তাড়না।

[১০৪] অন্যপ্রাণীর সাথে যৌন সম্পর্কের তাড়না।

চিহ্নিত করবে।

এছাড়াও আরো এমন কিছু কাজ রয়েছে যেগুলোতে সম্মতি থাকার পরেও নৈতিকভাবে ঘৃণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমনঃ পারস্পারিক সম্মতিস্বরূপ 'ক্যানিবালিস্টিক ফেটিশিজম[১০৫]', এই ধরণের কাজের প্রতিলিবারেলরা সবচেয়ে বেশি বিরক্তি প্রকাশ করে তাকে নৈতিকভাবে নিন্দা করেছে।অবশ্যই, কিছু চরমপন্থী লিবারেল সেকুলার আছে যারা দাঁতে দাঁত কামড়ে এরপরও বলবে যে এই ধরণের 'সব' কাজ, এমনকি অযাচার এবং সম্মতির সাথে নরমাংস ভক্ষণ করাতেও কোনো সমস্যা নেই যদি এতে উভয়পক্ষের সম্মতি থাকে। কিন্তু আবারও, বেশিরভাগ মানুষই তাদের ভেতরে অনুভব করে যে এই ধরণের কাজ মৌলিকভাবে ভুল এবং বিরক্তিকর। এইধরণের ইনটুয়েশন[১০৬] [সজ্ঞা] কি আমাদের নৈতিক যুক্তিবিচারে এবং আমরা চূড়ান্তভাবে কোন জিনিসকে ভাল কিংবা মন্দ ভাবি এর উপর প্রভাব ফেলে না?

প্রশ্ন ১০- নাহ, এসব নৈতিক সজ্ঞা অপ্রাসঙ্গিক। কেননা সবকিছুর পরেও এরা পুরোপুরি সাবজেকটিভ [অর্থাৎ আবেগের উপর নির্ভরশীল, এবং পরিবর্তনশীল]।

উত্তরঃ এরিস্টটল, একুইনাস ও ফখরুদ্দীন রাজী সহকারে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় ঘরানার চিন্তাবিদগণ সমলিঙ্গীয় যৌনতাকে চূড়ান্তভাবে নিন্দা করেছেন, তারা এই নিষিদ্ধতাকে কোনো প্রকার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করার মত কোনো বিষয় হিসেবেই গণ্য করেন নি, তারা বেশ সহজ-সরল ভাবেই এর নিন্দা করেছেন, যেন তা সহজাত প্রকৃতিরই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এছাড়াও এই চিন্তাবিদগণ এই কাজগুলোকে জঘন্য হিসেবে চিহ্নিতকরণে 'মানবীয় স্বভাবজাত প্রকৃতির' উপর জোর দিয়েছেন, যেটাকে আমরা মানুষের 'বিবেক' বলতে পারি। আধুনিক পাঠকগণ এ ব্যাপারে প্রকাশ পাওয়া ঘৃণা এবং পুরোদমে শাস্তির ব্যাপারটা যে শুধুমাত্র 'বোধহীন গোঁড়ামী' এবং 'ঘৃণা' ছাড়া কিছু নয়- তার প্রমাণ হিসেবে এই 'বিবেকের প্রতি আবেদন'কে ব্যবহার করেন।

কিন্তু, চলুন এই ব্যাখ্যাকে আরও কাছ থেকে পরীক্ষা করা যাক। তার মানে কি তাহলে পশ্চিমা যৌন মূল্যবোধ 'ভিসসেরালিটি[১০৭]' এবং'মানুষের সহজাত বিবেক'কে কখনোই নৈতিক বিচারের জন্যে গ্রহণযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচনা করে না?

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে, সজ্ঞা ও ভিসসেরালিটি অনেকখানিই নৈতিকতার

---

[১০৫] নিজ গোত্রের অন্য প্রাণী, যেমন এক মানুষের আরেক মানুষকে খাওয়ার তাড়না।

[১০৬] কোনো ফ্যাক্ট বা অনুরূপ কিছু ছাড়া, কোনো কিছুর ব্যাপারে অনুভূতির উপর নির্ভর করে সাথে সাথেই জানতে পারার ক্ষমতা। দেখুনঃ https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/intuition

[১০৭] যুক্তি বা অন্য কিছু ছাড়া মানুষের ভেতর থেকে আসা কিছু, দেখুনঃ https://www.merriam-webster.com/dictionary/visceral । লেখাটিতে পরবর্তীতে এর অনুবাদ করা হয়েছে 'অভ্যন্তরীণ'।

অংশ—মানুষেরা যেভাবে তাদের জীবনে ব্যক্তিগত নৈতিক চর্চা করে তার ক্ষেত্রে, কিংবা যেভাবে ধর্মতত্ত্ববিদগণ ভাল-মন্দের তত্ত্ব দাঁড় করান— উভয় ক্ষেত্রেই। অন্যদিকে, আধুনিক লিবারেল নৈতিকতা এবং পশ্চিমা নৈতিক দর্শন নৈতিক সজ্ঞার ব্যাপারটা পাত্তা দেয় না এবং মাঝেমধ্যে একেবারেই হিসাবের খাতার বাইরে ফেলে দেয়।

ইসলামিক যৌন নৈতিকতা ফিতরাহর ধারণার মাধ্যমে আমাদের নৈতিক সজ্ঞার গুরুত্বের কথা বলে। ইসলামী চিন্তায়, কিছু নৈতিক প্রতিক্রিয়া, প্রবণতা এবং ভঙ্গিমা ফিতরাহর সাথে সংযুক্ত— যেভাবে রাসুলুল্লাহর [সা] সরাসরি বক্তব্যে এবং কুর'আনের আয়াতে এসেছে। এই লেখাতে এ-ব্যাপার পুরোপুরি বলা সম্ভব না। তবে, আমাদের উল্লেখ করা উচিৎ কিভাবে ফিতরাহর বিষয়টি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কে জানা, তাওহিদকে জানা এবং তাঁর ইবাদাতের প্রতি আকাঙ্ক্ষার মত সর্বোচ্চ নৈতিক ভাবের জন্যেই বিবেচ্য নয়, বরং এটি মানুষের আদর্শিক দৃষ্টিকোণের ভিসসেরাল বা অভ্যন্তরীণ উপাদানের উৎস, যেমনঃ ফাহিশার প্রতি আবশ্যিক ঘৃণা, মলের [feces] প্রতি বিরক্তি, পবিত্র এবং পরিস্কারের প্রতি আকর্ষণ, উলঙ্গপনার প্রতি স্বাভাবিক লজ্জাবোধ ইত্যাদি।

সৃষ্টিকর্তা-প্রদত্ত ফিতরার কারণে একজন মানুষ স্বতঃই 'ভাল' কে চিনতে পারবে এবং খারাপ কাজ ও অনৈতিকতার ক্ষেত্রে 'বাঁধা' অনুভব করবে। একটি বিখ্যাত হাদিসে রাসুলুল্লাহ [সা] বলেছেন, "তোমার অন্তর থেকে ফতওয়া নাও। 'নৈতিকভাবে ভালোকাজ হচ্ছে যে ব্যাপারে তোমার অন্তর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং পাপ হচ্ছে যে ব্যাপার তোমার অন্তরে অশান্তির/অস্বস্তি সৃষ্টি হয়, এমনকি মানুষজন তোমাকে এর বিপরীত পরামর্শ দিলেও।" অবশ্যই, এর মানে এই নয় যে কোনো মানুষের অন্তর বা ফিতরা দূষিত হওয়া থেকে মুক্ত— আর এজন্যে একজন মুসলিম যেকোনো ব্যাপারে কেবল স্বজ্ঞার উপর নির্ভর না করে অবশ্যই ইসলামী আইনের সাহায্য নিবে। একথা বলার পরে, **ইসলামী দৃষ্টিকোণ হচ্ছে মানুষের সঠিক ফিতরা খাপে খাপে ইসলামী আইনের সাথে মিলে যাবে কেননা উভয়ের মধ্যে আল্লাহ্ সংগতি স্থাপন করেছেন।**

প্রচুর আলিম ফিতরাহ এবং আদর্শিক মানদণ্ডের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। আমাদের উদ্দেশ্যে এখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে—নৈতিক যুক্তিবিচারের ক্ষেত্রে, মানুষ হিসেবে আমাদের চারপাশের আদর্শিক দৃষ্টিকোণের [umwelt[108]] অভ্যন্তরীণ উপাদান নির্ণয়ে ইসলামিক এথিকসের ভূমিকা রয়েছে রয়েছে। এটি মানব প্রকৃতির এই চিরন্তন দিকটিতে প্রভাব ফেলে— যখন প্রযোজ্য।

---

[১০৮] কোনো অরগানিজম যেভাবে পৃথিবীর অভিজ্ঞতা নেয়। [https://www.lexico.com/definition/umwelt]

অন্যদিকে লিবারেল সেকুলার দার্শনিকগণ 'মানব-অভিজ্ঞতা'র বিষয়টিকে হয় ছোট করেন, নাহয় পুরোপুরি বাতিলের খাতায় ফেলে দেন। ব্যাপারটা এমন নয় যে লিবারেলরা নিজেরা এসকল অভ্যন্তরীণ আদর্শিক প্রতিক্রিয়া অনুভব করেন না— সকলেরই বিবেক রয়েছে এবং দিনশেষে ভাল-মন্দের ব্যাপারে 'সহজাত অনুভূতি' আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে শুধু এই যে, লিবারেল নৈতিকতা এই ধরণের অভ্যন্তরীণ ভাবপ্রবণতা বেশি একটাপ্রকাশ করেন না। এটাবেশ বড়সড় ভুল, কারণ যদি আমরা কোনো ধর্ম বা সংস্কৃতির নৈতিক মনোভাবের উপর জরিপ চালাই, আমরা সবসময়ই একশ্রেণীর আদর্শিক প্রতিক্রিয়া খুঁজে পাব যেগুলোকে কেবলমাত্র চূড়ান্ত ভাবে অপকরণকারী হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে [যদিও একেক সংস্কৃতিতে এই একাজগুলো একেক রকমের পারে।]

নির্দিষ্টভাবে সেসকল কাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেগুলো এতটাই বাজে যে এগুলোর ব্যাপারে ভাবতেই মানুষের গা ঘিনিয়ে উঠে এবং ভয়ের উদ্রেক হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই প্রতিক্রিয়াগুলো কগনিটিভ নয়, অর্থাৎ এরা সচেতন চিন্তা কিংবা যত্ন সহকারে নৈতিক যুক্তি বিচার করার মাধ্যমে পাওয়া নয়। বরং এগুলো কোনো কাঠামোবদ্ধ চিন্তার পূর্বেই মানুষের মনে এসে জড়ো হয়।

নিজের মায়ের সাথে অযাচার হচ্ছে এরকম কাজের একটা সোজাসাপ্টা উদাহরণ, এই ধরণের আচরণ প্রায় সব সংস্কৃতি এবং ধর্মেই পাওয়া যায়। এখানে কোনো গভীর নৈতিক যুক্তিবিদ্যার খেলা নেই, কোনো বাস্তবমুখি পরিশেষ, ক্ষতি, পুণ্য, সম্মতি, উপকার কিংবা অন্য কোনো কিছুই তত্ত্বায়ন কিংবা ভেবে দেখবার আগেই মানুষের ভেতর থেকে আকস্মিক ঘৃণার প্রতিক্রিয়া এবং চেতনা জাগ্রত হয় যে "এই কাজটি বিলকুল ভুল"।

লিবারেল সেকুলার মূল্যবোধে সজ্ঞামূলক চেতনার কেমন মূল্য রয়েছে? পরিস্কারভাবেই, অভ্যন্তরীণ ঘৃণা পশ্চিমা মনে উপস্থিত, যদিও সেভাবে মনে করা হয় না বা দেখা হয় না। কিছু যৌনঘটিত কেইসে এই ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, যেমন- অযাচার[১০৯] , নিক্রোফিলিয়া, শিশুকাম, ভোরারেফিলিয়া[১১০] , কোপ্রোফিলিয়া, বেসটিয়ালিটি [যদিও এই ব্যাপারে জনগণের মত সাম্প্রতিক সময়ে সহনশীল হয়েছে]- এবং কিছুদিন আগেও সমকামীতার ব্যাপারেও একই মনোভাব বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু যখন তাদেরকে এইসকল কাজের প্রতি অবস্থানের পক্ষে যুক্তি বা কারণ দেখাতে

[১০৯] পারিবারিক সদস্যদের সাথে যৌন-সম্পর্কের তাড়না।

[১১০] কাউকে ভক্ষণ করা বা নিজেকে ভক্ষন করাবার যৌনঘটিত তাড়না।

বলা হয়, তখন পশ্চিমা নীতিবিদদের প্রায়ই দেখা যায় 'ক্ষতি', 'অবজেক্টিফিকেশন' এবং 'সম্মতি'রএক জটিল, অতি-জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় মেতে উঠেন। "মানুষ সহজাতভাবেই এগুলোকে ঘৃণার চোখেদেখে এবং এটাই এই ধরণের কাজগুলো অনৈতিক মনে হবার জন্যে কেন্দ্রিয়, সিধাসাধা ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ"—এটা স্বীকার করার বদলে লিবারেল সেকুলার চিন্তা এর তত্ত্বায়নের চেষ্টা করে এবং 'ক্ষতি' ও 'সম্মতি'কে যৌক্তিকায়নের দ্বারা প্রায়োগিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর নৈতিক নিন্দার ভিত্তি স্থাপন করে।

যেমনটি আগে বলেছি, লিবারেল আধুনিকতাবাদের 'সবচেয়ে বেশি যৌক্তিক', 'বাস্তববাদি' এবং 'আবেগি বিবেচনা বা অযৌক্তিক ট্যাবু-মুক্ত' হবার ব্যাপারে নিজেদের তৈরি যে প্রতিমূর্তি রয়েছে, তার সাথে এই প্রবণতাটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর ইতিহাসের সকল পশ্চিমা দার্শনিকই তাদের নৈতিক তত্ত্বের আলোচনায় প্রচলিত নৈতিক সজ্ঞার ব্যাপারটিকে এড়িয়ে যান না, তবে লিবারেল সেকুলারদের মধ্যে পশ্চিমা নীতিবিদদের ভেতরে প্রভাবশালী মত হচ্ছে- ইনটিউশন সাবজেকটিক, আর তাইএর নেপথ্যে আদর্শিক কোনোভিত্তি নেই।

প্রশ্ন ১১- ঠিক, আমাদের ইনটিউশন এবং বিবেক সাবজেকটিভ। যদি মুসলিমরা বলতে চায় যে ফিতরা গুরুত্বপূর্ণ এবং "বিশুদ্ধ ফিতরা" অনুসারে সমকামি কার্যকলাপ ঘৃণ্য, তাহলে অন্যরা কেন সেটাকে পাত্তা দিবে? সমকামিতার নৈতিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্যে এর কি গুরুত্ব রয়েছে?

উত্তরঃ"বিবেক সাবজেকটিভ" বলাটা একটি এপিস্টেমোলিজক্যাল বা অধিবিদ্যাগ[১১১]ত ইস্যু। এর মানে হচ্ছে, কোন নৈতিক সজ্ঞা আসলেই প্রাকৃতিক এবং সকল মানুষের জন্যেইসত্য— সেটা জানার কোনো অবজেকটিভ বা চিরন্তন উপায় নেই। কিন্তু "আমরা অবজেকটিভলি কোনটা জানতে পারি, আর কোনটা পারি না" আর "কোনটার অস্তিত্ব আছে আর কোনটির নেই"- এ দুটো আলাদা প্রশ্ন। অ্যানালাইটিক ফিলোসফির ভাষ্যানুযায়ি, আমরা এপিসটেমোলজির প্রশ্ন আর অনটোলজির[১১২] প্রশ্ন একসাথে মিশিয়ে ফেলতে পারি না।

এর মানে কি? হ্যাঁ, মুসলিমরা একমত হতে পারে যে ওহিতে যে ফিতরাহর ব্যাপারটি এসেছে, সেটি অস্তিত্বশীল কিনা তা জানার 'অব্জেকটিভ' পথ নেই। আমরা একমত হতে পারি যে এমন কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নেই যা মানুষের আদি সত্য সঠিক

[১১১] জ্ঞানতত্ত্ব, দর্শনের যে অংশ "আমরা কিভাবে জানি"– এই বিষয় নিয়ে ডিল করে। দেখুনঃ https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/epistemology

[১১২] সত্তার বা অস্তিত্বের প্রকৃতি সম্পর্কিত অধিবিদ্যার বিশেষ একটি শাখা। দেখুনঃhttps://philosophyterms.com/ontology/

'প্রকৃতির' স্বরূপ উন্মোচন করে দেবে। কিন্তু, শুধুমাত্র বিজ্ঞান এই ব্যাপারে মত দিতে পারে না মানেই এই নয় যে— ফিতরাহ্‌রই অস্তিত্ব নেই এবং তা ইসলামী চিন্তায় বর্ণিত উপায়ে কাজ করে না। দিনশেষে, বিজ্ঞান এমন অনেক কিছুর উপরই মতামত দিতে পারে না, তবুও আমরা সেগুলোর 'বাস্তবতা' হিসেবে অভিজ্ঞতা নেই, যেমনঃ মানুষের সচেতনতা [conciousness], সময়ের প্রকৃতি, অথবা আদর্শ বা মানদণ্ড [normativity] এবং ভাল-মন্দের ব্যাপারে আমাদের বোধ নিজেই।

আবারও সংক্ষেপে বললে, আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করে ফেলেছি যে, ভাল-মন্দের ব্যাপারেএবং নির্দিষ্টভাবে যৌনতা কেন্দ্রীক মানদণ্ড নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কীভাবে আমাদের নৈতিক সত্ত্বা এবং মানব-প্রকৃতির ধারণা গুরুত্ব রাখে। আমরা আরও আলোচনা করেছি, আমাদের ইনটিউশন, মানব-প্রকৃতি এবং কিভাবে এই স্বতঃলব্ধ জ্ঞান ও মানবপ্রকৃতি ইসলামি আইন ও সমকামি কার্যকলাপের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত— এই ব্যাপারে ইসলাম শক্ত ধারণা প্রদান করে। আধুনিক পশ্চিমা সেকুলার চিন্তাধারা এ বিষয়ে তেমন জোরালো কোনো বিকল্প তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ পেশ করতে পারে না। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে সেকুলার চিন্তা নিজেকে বিজ্ঞানভিত্তিক হিসেবে দেখে এবং তাই মানব-প্রকৃতি এবং মানব অন্তঃসারের [essence] ব্যাপারে অধিবিদ্যাগত বিতর্ক এড়িয়ে চলে। এটার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে কারণ সমকামি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ইসলামিক যৌন-মানদণ্ডের ব্যাপারে সাহিত্যিক ওজন রয়েছে, অনেকেই এর নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে লেখালেখি করেছেন যেখানে এই ব্যাপারে ১৪০০ বছরের ঐকমতের ভার রয়েছে পশ্চিমের অতি সাম্প্রতিক সমকামিতার গ্রহণযোগ্যতা এবং স্বাভাবিকায়নের ব্যাপারটা কেবল গত ১৫-২০ বছরের সংস্কৃতিগত মনোভাবের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে।

প্রশ্ন ১২- "পরিবর্তনশীল সাংস্কৃতিক মনোভাব" এর কারণে LGBTQ-রাযৌন স্বাধীনতা লাভ করে নি। বরং এটা হচ্ছে মানব অধিকারকে মূল্যায়ন করা এবং সমকামি ভালোবাসার বিরুদ্ধে অবৈধ ধর্মীয় অত্যাচারকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে।

উত্তরঃ আবারও, এটা একটা প্রগতিশীল কল্পকাহিনী যে সমকামিরা মানবসমাজের একটি ক্যাটাগরি হিসেবে বছরের পর বছর ধরে অত্যাচারিত হয়েছে এবং কেবলমাত্র আধুনিক পশ্চিমারা এসে তাদের স্বীকৃতি দিয়েছে এবং অত্যাচার বন্ধ করেছে।

বাস্তবে, 'সমকামিতা', 'বিষমকামিতা' এবং 'সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন' সাধারণভাবে আধুনিক পশ্চিমাদের তৈরি [এর মানে এই না যে এই 'ক্যাটাগরি'গুলো বাস্তব-হিসেবে অভিজ্ঞতালব্ধ হয় না]। যৌনতা ও লিঙ্গ বিষয়ে সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কথা

নৃতত্ত্ববিদ, সমাজবিদ ও ইতিহাসবিদগণ আলোচনা করেছেন, যা ধর্মীয় ও লিবারেল, উভয় দলের একাডেমিয়ানরাই তাদের আলোচনায় তুলে ধরেছেন। এমনকি সাম্প্রতিক সময়ের 'কুইর থিওরি' সমলিঙ্গীয় পরিচয় এবং সাধারণভাবে যৌনতার ব্যাপারে "সামাজিকভাবে গঠনমূলকদিক" প্রস্তাব করে। [আর জোসেফ মাসাদের মত একাডেমিয়ানরা আরও দাবি করে যে সেক্সুয়ালিটির ব্যাপারে হেটেরো/হোমো 'বাইনারি' এবং ইউরো-অ্যামেরিকান ধ্যানধারণা প্রায়শই অন্যান্য সংস্কৃতি এবং ঔপনিবেশিক মানুষের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়, যারা সাধারণত এসব ইউরো-কেন্দ্রিয় যৌন পরিচয় ধারণ করে না। ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য যৌনতা কেন্দ্রীক রাজনীতি' এবং 'অত্যাচারিত মুসলিম সমকামিদের রক্ষা করার মিশন' মুসলিম বিশ্বে তাদের জন্যে অযুহাত হয়ে ওঠে—ঠিক যেমনভাবে অতীতে ইউরো-আমেরিকান নারীবাদ ও 'হতদরিদ্র ও অত্যাচারিত মুসলিম নারীদের রক্ষা' করার মিশন মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, এশিয়ায় পশ্চিমা আধিপত্যবাদ প্রবেশের অযুহাত হিসেবে কাজ করেছে এবং এখনো করছে।

আর সমকামিদের উপর ইসলামের 'অত্যাচারের' ক্ষেত্রে, আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ক্লাসিক্যাল আলিমগণের নিকট 'বিষমকামেরই কোনো ধারণা বিদ্যমান ছিল না, সেখানে সমকামিতা তো দূরের কথা [একইভাবে অন্যান্য কালচারেও, এমনকি উনবিংশ শতাব্দির শেষাংশের আগ পর্যন্ত ইউরোপেও]। ইসলামী আইনে, নিষিদ্ধ হচ্ছে সিম্পলি দুইজন পুরুষের মধ্যে পায়ুপথে যৌনসঙ্গম [নারীদের ক্ষেত্রে একইরকম] এবং যৌন-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা সম্পাদিত অন্যান্য কাজকর্ম। যৌনতা এসকল সংশ্লিষ্ট মানদণ্ডগুলো শত শত বছর ধরে বইগুলোতে ছিল, যদিও ইতিহাস জুড়েই মুসলিম-মেজরিটি দেশগুলোতে 'একই লিঙ্গে' যৌনক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে। মানুষজন একই লিঙ্গে যৌনক্রিয়া করার পরও নিজেদেরকে 'সমকামি' হিসেবে, অথবা অন্য বিশেষ 'ক্যাটাগরি'র মানুষ চিহ্নিত করেনি বা পরিচয় দেয়নি, যা/যারা হয়ত এমনকি 'কাঠামোগত নিপীড়নের' বিষয় হতে পারত।

কোনটি বেশি গ্রহণযোগ্য?

১। হাজার বছর ধরে পৃথিবী ব্যাপী বিভিন্ন সংস্কৃতিতে যেকোনো জনসমাজে সমকামিদের'একটি সতন্ত্র এবং চিহ্নিত করার মতো মানব-ক্যাটাগরি' হিসেবে দমিয়ে এবং অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কেবল গত চল্লিশ বছরের আধুনিক পশ্চিমের এই দমনকে চিহ্নিত করা এবং সমকামিদের মুক্ত করার মত 'পরিস্কার মানসিকতা'এবং 'সাহস' হয়েছে। সবকিছুর পরে আধুনিক পশ্চিমই সকল সময়ের সকল মানুষের মধ্যে

সবচেয়ে বেশি আলোকিত এবং নৈতিক। তাই যে বিষয়টি মানব ইতিহাসের ৯৯% সময় ধরে মানুষেরা স্টুপিডভাবে এবং নিষ্ঠুরতার সাথে দেখেনি, সেটা আধুনিক পশ্চিমই যে প্রথম আবিষ্কার করবে— এতে অবাক হবার কিছু নেই।

২। হাজার বছর ধরে গোটা বিশ্ব জুড়ে শত শত সংস্কৃতিতে মানুষেরা যৌন-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ পরিসরে অভিজ্ঞতা নিয়েছে। একেক সংস্কৃতি একেকভাবে এই কামনাগুলোর 'প্রকাশ'কে নিয়ন্ত্রণ করেছে, কিন্তু 'মানব-প্রকৃতি' এবং 'যৌন নৈতিকতা'র বলিষ্ঠ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সমকামি যৌন-আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি লাভ করা প্রায় সব-জায়গায় সব-সময় ধরে নিষিদ্ধ ছিল। এরপর (তথাকথিত) 'এনলাইটমেন্ট' ঘটে, ধর্মীয় এবং অ-পশ্চিম নৈতিক যুক্তি বিচারকে 'অবৈজ্ঞানিক' মনে করা হয়। মানবজীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য এবং জীবনের ব্যাপারে বৃহৎ মূল্যবোধভিত্তিক দৃষ্টিকোণে পুঁথিবদ্ধ নিয়ম-রীতি এবং নৈতিক মূলনীতির ভিত্তি হতে সাংস্কৃতিক চর্চাকে কার্যকরীভাবে আলাদা করার মাধ্যমে এসব নৈতিক যুক্তিবিচারকে ত্যাজ্য করা হয়। সংস্কৃতির নিষ্ক্রিয়তার (না বদলাবার প্রবণতা) কারণে প্রথম-প্রথম কিছুদিন সমকামি ক্রিয়ার নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে, কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের ভাব বদলাতে থাকে। যেটাকে 'নৈতিক ভ্রষ্টতা' হিসেবে মনে করা হত, সেটাকে নতুন করে 'মানসিক ব্যধি' হিসেবে দেখানো হয়। এরপর চূড়ান্ত পর্যায়ে, এটাকে শুধুমাত্র মানুষের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের আরেকটি 'স্বাভাবিক' ও 'গ্রহণযোগ্য' দিক হিসেবে দেখানো হতে থাকে যতক্ষণ না মানুষ এটাকে সার্বিকভাবে সেভাবেই দেখতে শুরু করে এবং তাদের বুঝতে কষ্ট হবে "কেন প্রাচীন যৌন রীতিনীতির দ্বারা সমকামকে রুদ্ধ করে রাখা হবে।"

আমার কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হচ্ছে, সমকামি কার্যকলাপের প্রতি বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গিগুলো পরিবর্তনশীল সাংস্কৃতিক ভাবের ফলাফল, যে ভাবগুলোকে 'ভাষা' এবং 'স্বাধীনতা'র ধারণাগত কাঠামো দ্বারা সাজানো হয়েছে। আর প্রথম ন্যারেটিভে প্রকাশিত অপর দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ঐতিহাসিক 'রিভিশনিজম' এবং "ধারণাগত কঠোরতাও সংগতির প্রতি অবজ্ঞা"র উপর ভিত্তিশীল এক ধরণের গোষ্ঠী কেন্দ্রীক এবংনিজেকে নিজে সর্বেসর্বা মনে করার রুপকথা।

প্রশ্ন ১৩- "ধারণাগত দৃঢ়তা এবং সংগতি" এর দিক থেকে পশ্চিমা বিশ্ব যদি এত পিছিয়েই থাকে, তাহলে ইসলাম যৌনতার ক্ষেত্রে কি ধরণের ধারণাগত দৃঢ়তা এবং সংগতি দেখিয়ে থাকে?

উত্তরঃ ইসলামে মানুষের যৌনতার ব্যাপারটা শুরু হয় সৃষ্টির প্রথম মানুষ আদম [আ]-কে দিয়ে। কুর'আনে যেমন এসেছে- আদম [আ] জান্নাতে তাঁর স্ত্রীর সাথে

ছিলেন যতক্ষণ না শয়তান তাদেরকে নিষিদ্ধ গাছ হতে ফল খাবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ফল খাবার পরেই, তাঁরা প্রথম তাদের নগ্নতার ব্যাপারে টের পায় এবং এইজন্যে লজ্জাবোধ করে। তখন তাঁরা নিজেদের ঢাকতে গাছের পাতা ব্যবহার করেন। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তাঁরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আল্লাহ্‌ তাদের ক্ষমা করে দেন, সাথে সাথে তাদেরকে জান্নাতের বাইরে 'পৃথিবী' নামক এক কঠিন এবং যন্ত্রণার স্থানে পাঠিয়ে দেন।

মানুষের ইতিহাসের এই শুরুর কাহিনী থেকে ইসলামিক আলিমগণ উদ্ভূত করেছেন যে, মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই 'নিয়ম ভাঙ্গার প্রতি' বশবর্তী। সৃষ্টিকর্তা আমাদের জন্যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু শয়তান, আমাদের ভেতরের কু-প্রবৃত্তি এবং নিজের খাহেশাত মিটিয়ে তৃপ্তি ভোগ করার প্রবণতা আমাদেরকে এইসকল সীমা অতিক্রম করার জন্যে প্রতিনিয়তই ঠেলতে থাকে। আল্লাহ্‌র সীমা অতিক্রম করা হচ্ছে অকৃতজ্ঞতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ, কেননা তিনি মানবজাতিকে কামনা-বাসনা পূরণ এবং জীবনকে উপভোগ করার জন্যে অনেক (বৈধ) উপায় বা রাস্তা দিয়েছেন। খ্রিষ্টবাদ ও অন্যান্য ধর্মের বিপরীতে, ইসলাম শারীরিক উপভোগ এবং পার্থিব আনন্দকে সত্তাগতভাবেই 'পাপ' হিসেবে বিবেচনা করে না। বরং, জীবনে জায়েজ [আনন্দ] উপভোগ করা এবং সেটা করার মধ্য দিয়ে স্বীয় রবকে স্মরণ করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া হচ্ছে ইসলামে ধার্মিকতার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ। এর একেবারে উলটোতে রয়েছে 'ইসরাফ এবং 'গাফলা, অন্য কথায়,যিনি আমাদেরকে সর্বপ্রথম এইসব উপহার এবং নিয়ামত দিয়েছেন, তাকে বিবেচনা না করেই অবহেলার সাথে এবং মূর্খের ন্যায় তিনি যা বৈধ করেছেন সেটারও বাইরে গিয়ে সীমা অতিক্রম করা।

আর তা অনুসারে, যৌনঘটিত খারাপ কাজ হচ্ছে এই ধরণের সীমা ছাড়ানোর অন্তঃসার। এখানে, মানুষের নগ্নতা এবং শরীরের যেসকল অংশ নগ্নতার সাথে সম্পর্কিত, সেগুলোকে অশালীনভাবে ব্যবহার করা হয়। আর এই অশালীনতা মানুষের ভোগান্তি এবং লজ্জার কারণ, কেননা এখানে মানুষ এবং সৃষ্টিকর্তার সামনে নিজেকে হেয় এবং নীচ করে ফেলে। সকল জায়েজ আনন্দের মাধ্যম বাদ দিয়ে নিষিদ্ধ ফল খাবার জন্যে সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌, তার সৃষ্টি ও পৃথিবীতে অবস্থানের একেবারে মূল কারণের প্রতি চূড়ান্ত পর্যায়ের বিবেচনাহীনতা প্রদর্শন করে। এটা এই দিক থেকে যে, কুর'আনে লুত [আ]-এর কওমের মানুষজনকে 'মুসরিফুন' [ইসরাফ থেকে নির্গত] বলা হয়েছেঃ "কারণ তোমরা লালসা চর্চায় নারীদের থেকে পুরুষদের প্রাধান্য দাও- তোমরা আসলেই সীমা অতিক্রমকারী মানুষ [মুসরিফুন]।" এই দিক এবং আরও অন্যান্য দিক থেকে, যৌনতা-সম্পর্কিত নৈতিকতার একেবারে আক্ষরিকভাবেই

বিশাল তাৎপর্য রয়েছে।

ইসলামিক আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতায়, কামনা সবসময়ই এমনভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয় যাতে তা স্রষ্টার প্রদত্ত সীমা অতিক্রম না করে। এমনকি প্রাকৃতিক, স্রষ্টা-প্রদত্ত কামনাগুলো যেমন- খাওয়া, ঘুমানো বা বিপরীত লিঙ্গের সাথে সম্পর্কের কামনাও এমনভাবে রাখতে হবে যাতে মানুষ সীমা অতিক্রম করে না ফেলে। যদি কোনো মানুষ স্রষ্টার ইচ্ছের সাথে সংগতি রেখে কামনাকে নিয়ন্ত্রণে আগলে রাখে, তাহলে তাঁর কামনার এমনভাবে রুপান্তর ঘটবে যে এমনকি শরিয়া লঙ্ঘনের চিন্তাও তাঁর কাছে ঘৃণ্য মনে হবে। আর যদি কোনো মানুষ সীমালঙ্ঘন করে তাওবা ছাড়াই বারবার কামনার চর্চা করতে থাকে, তাহলে এটাও আরেক ধরণের রুপান্তরের পথে নিয়ে যায়।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, ইসলামিক অধিবিদ্যায় মানুষের কামনার পরিবর্তনের ব্যাপারটি স্বীকার করে, এই দিক থেকে যে কেউ যেকোনো কিছুর জন্যে কামনা অনুভব করতে পারে, কিন্তু সেই কামনা আল্লাহ্ আমাদেরকে যে ফিতরাহর উপর সৃষ্টি করেছেন, সেখান থেকে নির্গত হওয়ার দিক থেকে প্রাকৃতিক নয়। দিনশেষে কোনো মানুষের ফিতরাহ দূষিত হতে পারে— হোক সেটা সামাজিক অবস্থার কারণে অথবা বাবা-মার প্রভাবে, অথবা এমনকি শয়তানের কু-মন্ত্রণায়।

ইমাম গাজ্জালির মত ক্লাসিক্যাল আলিমরা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন— ইসলামি অধিবিদ্যা অনুসারে, কোনো পরিমাণে 'কামনা'কে ভোগ করা 'পূর্ণ তৃপ্তি' দিবে না। শুধুমাত্র 'সাময়িক' তৃপ্তি সম্ভব, তাই যদি কেউ কামনার কাছে নত হতে শুরু করে, তাহলে সে 'পরিহার করার ক্ষমতা' হারিয়ে ফেলবে এবং কামনাগুলো আরও বেড়ে উঠতে উঠতে সেই মানুষের উপর আধিপত্যে চলে যাবে।

আধুনিক পশ্চিমা চিন্তায় "পুরুষের সাথে অন্তরঙ্গ হওয়ার কামনা"র সাথে "নারীর সাথে অন্তরঙ্গ হবার কামনা"র মধ্যে পার্থক্য করা হয়। অন্যদিকে ইসলামী চিন্তায় [পাশাপাশি ঐতিহাসিক এবং সাম্প্রতিক আরও অনেক সভ্যতায়] পুরুষদের প্রধান প্রাকৃতিক তাড়না হিসেবে ধরা হয় "প্রবেশ করানো" এবং নারীদের ক্ষেত্রে ধরা হয় "প্রবেশিত হওয়া"। ইবনে তাইমিয়ার মত আলিমগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে নারীদের ভেতর প্রবেশ করানোর এই একই 'কামনা' দূষিত হয়ে পুরুষের দিকে নির্দেশিত হতে পারে, কিন্তু সেই কামনা স্বকীয় নয়। তাই যেকোনো পুরুষ যদি নারীর প্রতি তার লালসাকে "স্বাধীন আধিপত্য" দিয়ে দেয়, তাহলে সে অন্যান্য পুরুষ, পশু কিংবা অন্য কিছুর ভেতরেও প্রবেশ করানোর কামনায় চালিত হতে পারে। আর কোনো

পুরুষ যে 'প্রবেশিত' হতে চায়, তার ব্যাপারে মনে করা হয় সে 'উবনা' নামক এক অস্বাভাবিকতায় আক্রান্ত। এই দিক থেকে, একটিভ [চালক] এবং প্যাসিভ [চালিত] সঙ্গীদেরকে আলাদা করা হয়, যেভাবে ইতিহাসে বহু সংস্কৃতিতেই হয়ে এসেছে, প্রাচীন গ্রিক-সভ্যতাসহ।

আজ পর্যন্ত, মধ্যপ্রাচ্যের অনেক পুরুষ যারা এই একটিভ রোলে বা চালকের ভূমিকায় সমলিঙ্গের সাথে যৌনক্রিয়া করে কিন্তু নিজেদেরকে 'গে' বা 'সমকামি পুরুষ' হিসেবে বিবেচনা করে না। তারা নিজেদের সিম্পলি "পুরুষ" হিসেবেই ভাবে, কারণ তারা অন্যান্য পুরুষদের সাথে এই সাধারণ 'পুরুষালী' ভুমিকাতেই যৌনক্রিয়া করে। আবারও এখানেও সক্রিয় পার্থক্য হচ্ছে মূলত 'রোল' বা 'ভূমিকা'র, লিঙ্গের নয়। অপরদিকে, পশ্চিমা সমকামিরা তাদের কামনাকে হেটেরোসেক্সুয়ালদের কামনা থেকে অনেক ভিন্ন মনে করেন। তাছাড়াও, এটা হচ্ছে তার "অন্য পুরুষের সাথে মিলনের কামনা", পালিত ভূমিকা যেটা-ই হোক। এটাই আলাদাভাবে 'সমকামি' হিসেবে চিহ্নিত করে, যেভাবে আধুনিক পশ্চিমেপালিত ভূমিকা অথবা অন্য যেকোনো সম্ভাব্য বিবেচ্য বিষয়ের ঊর্ধ্বে 'লিঙ্গ'কে প্রাধান্য দেওয়া হয়। মনে করা হয় মানুষ এই 'ওরিয়েন্টেশন' নিয়েই জন্মায়। ফলস্বরূপ, কোনো সমকামি পুরুষ কখনোই সত্যি সত্যি বিপরীত লিঙ্গকে কামনা করতে পারে না অথবা কোনো নারীর দ্বারা নিজের কামনা পূরণ করতে পারবে না।

শেষমেষ, সমকামি যৌনক্রিয়ায় নিষেধাজ্ঞার [পুরুষ-পুরুষ কিংবা নারী-নারী, যদিও নারী-নারী যৌনক্রিয়ার ব্যাপারটি নিয়ে কম আলোচনা হয়েছে] পিছে কারণ হিসেবে আলিমরা সাধারণত চারটি মূল ধারণা তুলে ধরেছেনঃ

১। বিরক্তি ও ঘৃণার প্রকাশের পাশাপাশি সবচেয়ে শক্তভাবে নিন্দা করা; কুর'আনে লুত [আ]-এর কওমের কাহিনীর পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন যে মানুষের প্রকৃতি [বা বিবেক] তাৎক্ষণিক ভাবেই এই কাজের 'খারাপ'কে চিহ্নিত করে।

২। প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্যবাদের [teleology] প্রতি আবেদন [appeal], বিশেষ করে পুরুষদের 'প্রবেশকারী' হিসেবে এবং নারীদের 'গ্রহীতা' হিসেবে প্রাকৃতিক এবং স্রষ্টা-প্রদত্ত ভূমিকা, এবং লিওয়াত কিভাবে এই আদর্শিক ক্রমকে বদলে দেয়। এই ধরণের ভাষা বিশেষ করে আইনি লেখাগুলোতে সুপরিচিত। ইসলামী আইনের বাইরেও, কিছু ধর্মতাত্ত্বিকগণ আরও আলোচনা করেছেন পুরুষদেহ এবং নারীদেহের মধ্যের অন্তর্নিহিত পরিপূরকতা [complementarity] রয়েছে। পাশাপাশি তাঁরা প্রত্যেক লিঙ্গের জন্যে অন্যান্য অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেছেন এবং

বলেছেন কিভাবে পরিপূরকতা জীবনকে বহন করে চলে, আদম সন্তানদের বংশবিস্তার করে এবং পারিবারিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধির জন্যে ভিত্তি প্রদান করে— যেখানে সমকামি ক্রিয়া একেবারে বিপরীত এবং এই ব্যাপারগুলোকেগুরুত্ব দেয় না।

৩। লিওয়াতকে[১১৩] চরম, নিন্দনীয় কামনার দ্বারা পরিচালিত হিসেবে বৈশিষ্ট্যায়িত করা, যেখানে পুরুষরা যৌনতায় 'ভিন্নতা'র জন্যে লালসা এবং কামনায় নারীর বদলে পুরুষের দিকে ধাবিত হয়।

৪। লিওয়াত দ্বারা ঘটিত শারীরিক এবং মানসিক অসুখের উল্লেখ করার পাশাপাশি কোনো পুরুষের নিজের ভেতরে প্রবেশ করানোর ইচ্ছেকে এক ধরণের মানসিক সমস্যা, অর্থাৎ 'উবনা' হিসেবে চিহ্নিত করা।

অবশ্যই কামনা, যেভাবে এটা সমকামি যৌনক্রিয়ায় নিয়ে যায় এবং এই যৌনক্রিয়া নিষিদ্ধের পিছের যুক্তি/কারণ ইত্যাদি ব্যাপারে ইসলামের ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিকোণ আধুনিক লিবারেল মানসে বিশাল আপত্তির রূপে ধরা পড়বে। কিন্তু এই আপত্তি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক মনোভাব এবং কল্পনাপ্রসূত ধারণার কারণে, যেগুলোকে আমরা এই বিতর্কে প্রশ্ন করেছি এবং উত্তর দিয়েএর পুনর্নির্মাণ করেছি।

প্রশ্ন ১৪- আমার গে এবং লেসবিয়ান বন্ধুবান্ধব রয়েছে। তাদের ভাষ্যে "যা তারা অনুভব করে এবং যা তাদেরকে খুশি করে", আমার কাছে শুধু সেগুলোরই গুরুত্ব রয়েছে।

উত্তরঃ ইসলামও "মানুষ কি অনুভব করে" এবং "কিসে খুশি হয়"- সে ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়।

ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে, আমাদেরকে সবসময় নিজেদের ব্যাপারে পর্যবেক্ষণমূলক ও বিশ্লেষণশীল হতে হবে এবং ক্রমাগত প্রশ্ন করতে যে আমরা নিজেদের ব্যাপারে যা বিশ্বাস করি— সেগুলো সত্য কিনা। একজন মুসলিম, উদাহরণস্বরূপ, তাঁর পুরো জীবন ধরে নিজেকে ন্যায়বান, ধর্মপরায়ণ বিশ্বাসী বলে মনে করে কিয়ামাতের দিন আবিষ্কার করতে পারে সে আসলে মুনাফিক ছিল, কারণ তার মিথ্যে 'ধার্মিকতা' কেবল মানুষের জন্যে ছিল, আল্লাহ্‌র জন্যে নয়। একইভাবে, কোনো মানুষ নিজেকে 'সমকামি' হিসেবে দেখতে পারে এবং সাবজেকটিভলি অভিজ্ঞতা হতে পারে যে সে যা চিন্তা করে তা 'অপরিবর্তনীয়' কামনা, কিন্তু বাস্তবে, সে শুধুমাত্র নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছে।

[১১৩] লুত আ. এর কওমের ন্যায় পুরুষের মধ্যে আরেক পুরুষের প্রবেশ করানো।

এমনকি লিবারেল সেকুলাররাও এই 'নিজেকে ধোঁকা দেবার' সক্ষমতা/সম্ভাব্যতা স্বীকার করে। যেমন, 'আদারকিন'-এর মত সর্বশেষ আইডেন্টিটি গ্রুপের কথা ভাবুন। যারা জানেন না, তাদের জন্যে— 'আদারকিন'রা হচ্ছে একদল মানুষের সমষ্টি যারা নিজেদেরকে আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে 'অমানুষ' বলে বিশ্বাস করে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু আদারকিনের খুব শক্তিশালী অনুভূতি রয়েছে যে তারা আংশিক পশু, যেমনঃ শিয়াল, খরগোশ, ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি। এই অনুভূতিগুলো তাদের 'আত্ম-অনুভূতি'র একটিবড়সড় অংশ হওয়ায় আদারকিনরা সেই প্রজাতির সাথে জোরালো বায়োলজিক্যাল এবং সাইকোলজিক্যাল সংযোগ অনুভব করে। কেউ কেউ এমনকি দাবি করেছেন যে, আদারকিনদের জিনগত ভিত্তিও রয়েছে। বস্তুত, অনেক আদারকিন এক্টিভিস্টরা 'সামাজিক সুবিচার [social justice]' এবং 'সংখ্যালঘুর অধিকার'-এর ভাষার মাধ্যমে সম্মান, গ্রহণযোগ্যতা এবং সমাজে সার্বিকভাবে ব্যবহারে-সমতার জন্যে লড়ছে, যে সমাজকে তারা মনে করে নিন্দনীয়ভাবে 'মানুষ-কেন্দ্রিক' এবং 'কিন-ফোবিক'।

এই-সব ব্যাপারকে 'হাস্যকর' মনে হবার জন্যে কারও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আসারও প্রয়োজন নেই। এমনকি সমকামি অধিকার কর্মীরাও আদারকিনদের স্পর্ধায় ক্ষেপে ওঠে এবং "সমকামিদের সাথে তাদের তুলনা করাকে" আক্রমণাত্মক হিসেবে নেয়। তাদের মতে, দিনশেষে মানুষের 'পরিচয় গঠনে' সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনের 'সত্যিকারের' ভিত্তি রয়েছে, যেখানে আদারকিনরা হচ্ছে এক উদ্ভট, আবিষ্কৃত উপ-সংস্কৃতি। অন্যদিকে আদারকিনেরা বলেন, তাদের প্রতি বিদ্বেষের সাথে মূলধারা হিসেবে সমকামিদের গ্রহণযোগ্যতা পাবার পূর্বে তাদের যে ঘৃণার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তার সাথে খুব একটা পার্থক্য নেই।

আদারকিনেরা অবশ্যই তাদের 'পশু পরিচয়'-এর ব্যাপারে অনেক শক্তিশালীভাবে অনুভব করেন, বিশ্বাস করেন তারা 'এভাবেই জন্মগ্রহণ করেছেন' এবং 'আদারকিন হওয়া' মানব-প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তারা যেভাবেই এইসকল অনুভূতির অভিজ্ঞতা নিক না কেন, তার মানে এই নয় যে আমরা বাকিরা সবাই তাদেরকে পাগল ভাবার কারণে 'ভুল'। একইভাবে, স্ব-পরিচয়দাতা সমকামিরা নিজেদের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন, মানুষের মানসে এর অবস্থান এবং কামনা তৈরিতে এর ভূমিকার ব্যাপারে শক্তিশালিভাবে অনুভব করতে পারে। তা সত্ত্বেও, ইসলামী চিন্তায় যেমনটি এসেছে—"বলিষ্ঠ মানব-প্রকৃতির আলোকে নৈতিক মানদণ্ড এবং আইন-কানুন নির্ণয় করা"— এখানে এসকল সাবজেকটিভ অনুভূতি অপ্রাসঙ্গিক। বিশেষ করেযেহেতু ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ব্যক্তি এবং পুরো সমাজই নিজেদেরকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে

ভাল-মন্দ, পবিত্র-অপবিত্র ইত্যাদির ব্যাপারে ভুল পথে নিতে পারে, যেমনটি আমরা লুত [আ] এবং তাঁর কওমের কাহিনীতে দেখতে পাই। সহজ কথায়, সৃষ্টিকর্তা আমাদের প্রকৃতি এবং কামনা পূরণ সম্পর্কে যা বলেছেন, তা মানুষের নিজেদের ব্যাপারে সাবজেকটিভ ফিলিংস বা দাবির উপর প্রাধান্য পাবে।

শেষমেশ, এটা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে আধুনিক সমাজ মানুষদের মাথায় "সমকামি আকর্ষণ প্রাকৃতিক", "গে সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন পরিবর্তনশীল নয়" "সমকামি কার্যকলাপ গ্রহণযোগ্য, এমনকি স্বাস্থ্যকর" ইত্যাদি ধারণা মুহুর্মুহু বোমাবর্ষণ করে চলেছে। এজন্যে আমাদের সমাজের অনেকের নিজেদের ব্যাপারে গভীরভাবে এগুলো অনুভব এবং বিশ্বাস করাটা মোটেও বিস্ময়কর নয়। তবে, এসকল ধারণার সমস্যাগুলো তুলে ধরা এবং সহানুভূতির সাথে মানুষদেরকে বিকল্প বাস্তবতা দেখতে সাহায্য করাতে ভুল কিছু নেই— যে বাস্তবতা "আমরা কারা", "আমাদের উদ্দেশ্য কি", "আমরা কোথায় যাচ্ছি" এবং "কার কাছে আমরা চূড়ান্তভাবে ফিরে যাব"— এই প্রশ্নগুলোর সুউচ্চ এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুরু হবে।

পাঠ ১৭।। কদর্যতার নেপথ্য কারণ

নাস্তিকতাঃ

মূলতঃ সমকামিতা হল নাস্তিকতা নামক বিষ বৃক্ষের শাখা। সমকামিতা-নাস্তিকতা-বিবর্তনবাদ একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমকামিতা যে একটি বিকৃত আচরণ তা বুঝার জন্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা চষে বেড়ানোর প্রয়োজন নাই যদি আপনি আস্তিক হয়ে থাকেন। একজন আস্তিক যখন প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা অগণিত নিদর্শন দেখে মহান স্রস্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তখন তার কাছে সবই খোলাসা হয়ে যায়। কারণ মহান স্রস্টা প্রাণীদের মধ্যে যেহেতু নারী-পুরুষ তৈরি করেছেন তবে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি পুরুষদের নারীর প্রতি আর নারীদের পুরুষদের প্রতি আকর্ষণ দিয়ে তৈরি করেছেন। এটা তো কোনো পাগলেও ভাববে না যে, তিনি পুরুষদের পুরুষের প্রতি কিংবা নারীদের নারীদের প্রতি যৌন আকর্ষণ দিবেন। কিন্তু নাস্তিকরা চিন্তার এই স্বাভাবিক পথ থেকে বঞ্চিত। তারা এই প্রকৃতি যে মহান স্রস্টার অনবদ্য সৃষ্টি সেই মহাসত্যকেই অস্বীকার করে। ফলে তাদের কাছে ভালো খারাপ নির্ধারণের কোনও মানদন্ড থাকে না। অন্ধত্বই হয় তাদের দৃষ্টি, অন্ধকারই হয় তাদের গন্তব্য। দার্শনিকদের ভাষায়- আলোর অনুপস্থিতিই আঁধার! যেমন কেউ যদি কোন জিনিস সৃষ্টি করে, তাহলে অবশ্যই সেটার একটি ম্যানুয়াল থাকবে। ঠিক তেমনভাবে নাস্তিকরা যেহেতু মহান স্রস্টাকে অস্বীকার করে ফলে তার দেয়া স্বভাবিক নিয়মকানুন ও তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। ফলে তারা লাগামহীন অবস্থায় চলে অবাধ স্বাধীনতার নামে নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে আনে ঐ মোবাইলের মত করেই। যার ফলে সমকামিতা, শিশুকামিতা, পশুকামিতার মত জঘন্য কাজগুলো তাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে খুব সহজেই।

আল্লাহ কুরআনের সূরা ফাতিরের – ৩৯ নং আয়াতে বলেছেন-

তিনিই সেইজন যিনি পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন। সুতরাং যে অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধেই তাহলে যাবে তার অবিশ্বাস। আর অবিশ্বাসীদের জন্যে তাদের অবিশ্বাস তাদের প্রভুর নজরে কিছুই বাড়ায় না বিতৃষ্ণা ব্যতীত, আর অবিশ্বাসীদের জন্যে তাদের অবিশ্বাস ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বাড়ায় না।

মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস জীবনের পরতে পরতে মানুষকে বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করে।

স্বাভাবিক যৌনাচারের পথ রুদ্ধ করাঃ

মানুষ স্বভাবতই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার এই সুপ্ত স্বাভাবিক যৌন কামনাকে মিটাবার পথকে যখন রুদ্ধ করা হয় তখন অনেক ক্ষেত্রেই তা বিকৃত পথে আত্মপ্রকাশ করে। দশকের পর দশক ধরে যারা জেলখানায় আটক থাকে সেই, সামরিক বাহিনীর যেসব সদস্য দীর্ঘদিন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, ধর্মের বিকৃতি সাধনের ফলে বৈরাগ্য – বাদকেই যারা ধর্মের অংশ বানিয়ে নিয়েছে তাদের মধ্যে সমকামিতার মত বিকৃতি বেশি ঘটতে দেখা যায়। তবে তার মানে এই নয় যে, কোনও মানুষকে বহুদিন বিপরীত লিঙ্গের কাছ থেকে বঞ্চিত রাখলেই সে সমকামি হয়ে যাবে। প্রতিকুল পরিবেশের সাথে সাথে নিজেরদের নৈতিক বিকৃতি ও মহান স্রস্টা প্রদত্ত সত্য – ধর্ম না মানার কারণেই তারা ধৈর্য ধারণ না করে বিকৃত উপায় অবলম্বন করে। অথচ বিশ্বব্যাপী লাখো ইসলামী বন্দীরা যেসব জায়গায় দীর্ঘদিন বন্দী অবস্থায় কাটায় তাদের মধ্যে কিন্তু এমন কুস্বভাবের প্রচলন হতে দেখা যায় না। কিন্তু যাদের মধ্যে ধর্মীয় প্রভাব শিথিল এবং নাস্তিকতার ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে অক্ষম যেসব ধর্ম রয়েছে সেই সব বৈরাগ্য – বাদীদের মাঝেও এই সমকামিতা বিস্তার লাভ করতে দেখা যায়। পশ্চিমা বিশ্বের চার্চগুলোর পাদ্রীদের নৈতিক স্থলন ও সমকামিতা প্রতিরোধে তাদের ব্যর্থতা এই সাক্ষ্যই বহন করছে। আপনাদের হয়তো - অজানা নয় – ভ্যাটিকান সিটিতে পাদ্রি দ্বারা অনেক শিশু যৌনভাবে নির্যাতিত হবার ঘটনা।

যৌন নির্যাতনঃ-

যৌন নির্যাতন সমকামিতা সৃষ্টির একটা গুরুত্বপুর্ণ কারণ। রিসার্চার ফিঙ্কেলহোর তার এক গবেষণায় পেয়েছেন যে, যেসব অল্পবয়সী পুরুষ তাদের থেকে বয়সে বড় পুরুষদের দ্বারা যৌনভাবে নির্যাতিত হয়েছে তাদের সমকামী হবার সম্ভাবনা চারগুণ বেশি। আরেক রিসার্চে দুই-তৃতীয়াংশ লেসবিয়ান বলছে যে তারা পুরুষের দ্বারা যৌনভাবে নির্যাতিত হয়েছিলো বার বছর বয়সের পর, বিষমকামীদের (সাধারণ যৌন কার্য সম্পাদনকারী) ক্ষেত্রে এর পরিমাণ হল ২৮%।[১১৪]

---

[১১৪] finkelhor d. 1981. The sextual abuse of boys, victimology 6, 76-84,gundlach rH, reiss Bf. 1967. Birth order and sex of siblings in a sample of lesbians and non lesbians. Psychological Reports 20, 61-63

শিশু যৌন নির্যাতনের এক রিপোর্টে ১২%-৩৭% সমকামী বলেছে যে তাদের এই নির্যাতনের অভিজ্ঞতা আছে।[১১৫]

কৈশোরের যৌন কার্যক্রম-

কৈশোরের যৌন কার্যক্রমের উপর যৌবনের যৌন কার্যক্রম অনেকাংশে নির্ভর করে। ভ্যান উইক এন্ড যিস্ট এর রিসার্চে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ লেসবিয়ানরা (নারী সমকামী) পূর্বে নারীদের দ্বারা হস্তমৈথুন করেছে যা তেমনি পুরুষদের ক্ষেত্রেও এই কথাটা প্রযোজ্য।[১১৬] অর্থাৎ কৈশোরের সমকামী-সুলভ আচরণের অনেকে ভবিষ্যৎ এ বিপরীত লিঙ্গের দ্বারা আকৃষ্ট হয় না এবং উত্তেজিত হয় না। বিষয়টা আরো পরিষ্কার করে দেখলে বুঝা যায় পর্ণ আসক্তদের দেখলে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে পর্ণ এডিক্টরা বাস্তব জীবনে যৌনসঙ্গী দ্বারা উত্তেজিত কম হয় কিংবা উত্তেজিত হতে সমস্যা হয়।[১১৭] এর কারণ হলো আমাদের ব্রেন। আমাদের ব্রেনের খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা প্রবল। যখন একজন পর্ণ আসক্ত পর্ণ দেখে উত্তেজিত হয় তখন সে মূলত নিজেকে ছবি/ ভার্চুয়াল ডেটা দিয়ে উত্তেজিত করে আর ব্রেন ও এটার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। তাই যখন ব্রেন বাস্তব অবস্থা পায় তখন সেটা ঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে না ফলে ব্যক্তি তার সঙ্গী দ্বারা প্রবলভাবে উত্তেজিত ও হতে পারে না। সমকামীদের ব্যাপারটাও কিছুটাও এইরকম। শৈশব ও কৈশোরে তাদের বিকৃত যৌন আচরণের সাথে ব্রেন নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় ফলে পরবর্তীতে সে বিপরীত লিঙ্গের দ্বারা উত্তেজিত হতে পারে না।

অশ্লীল পরিবেশে বিকৃত নগরায়ন

১) সমকামিতা বিস্তারে অশ্লীল পরিবেশে বিকৃত নগরায়নের ও ভূমিকা রয়েছে। নগরায়নে যদি বিকৃত, অশ্লীল উপাদানের প্রভাব বেশি থাকে তাহলে সে নগরায়ন সমকামী সৃষ্টি করে। ল'ম্যান[১১৮] এর এক স্টাডি থেকে এই বিষয়টা প্রমাণিত হয়েছে। নিম্নে ল'ম্যান স্টাডির ফলাফল দেখানো হল –

---

[১১৫] ৫১purcell dW, patterson Jd. Spikes pS. 2008. Childhood sextual abuse experienced by gay and bisexual men: understanding the disparities and interventions to help eliminate them. In Unequal Opportunity. Health Disparities Affecting Gay and Bisexual Men in the United States,rJ Wolitski, r Stall, and ro valdiserri,eds. (new York: oxford university press), pp. 72-96.

[১১৬] www.covenenteyes.com

[১১৭] Laumann EO, Gagnon JH, Michael RT, Michaels S. 1994. The Social Organization of Sexuality. Chicago: University of Chicago Press

[১১৮] Bell Ap, Weinberg MS, Hammersmith SK. 1981. Sexual Preference: Its Development In Men and Women (Bloomington, Indiana: Indiana university press.
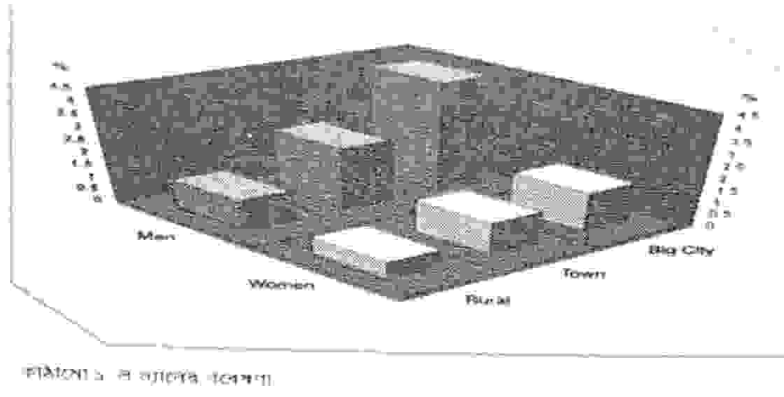
এই রিসার্চ থেকে দেখা যায় যে, বড় শহরের পরিবেশ সমকামিতা সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা পালন করে গ্রাম্য পরিবেশের তুলনায়। পশ্চিমা দেশগুলোর বড় শহরগুলোর পরিবেশ খুবই অশ্লীল ও নোংরা। এজন্য সেখানে 'সমকামিতার' মত বিকৃত যৌন আচরণ দেখা যায়ও বেশি।

অর্থাৎ সমকামিতা বিস্তারে 'পরিবেশ' একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর।

পারিবারিক অবস্থাঃ

বেশিরভাগ সমকামীদের পারিবারিক ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে দেখা যায় যে তাদের সাথে হয় বাবা নাহলে মায়ের সাথে সম্পর্কে খারাপ অথবা তাদের মাতা-পিতার দাম্পত্য জীবন খারাপ।

শৈশবকাল সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ শৈশবকালেই একজন শিশু অন্যকে অনুকরণ করতে শেখে। তাই কোন ছেলের সাথে যদি তার বাবার সাথে ছোট বেলায় খারাপ সম্পর্ক থাকে তখন সেই ছেলের মধ্যে পুরুষত্ব দুর্বলভাবে সৃষ্টি হয়। তেমনি ছোটবেলায় মেয়ের সাথে যদি তার মায়ের সম্পর্ক খারাপ হয়ে থাকে তখনও সেই মেয়ের মাঝে নারীসুলভ স্বভাব দুর্বল্‌ভাবে গঠিত হয়। [১১৯]আর এর ফলে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই 'gender non-conformity' নামক সমস্যার সৃষ্টি হয়। "childhood gender non-conformity"[১২০] একজন ব্যক্তিকে সমকামী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[১২১]

---

[১১৯] Bell Ap, Weinberg MS, Hammersmith SK. 1981. Sexual Preference: Its Development In Men and Women (Bloomington, Indiana: Indiana university press.

[১২০] "childhood gender non-conformity" হচ্ছে, নিজের কি সেক্সের-তা নির্ধারন না করতে পারা। নারী না পুরুষ। শিশুকালে এটা হতেপারে।

[১২১] Bem dJ. 1996. Exotic becomes erotic: a developmental theory of sexual orientation. Psychological Review 103, 320–335, drummond Kd, Bradley SJ, peterson-Badali M, Zucker KJ. 2008. A follow-up study of girls with gender identity disorder. Developmental Psychology 44, 34–45.

পাঠ ১৮।। সমকামিতার কুফল

একটি হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 'আমার উম্মতের মধ্যে যখন পাঁচটি' জিনিস আরম্ভ হবে তখন তাদেরকে নানা প্রকার রোগ ব্যাধি ও আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হবে। তন্মধ্যে একটি হল নর নারীর মধ্যে সমমৈথুন প্রচলিত হওয়া।' (মুসনাদে আহমাদ)

সকল তথ্য – উপাত্ত ও মেডিক্যাল সাইন্সের সকল প্রমাণাদি তার কথারই সত্যতা আমাদের কাছে দিবালোকের মত পরিষ্কার করে দিচ্ছে। সমকামিতা যেমন ব্যক্তির নিজের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে তেমনি সমাজ-সভ্যতার জন্যও মহাক্ষতির কারণ হয়।

সমকামিতার হাজারো কুফলের কয়েকটি এখানে আলোচনা করা হলঃ

সমকামীরাই শিশুকামীঃ

আপনারা ঘেঁটুপুত্র কমলা দেখেছেন। সেই সময়কার সিলেটি জমিদারদের শিশুকামি মনোভাব দেখেছেন। এটার উদ্ভব সেই সমকামিতা থেকেই। এর ফলে – হাজার হাজার শিশুর জীবন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

সমকামীরাই শিশুকামী- এটা একটি নির্মম সত্য। আরো ভয়ংকর ব্যাপার হল এই বিকৃত রুচির সমকামীরা নিজেদের জঘন্য নষ্টামি চরিতার্থ করতে বেছে নেয় নিজেদের পরিবারের শিশুদেরই।

অন্ততঃ পাশ্চাত্যের পরিসংখ্যান তো তাই বলছেঃ

Rape and Abuse Crisis Center এর child abuse নিয়ে প্রকাশিত একটি ভয়ানক রিপোর্ট আমাদের হাতে রয়েছে। সেটা হল- শিশুকামীদের নিয়ে কিছু বাস্তব পরিসংখ্যান। সেখানে বলা হয়েছে- "সর্বোমোট ৯৩% শিশু যৌন নির্যাতন হয়- পরিবারের মধ্যেই"

(Abuse, and Incest National Network: www.rainn.org)

চিন্তা করতে পারেন !!! মাত্র ৭% বহিরাগত ছাড়া ৯৩% মানুষই শিশুর পরিচিত। এটা তো লিস্টেড রিপোর্ট।

কিন্তু ৫০ শতাংশের মত শিশু, সারাজীবন সেটা প্রকাশ করে না। তাই তাদের কথাও- পরিসংখ্যানে আসেনি। কেন তারা প্রকাশ করে নি- এর কারণ এরাও পারিবারিকভাবে

নির্যাতিত। তার মানে দাঁড়ায় প্রায় ঐ লিস্টের বাইরে সব শিশুই পারিবারিকভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।

আরও ভয়ানক তথ্য হল-

এই শিশুকামীদের মধ্যে প্রায় সব্বাই পুরুষ। মহিলার সংখ্যা নিতান্তই কম।[১২২]

American Psychilogical Association আরও ভয়ানক তথ্য হচ্ছে-এইসব abuse এর মধ্যে মেয়ে শিশু এবং ছেলে শিশু প্রায় সমানভাবেই নির্যাতিত।

এই শিশুরা কখনো একবার নির্যাতিত হয় না- নির্যাতিত হয় বারেবারে।

অ্যামেরিকার পুরুষ, বালক যারা যৌন নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে – তাদের সেই অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং রোধ করতে কাজ করছে Male Survivor নামক একটি প্রতিষ্ঠান! তাদের রিপোর্টে উঠে এসেছে প্রতি ৬ জন ১৮ বছরের কম বয়সীবালকদের মধ্যে ১ জন যৌন নির্যাতনের স্বীকার।

এ নিয়ে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে – যে গড়ে ৬ জন বালকের একজন নির্যাতনের স্বীকার- সামাজিকভাবে এদের সুন্দর একটা জীবন উপহার দিতে।

এই কথা অবিশ্বাস্য মনে হতো- যদি না তারা নির্ভরযোগ্য কোনো প্রতিষ্ঠান হতো। তারা তাদের বইতে এই সত্যটুকু তুলে ধরেছেন যা রীতিমত ভয়াবহ অবস্থার দিকেই ইঙিত করে।

এই প্রতিষ্ঠানসহ প্রায় সবাইই-এর জন্য দায়ী করছে পুরুষ সমকামিদের। চিন্তা করতে পারেন একজন ছেলের শৈশবকে কিভাবে ধ্বংস করে এই বিকৃত সমকামীরা।

Homosexuals and the US Military Current Issues এর সেই প্রবন্ধে উল্লেখ আছে-

A person's sexual orientation is considered a personal and private matter, and is not a bar to servie or continued service uness

---

[১২২] কম বয়সি ছেলে-
মানসিকভাবে এবিউজ- .৬৭ */ বৈপরীত্য যৌন আচরণ - .৫২* এবং .৫৪*
কমবয়সী মেয়ে-
মানসিকভাবে এবিউজ - .৬৭ */ বৈপরীত্য যৌন আচরণ - .৪৯* এবং .৪৯*
*$p < .001$
জরিপে নারী- ৩৫৯ জন, পুরুষ-৬১৮ জন
যারা সকলেই শিশুকালে যৌনতার শিকার হয়েছিলো।
এই পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে- corelations between Sel-reported measures of early abuse
জরিপটি উল্লেখ করা হয়েছে-
THE RELATION BETWEEN EARLY ABUSE AND ADULT SEXUALITY বই , যা লিখিত হয়েছে >
Cindy M. MESTON - University of Texas at austin. Julia R. Heiman , University of Washington
Paul D. Trapnell ,Ohio State University at Mansfield এদের বইতে।

manifested by homosexual conduct...

যারা ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে সমকামিতাকে সমাজে বৈধতা দিচ্ছে তারা আসলে সমস্যা অনুধাবনে ই ব্যর্থ হচ্ছেন। তাদের দেখানো পথে সমকামিদের হাত থেকে শিশুদের রক্ষা করা সম্ভব হয় নি- হবেও না। সত্যি বলতে এভাবে সমাধান হয় না, বরং অবাধ স্বাধীনতা সমাজ ধ্বংসের পথকেই আরও প্রশস্ত করে।

KATY নামক একজন সমকামিতাকে রক্ষা করার চেষ্টা করা –The problem with the belief that child sexual abuse causes homosexuality/ bisexuality তার বইতে একজনের মতামত লিখেছেন-

আমি ব্যক্তিগতভাবেই দেখেছি-বেশিরভাগ সমকামি মানুষই শিশুকালেই "শিশু যৌণ নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। (Dimock, 1988) এ বিষয়ে লিখেছেন।

চিন্তা করুন ব্যাপারটা একজন সমকামী, একজন শিশুকেও যৌন নির্যাতন করে তাকেও একজন ভবিষ্যতের সমাকামী করে দিচ্ছে। বাংলাদেশের সমকামীদের ঠিক একই সমস্যা। তাই এটাকে এখনই বন্ধ করতে হবে।

আপনি আজ একে সমর্থন করছেন-কাল আপনার ছেলেই নির্যাতিত হবে সেই ছেলে ঘটনা চেপে যাবে। মানসিক ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছিল- বেশিরভাগ দাগী আসামিই শিশুকালে যৌন নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে লস্ট মডেস্টি টিমের "মুক্ত বাতাসের খোঁজে" বইটি অবশ্যই পাঠ্য।

প্রাপ্ত বয়স্ক সমকামিদের কথায় আসি,

www.forget-forward.org এ Male Survivors Resource Sheet এর প্রথম পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ১২-৩৬% পুরুষ সমকামী তার পার্টনার দ্বারা নির্যাতিত। যে পার্টনারের দৈহিক শক্তি বেশি, সেই প্রভাব বিস্তার করে। এই নির্যাতনের হার নারী নির্যাতনের হারের চেয়েও বেশি। বাস্তব ঘটনা থেকেই আমরা একটা ঘটনা এখানে দিচ্ছি-

বছরখানেক আগেই এক ব্যক্তি ঢাকায় একজনকে হত্যা করে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পন করে। কারণ কি?

ঐ লোক দাবি করে- সেই মানুষটি আমাকে সমকামী হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করতো। তাদের মধ্য সম্পর্ক কি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তার প্রতিউত্তরে সে বলেছিল তারা এক মেসে ভাড়া থাকত।

যাকে হত্যা করা হয়েছে সেই সমকামির পরিবার- সেই ভাড়া করা মেস থেকে কিছু

দূরেই থাকতো? অথচ, সমকামী মানুষটি তার পরিবারের সাথে থাকতো থাকতো না? অনুমান করা যায়- সে পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়েছে এবং একজন তার নোংরা মানসিকতা চরিতার্থ করতে মেসে ভাড়া নিয়ে তার পার্টনার খোঁজে।

এরকম হাজারো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, যার অনেক কিছুই আমাদের কানে আসে না।

বিভিন্ন রোগের প্রকোপঃ

আমরা চিকিৎসা শাস্ত্রের যুক্তিতে দেখেছি সমকামিরা HIV, ক্যানসারসহ বিভিন্ন যৌন রোগের বাহক। এই সমকামিতার মতো বিকৃত যৌনাচার চরিতার্থ করার জন্য যে হরেক রকম বিকৃতপন্থা অনুসরণ করা হয়ে থাকে তার সবকটাই নানা ধরনের শারীরিকও মানসিক সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যে আমরা চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।

কারণ, ক্ষতি সবই তো জানা হলো। এখন সমকামী স্বাভাবিক জীবনে আসতে চাই, সেক্ষেত্রে তার কিকরণীয় বা কিভাবে এগুতো হবে তা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ে আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ্।

পাঠ ৬৭।। চলো নীড়ে ফিরি

সমকামী হবার পিছনে দুটো মূল কারণ আমার সিদ্ধান্তে এসেছে। দুটোই বয়সন্ধিকালের আগেই গড়ে ওঠে। মানে কারও সমকামী হয়ে ওঠাটা তার বয়ঃসন্ধির আগেই ঠিক হয়ে যায়। এখানে প্রাসঙ্গিক কারণটা হল— **বোনদের মাঝে বেড়ে ওঠা**। নিজের লৈঙ্গিক স্বকীয়তা অনুভব না করা। এরকম একাধিক কেস আমি পেয়েছি। দুই বা তিন বোনের এক ভাই। ছোটবেলা থেকেই বোনদের সাথে থাকে, বোনরা সাজায়, বোনরা ছেলেদের গল্প করে, সে শোনে, মুগ্ধ হয়। মা হয়তো ভাবে, বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। বাবাও কেয়ার করে না, বা সময় দেন না। ধীরে ধীরে নারীর বদলে পুরুষের প্রতি আকর্ষণ গড়ে ওঠে। অতীত নোংরা জীবন থেকে তাবলীগের মাধ্যমে দীনের বুঝ পেয়েছেন, এখন ট্রান্সজেন্ডার-হিজড়াদের মাঝে মেহনত করছেন, এক ভাই জানিয়েছেন: আপনারা যেমন নারী থেকে নজরের হিফাজত করেন, আমাকে সব ছেলে থেকে চোখ বাঁচিয়ে চলতে হয়। কত কষ্ট করে ইজতেমায় আসি আমি জানি। আরেক মেডিকেল পড়ুয়া, খুব চেষ্টা করছেন সংশোধনের, ৩ বোনের একভাই। বাবা প্রবাসী। ঝরঝর করে কেঁদে দিলেন, বাবা না থাকায়, বয়ঃসন্ধির আগে কেউ চিনিয়ে দেয়নি যে তুমি ছেলে। মেয়েদের মত সাজাতো বোনেরা, সবাই মজা পেত দেখে। ধীরে ধীরে নারীসুলভ মুভমেন্ট এসে গেল।

ইসলামের বিধান খুব ক্লিয়ারকাট। একটা বয়সের পর ভাইবোন এক বিছানায় শোবে না, একসাথে থাকবে না। পুরুষ কখনোই নারীর পোশাক পরবে না, নারী পুরুষের পোশাক পরবে না। বাবার সংস্পর্শে শিশু পুরুষ হয়ে ওঠে, শিশুরা বাবার মত হতে চায়। **এজন্য বাবারা ছেলেশিশুদের সময় দেবেন। হাত ধরে মসজিদে নেয়া, একসাথে বল খেলা, বিকেলে বাবার হাত ধরে বেড়াতে নেয়া, সাহাবাদের বীরত্বের ঘটনাগুলো শোনানো। বাজার করতে নিয়ে যাওয়া, কিছু বাজারের ব্যাগ টানানো।** এগুলো করতে হবে, বিশেষ করে যদি বড়বোনেরা থাকে, তাদের প্রভাব ও জীবনাচার থেকে শিশুকে বের করে আনতে হবে। সে যেন বুঝে নেয় শক্তি খরচের কাজগুলো আমাকে করতে হবে, আমি ছেলে, আমার বোনেরা করবে না এগুলো। **শক্তিমত্তা, বীরত্ব এগুলো যেন তার প্যাশন হয়; সাজগোজ আর পুতুলখেলা না।**

সমকামীদের উদ্দেশ্যে...

আল্লাহ তাআলা একমাত্র শিরকের গুনাহ ছাড়া সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন। [১২৩]বান্দা যদি এক পৃথিবী সমান গুনাহ নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হয়, তবে আল্লাহও এক দুনিয়া সমান রহমত নিয়ে তার সামনে হাজির হবেন। আল্লাহর ক্রোধের উপর তাঁর রহমত বিজয়ী। আল্লাহ গুনাহ মাফ করার ক্ষেত্রে কারো পরোয়া করেন না। যতক্ষণ বান্দা তাওবা করে, মাফ চায়, নিরাশ না হয়, ততক্ষণ আল্লাহ তার গুনাহকে মাফ করেন। সুতরাং হতাশ হবেন না ভাই। ফিরে আসুন। চেষ্টা করুন। আবার চেষ্টা করুন।

বিদেশে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে কনভার্সনের বহু নজীর আছে। যদিও তারা সর্বশক্তি দিয়ে মিডিয়া থেকে রাষ্ট্রযন্ত্র সব ব্যবহার করে 'কনভার্সন থেরাপি'র বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের ১৮ টা রাজ্যে এই থেরাপি নিষিদ্ধ করিয়েছে, American Psychiatric Association-কে দিয়ে 'ক্ষতিকর' ফতোয়াও বের করেছে। তারপরও ওদের হিসেবেই ৬৯৮,০০০ LGBTQ+ কনভার্সন থেরাপিস্টদের শরণাপন্ন হয়েছে।[১২৪] এবং আরও ২০,০০০ LGBTQ+ কিশোর-কিশোরী ১৮ বছর বয়েসের আগেই এসব থেরাপি নিতে যাবে বলে তারা ধারণা করছে।[১২৫] এ থেকে বুঝা যায়, ওরা শান্তিতে নেই। এই খাহেশাতের জীবন কীভাবে শান্তি দিতে পারে? শান্তি তো কেবল ইসলামে, আল্লাহর হুকুমে আর নবীর জীবনপদ্ধতিতে। কনভার্সন থেরাপির বিরোধিতায় সবচেয়ে যে কারণগুলো তারা দেখাচ্ছে:

তারা বলছে, সমকামিতা কোনো মানসিক রোগ না যে তাকে থেরাপি দিয়ে বদলাতে হবে। এটা স্বাভাবিক ও পজিটিভ আরেকটা ধরনমাত্র।

'আমি খারাপ কাজ করছি' থেরাপিস্টরা এই ধারণা জন্মাচ্ছে ক্লায়েন্টদের মধ্যে।

---

[১২৩] কোনো গুনাহ হতে তাওবাহ করা ছাড়া কেউ মারা গেলে তার ক্ষেত্রে এই কথা, আর তাওবাহ করলে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন। এমনকি শিরক-কুফরের গুনাহও তাওবাহ করলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন।

[১২৪] According to the UCLA Williams Institute on Sexual Orientation and Gender Identity Law and Public Policy, as of 2018, almost 700,000 lesbian, gay, bisexual, transgender and queer/questioning (LGBTQ) adults in the U.S. had received "conversion therapy"; in addition, an estimated 57,000 youths will receive change efforts from religious or health care providers before they turn 18 years old.
https://www.ama-assn.org/system/files/2019-03/transgender-conversion-issue-brief.pdf
https://www.insider.com/conversion-therapy-lgbtq-community-discredited-banned2019-9

[১২৫] https://www.newsweek.com/20000-lgbtq-teens-gay-conversion-therapy-1452999

ফলে আত্ম-অনুশোচনা (self-blame) তৈরি করে যা আরও দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিকর। এর পক্ষে রিসার্চ বানানো তো দুই মিনিটের ব্যাপার।

আর থেরাপির এক পর্যায়ে ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে অ্যাভারশান করায়, যেটা মেনে নেয়া যায় না।

সমকামী এক্টিভিস্টদের এইসব প্রোপাগান্ডার বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন আমেরিকান ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট Dr. Joseph Nicolosi, যিনি ক্যালিফোর্নিয়ার Thomas Aquinas Psychological Clinic-এর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মতে সমকামিতা জন্মগত নয়, বরং পরিস্থিতির সাথে একধরনের খাপ খাওয়ানো (adaptation to trauma)। **তিনি মনে করেন সমকামিতা কেবল নিজের জৈবিক গঠনের বিরুদ্ধাচরণই নয়, বরং নিজের ব্যক্তিত্বের সাথেও পৌনঃপুনিক এক সংগ্রাম।** মোদ্দাকথা তিনি মনে করেন, সমকামিরা নিজেদের পরিচয় নিয়ে সমকামী জীবন নিয়ে সুখী নয়। এজন্য ১৯৮১ সাল থেকে তিনি শুরু করেন Reparative therapy. এটা কনভার্সন থেরাপি নয়, বরং পুরোটাই মানসিক থেরাপি। তাঁর ক্লায়েন্ট হচ্ছে তারা যারা মনে করে, আমি আসলে সমকামী হতে চাইনা, কিন্তু সমকামী আকর্ষণ আমাকে সমকামী হতে বাধ্য করে। বিশেষ করে ছোটবেলায় যৌন নির্যাতন বা নারীজাতির প্রতি বিতৃষ্ণাজনিত শীতলতা থেকে যারা সমকামের পথে গেছে, এমন শত শত মানুষ তাঁর এই থেরাপি দ্বারা উপকার পেয়েছে। ১৯৯২ সালে আরও দু'জন সাইকিয়াট্রিস্টকে সাথে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন National Association for Research and Therapy of Homosexuality (NARTH). 'সমকামিতা অপরিবর্তনযোগ্য নয়'— এই বিশ্বাসে Dr. Joseph Nicolosi একা নন, আছেন American Psychological Association-এর সাবেক দু'জন প্রেসিডেন্ট Nicholas Cummings, Ph.D এবং Robert Perloff, Ph.D. বহু ফিরে আসা সমকামীদের সাফল্যের কাহিনী পাবেন Dr. Joseph Nicolosi (2017-1947)-এর ওয়েবসাইট https://www.josephnicolosi.com/ এ।

অবশ্য আমাদের দীনই তো সবচেয়ে বড় কাউন্সেলিং। মৃত্যু হচ্ছে সর্বোত্তম নাসীহা। দুনিয়ার এই অল্প ক'টা দিন নিজের মনকে শেকলে আবদ্ধ করে রাখাটাই তো কাজ। মুমিন মাত্রই পরীক্ষায় থাকবে। আল্লাহ তো নিজেই বলেছেন: মানুষ কি মনে করে কেবল 'ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, তাদের কোনো পরীক্ষা নেয়া হবে না?[১২৬]। কারও পরীক্ষা সম্পদের, কারও সম্পর্কের, কারও বিপদাপদের, কারও অসুখবিসুখের। **আপনাদের এই 'ভুল আকর্ষণ'ও আপনাদের একটা পরীক্ষা।**

---

[১২৬] সূরা আনকাবুত: ০২

এবং এই পরীক্ষা আমাদের দিতে হবে, হোঁচট খেলেও বার বার উঠে দাঁড়াতে হবে। আপনি পারবেন। বান্দা হারাম ছেড়ে হালালের উপর চলতে চাইবে আন্তরিকভাবে, আর আল্লাহ সাহায্য করবেন না, এটা হতেই পারে না, পারে বলেন? এই মুহূর্ত থেকে—

সকল প্রাক্তন সঙ্গীর নাম্বার ডিলিট করুন

ফোন নাম্বার চেঞ্জ করুন।

ফেসবুক ডিএক্টিভ করুন। একাউন্ট ডিলিট করুন।

মসজিদে দীনী সার্কেলে সময় বেশি দিন। দীনী কাজে ব্যস্ত থাকুন।

কোনো পুরুষের প্রতি দুর্বলতা অনুভব হলে তার সংস্রব পরিহার করুন, তার থেকে নজরের হেফাজত করুন।

পর্নো ও হস্তমৈথুন ছাড়তে এতক্ষণ যা যা আলোচনা হল (কুররাতু আইয়ুন-২), সেগুলো সমকামিতার ক্ষেত্রেও চর্চা করুন।

কাউন্সেলিং-এর জন্য দুইজন সাইকিয়াট্রিস্টের নাম দিচ্ছি—

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ **ডা. বুলবুল (উত্তরা ক্রিসেন্ট হাসপাতাল) ও ডাক্তার মারুফ (হলি লাইফ, মালিবাগ রেলগেট)**

আর যদি যৌনবাহিত কোন রোগ সন্দেহ করেন তবে দীনদার চর্ম ও যৌন বিশেষজ্ঞ **ডা. আবদুল্লাহেল কাফী স্যার (খিদমাহ হাসপাতাল)**-কে দেখাতে পারেন।

যুলফিকার নকশবন্দী হাফিযাহুল্লাহ্-র ছাত্র বাংলাদেশের শাইখ উমায়ের কোব্বাদি হাফিযাহুল্লাহ। যুবকদের উপর আলাদা দরদ নিয়ে বয়ান করেন। ইউটিউবে তাঁর সূরা ইউসুফের তাফসীরগুলো শুনতে পারেন। সালাফী, মওদূদী প্রভৃতি মানহাজ নিয়ে গতানুগতিক মতামতগুলো ইগনোর করলে 'যৌবন রিলেটেড গুনাহ' নিয়ে তাঁর কথাগুলো দিলে খুব প্রভাব ফেলে। আমি খুব ফায়দা পেয়েছি, আল্লাহ তাঁর ছায়াকে দীর্ঘায়িত করুন। বয়স ৩৪-৩৫ হবে, নিজে যুবক বলে যুবকদের সমস্যা খুব ভালো বোঝেন ও সাহায্য করেন। শাইখের সাইট

http://quranerjyoti.com/ এবং ইউটিউব চ্যানেল https://www.youtube.com/channel/UCUdzrw9ArKmQesHbL75aoag

ঢাকায় যাঁরা থাকেন, পর্নোগ্রাফি-হস্তমৈথুন-সমকামিতায় আক্রান্ত, সরাসরি শাইখ উমায়ের-এর সাথে দেখা করে নিজ সমস্যা জানিয়ে সরাসরি প্রেসক্রিপশান নিতে

পারেন। **আগারগাঁও, ষাট ফিট রাস্তা, বারেক মোল্লার মোড়, ডানদিকে খেজুরতলা মসজিদ।** শাইখ এই মসজিদের খতিব ও ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। শাইখ উমায়ের- এর সোহবতে যান, তাঁর বাতানো পদ্ধতিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জন করুন। গুনাহ ছাড়া কঠিন হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়।

শারীরিক সমস্যাগুলোতে উপরের পরামর্শ অনুযায়ী আমল করুন।[১২৭]

ভয়ঙ্কর আঁধার রাত্রি শেষে পাখির কিচিরমিচিরের সাথে ফুটবে ভোরের আলো। সেই শুদ্ধ হাওয়ায় দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নেব এদকদিন। এমন শুদ্ধ সকালের প্রতীক্ষায় কাটুক আমাদের রাত্রিগুলো। প্রতীক্ষার শিখাটুকু যেন নিভে না যায় হতাশার ফুঁৎকারে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

---

[১২৭] (মাকতাবাতুল আসলাফ থেকে প্রকাশিত, “কুররাতু আইয়ুন-২” এ পাবেন)

জার্নি টু ম্যানহুড [১২৮]

বেশ ক'বছর থেকে হঠাৎ করেই আমাদের সমাজে সমকামিতার মত একটা জঘন্য অন্যায়কে জোর করে টেনে আনা হচ্ছে।বলা হচ্ছে, সমকামিতা একটা ন্যাচারাল বিষয়, সমকামীদেরকে সমর্থন করতে হবে। এক অমুসলিম সমকামী লোকের লেখা পড়েছিলাম অনেক দিন আগে, সে সমকামিতা থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। তার লেখাটাই অনুবাদ করে দিলাম। তার সাথে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে, তবে "গে" হওয়া যে কোনো ন্যাচারাল বিষয় না, আর গে থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা যায়, সেটাই এই লেখা থেকে শিক্ষা নেওয়ার বিষয়।

—

"আমার মনে হয়, আমি দুর্ঘটনাবশত "স্ট্রেইট" হয়ে গেছি। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। আমি থেরাপি নিচ্ছিলাম। তবে স্ট্রেইট হতে চাই এমন কোন পরিকল্পনা থেকে সেটা নেওয়া হয়নি। আমার মাঝে কমিটমেন্ট রাখা নিয়ে কিছু সমস্যা ছিল, সেটা বদলাবার আশাতেই থেরাপির শরণাপন্ন হওয়া। যৌনতা পরিবর্তনের ইচ্ছা আমার কোনোকালেই হয়নি। অথচ শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়েছে! আমার সব কিছুই বদলে গেছে।

বিশ্বাসই হয় না, কয়েকশ'রও বেশি সমকামী পার্টনারের সাথে থাকার পর আমি কিনা বিয়ে করেছি একজন নারীকে! এমনকি আমাদের একটা সন্তানও আছে। সত্যি বলতে, আমার জীবনটাই পুরোপুরি বদলে গেছে। আগে খুব কোলাহল-প্রিয় ছিলাম। যেখানে যেতাম, সবার চেয়ে গলার স্বর উঁচু থাকত আমার। সবার সাথে গলাবাজি আর উদ্ধত আচরণ করতাম। নিজের ভেতরকার অনিশ্চয়তা লুকিয়ে রাখতে তটস্থ হয়ে থাকতাম, তাই হইচই করে বেড়াতাম, হট্টগোল আর দেমাক দেখিয়ে আমার নিরাপত্তাহীনতা চাপা দিতে চাইতাম। এখন আমার স্বভাব-চরিত্র একদম বদলে গেছে। তেজী, আশাবাদী একজন মানুষে পরিণত হয়েছি। যুদ্ধের মুভিগুলো দেখতে ভালো লাগে। ৪৬ বছর চলছে। এই ৪৬ বছরের মধ্যে নিজেকে নিয়ে এতটা খুশি আর কখনোই হই নি।

আমার কাহিনীর গভীরে যাওয়ার আগে শুরুটা বলি।

---

[১২৮] [মূল লেখক জেমস পার্কার একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে কাজ করেন, যার নাম: জার্নি টু ম্যানহুড। প্রোগ্রামটি "পিপল ক্যান চেইঞ্জ" নামের একটি শিক্ষা ও সহযোগিতামূলক সংস্থা দ্বারা পরিচালিত।] কৃতজ্ঞতাঃ অনিকা তুবা।

শুরুটা হয়েছিল এভাবে

—

তখন আমার বয়স দশ কি এগার। আমার এক ছেলে কাজিন একদিন আমাকে বলল সে নাকি গে। আর তখনই আমার মনে হল, আমার আকর্ষণও আসলে একই রকম। দশ-এগারো বছর বয়স থেকে ছেলেরা মেয়েদের ব্যাপারে কৌতূহলী হতে থাকে, কিন্তু আমার আগ্রহ ছিল ছেলেদের প্রতি।

আমার টিন-এইজ জীবনটা যেন এক রকম নরকের মধ্যে কাটতে লাগল। মাঝেমধ্যেই আত্মহত্যার কথা ভাবতাম, কখনও কখনও নিজের শরীরের বিভিন্ন ক্ষতি করতাম। ওদিকে মদ খাওয়া, পর্নোগ্রাফির সমস্যা বাড়ছে তো বাড়ছেই। সমকামীদের তৈরি বাজে সব ভিডিও-ক্লিপ দেখতাম। আমার বয়স যখন সতেরো চলছে, একদিন চোখের পানিতে ভেসে বাবা-মায়ের সামনে হাজির হলাম। কিন্তু আমার বাবা-মা সত্যিই অসাধারণ! তারা বললো, তারা আগে থেকেই আমার গে হবার ব্যাপারটা জানত। তারা আমাকে আশ্বস্ত করল, আমি গে হলেও তারা আমাকে নিঃস্বার্থভাবেই ভালোবাসবে। আমার স্কুলের বন্ধুবান্ধবেরাও বলল, তারাও নাকি আমার বিষয়টা বেশ কিছুদিন থেকেই টের পেয়েছে। তারাও আমাকে সমর্থন করল। সব মিলিয়ে আমার "গে" হিসেবে আত্মপ্রকাশের সময়টা মারাত্মক ভয়াবহ বা যন্ত্রণাদায়ক কিছু ছিল না।

আঠারো বছর বয়সে, আমি নর্থ ইংল্যান্ড থেকে লন্ডনে চলে আসি। ততদিনে আমি গে হওয়াকে নিজের পরিচয় হিসেবে পুরোপুরি গ্রহণ করে নিয়েছি। আমার ভার্সিটিতে যে বিভাগে আমি পড়তাম, সেখানে আমিই সর্বপ্রথম গে হিসেবে জনসম্মুখে নিজের এই পরিচয় দিয়েছি। এমনকি ভার্সিটিতে একটা গ্রুপও খুলে ফেললাম। এলজিবিটি গ্রুপ। ছাত্রছাত্রীদেরকে জোরেসোরে বোঝাতে শুরু করলাম – যারা বলে গে হওয়াটা মানুষের ইচ্ছাধীন কিংবা গে হওয়া ভুল, তারা একেবারেই সঠিক না।

যা বলছিলাম, আমার কখনোই বদলাবার দরকার হয়নি। আমি জন্মেছি গে হয়ে, এটাই সবসময় জেনে এসেছি। ব্যাস খতম। আমি বড়ো হয়েছি ক্রিশ্চিয়ান হিসেবে, লন্ডনের সমকামী ক্রিশ্চিয়ানদের আন্দোলনে নিয়মিত যোগ দিতাম, কিন্তু খেয়াল করলাম আমি আসল মজা পাই শহরের সমকামীদের ক্লাবগুলোয় যখন নাচ-গান-পার্টি আর নেশা করি, তখন। অতিরিক্ত কামুক আর বিশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করলাম। আমার ধারণা, সে সময় আমার পার্টনারের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে গেছে।

শেষমেশ আমি বহুদিনের পুরোনো এক বয়ফ্রেন্ডের সাথে সেটল করলাম। সে একজন এক্স-সৈনিক, ফকল্যান্ড দ্বীপের পশুচিকিৎসক। আমরা ভাবছিলাম, দেশের

বাইরে কোথাও গিয়ে বিয়ে করবো – অন্ততপক্ষে সামাজিকভাবে স্বীকৃত একটা সম্পর্ক শুরু করব। কিন্তু ঠিক সে সময়েই আমি অন্য আরেকজনের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লাম। তার নাম ক্রাইস্ট। এই সম্পর্কটাই আমাকে আমার জীবনটা গভীরভাবে যাচাই করার সুযোগ দেয়।

আমি বুঝতে পারলাম, আমার কিছু সমস্যা আছে। কমিটমেন্ট নিয়ে সমস্যা। আমি কারো সাথেই অঙ্গীকারবদ্ধ হতে পারিনা। আরও আবিষ্কার করলাম, আমি কারো থেকে "না" শুনতে পারিনা। আমার মধ্যে প্রত্যাখ্যিত হওয়া নিয়ে অসম্ভব একটা ভয় কাজ করে। ছোটোবেলা থেকেই আমি সব সময় বাড়াবাড়ি রকমের বিচলিত থাকতাম। আমার আশেপাশের মানুষদের ব্যবহার করতাম। আমার ভেতর জন্মগতভাবে পুরুষদের প্রতি একটা ভয় ছিল — তারা সমকামিতাকে ঘৃণা করে সেটাকে আমি ভয় পেতাম না; বরং ভয়টা ছিল অন্য জায়গায়। আমার ভয় হতো পুরুষদের দেখে। আমার আর একজন সাধারণ "heterosexual" পুরুষের মাঝে যে বিস্তর ফারাক, সেটাই ছিল আমার ভয়ের মূল কারণ।

আমি সবকিছু নতুন করে শুরু করার চেষ্টা করলাম। বহুদিনের পুরোনো পার্টনারের সাথে সম্পর্কের ইতি টানলাম। এক বন্ধুর পরামর্শে থেরাপি নিতে শুরু করলাম যাতে আমার কমিটমেন্ট রাখার বিষয়টা সারিয়ে তোলা যায়। থেরাপিতে গিয়ে যেসব সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি, তার কোনটাই পাশবিক, নির্মম বা বিধ্বস্ত হবার মতো কিছু ছিল না। কিছু কিছু "গে থেকে স্ট্রেইটে রূপান্তর" ডকুমেন্টারিতে যেসব ভয়ঙ্কর কাহিনি শোনা যায়, তার কোনটাই আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমার থেরাপিটা ছিল মূলত কয়েকটা চিন্তাগত ও আচরণগত থেরাপির সমন্বয়। আমাকে আমার মজ্জাগত বিশ্বাসগুলো নিয়ে প্রশ্ন করা হল, আমার চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা নিয়ে প্রশ্ন ছোঁড়া হত। আমার একপেশে ভাবনাগুলোকে যেন উপড়ে ফেলা যায়, আমার বহু বছরের বদ অভ্যাস, আমার সমস্যাপূর্ণ আচার-আচরণগুলোকে যেন বদলানো যায়, সেটাই ছিল এ থেরাপির উদ্দেশ্য।

আমি কেন খালি পুরুষদের প্রতি আকর্ষিত হই, তা নিয়ে আমার বা আমার থেরাপিস্ট কারোরই তেমন মাথাব্যথা ছিল না। তবে সঙ্গত কারণেই আমার গে হওয়া নিয়ে কথা বলাটা আলোচনার একটা অংশ ছিল, কারণ তা নাহলে আমার জীবনের একটা বড় অংশকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। পুরো সময়টায় একটা মূল কাজ ছিল- ক্ষমা করে দেওয়া। যাদেরকে মাফ করে দেওয়া প্রয়োজন, তাদেরকে মাফ করে দেওয়া। আর আরেকটা ব্যাপার, আমি আমার খুব কাছের কিছু মানুষের সাথে যে দেয়াল তৈরি

করেছিলাম, বিশেষ করে আমার বাবা-মা ও ভাইবোনের সাথে, সেটা বোঝা।

ধীরে ধীরে আমার কাছে পুরো বিষয়টা পরিষ্কার হতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম, আসলে বালক অবস্থায় আমি অন্যান্য পুরুষদের সাথে ভালোভাবে মিশতে পারতাম না। ছোটোবেলা থেকেই ভাবতাম যে আমি অন্য পুরুষদের থেকে প্রত্যাখ্যিত হচ্ছি। আর তাই নিজের অজান্তেই নিজের ভেতর একটা প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিলাম যে কখনও ছেলেদেরকে পুরোপুরি বা গভীরভাবে বিশ্বাস করব না। কেউ যখন আমার কাছে আসত, আমি তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতাম আর নিজেকে বড় ভাবতাম। আমার বাবা আর বড় দুই ভাইয়ের সাথেও আমি এমন আচরণই করেছি। তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। কাজেই "পুরুষ" ব্যাপারটা আমার জন্য রহস্যময় হয়ে দাঁড়াবে, সেটাই স্বাভাবিক। আর টিন-এইজে সেই রহস্যময়তা নেশায় রূপ নিল, আমি পুরুষ লোকের প্রতি দৈহিকভাবে আকর্ষিত হতে শুরু করলাম। সেই সাথে পর্নের মাধ্যমে নিজের এই সমস্যাটা দিনকে দিন আরো উসকে দিতে লাগলাম।

আমি বুঝতে পারলাম আমি নিজেকে নিঃসঙ্কোচে নারীদের জগতে ঠেলে দিয়েছিলাম। আমার পৌরুষত্ব এই সিদ্ধান্তের বিপরীতে কোনো প্রভাব খাটাতে পারেনি। অথচ আমি নারীদেরও ঘৃণা করতাম! তারা এত সহজে সাধারণ (স্ট্রেইট) ছেলেদের মন ভুলাতে পারত যে আমার অসহ্য লাগত। কেননা আমি গে হয়ে এই কাজটা কখনোই করতে পারতাম না। আমি আবিষ্কার করলাম যে আমার স্থান স্বাভাবিক ভাবেই নারীদের মধ্যে নয়। আবার নিজেকে আমি পুরুষদের মধ্য থেকেও বের করে এনেছি।

আমার অস্তিত্বের একদম কেন্দ্রীয় অনেক ব্যাপারকে চ্যালেঞ্জ করা হল – আমার চেহারা, আমার দেহ, আমার হাঁটার ভঙ্গিমা — আমার থেরাপিস্ট আমাকে একটা চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন: কোন কোন ব্যাপারে আমি বাকি সব পুরুষের মতো ছিলাম, আর কোন কোন ব্যাপারে ছিলাম না। তিনি আমার গলার স্বর, চালচলন নিয়েও কাজ করছিলেন। সত্যি বলতে, আমাকে ভিন্ন ভাবে চিন্তা করার আর ভিন্ন ভাবে আচরণ করার একটা সুযোগ দিচ্ছিলেন।

আমার ভয়, উদ্বেগ আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগল। একটা সময় এমন হল যখন নারী-পুরুষ সবার কাছেই নিজেকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হতে লাগল। আমার পুরুষ পরিচয়কে এতদিন পুরোপুরি অস্বীকার করে এসেছি, সেটাই এখন পুরোপুরি গ্রহণ করে নিলাম। আমার দাঁড়ানোর ভঙ্গি বদলে গেল, সোজা হয়ে দাঁড়াতাম। আগের মতো মেয়েলি ভাবে আর হাঁটতাম না, বড় বড় পা ফেলে একজন পুরুষের মতো হাঁটতে শুরু করলাম। এমনকি আমার গলার স্বরও পাল্টে ভারি হয়ে গেল। এতো সুন্দর ভরাট

স্বর যে সবাই নিয়মিতই আমাকে আমার গলার স্বর নিয়ে কিছু একটা মন্তব্য দিতে লাগল।

আমার মনে হল, হয়তোবা আমি কখনোই সত্যিকার অর্থে গে ছিলাম না। হয়ত আমার মাঝে সবসময়ই এমন একজন পুরুষ ছিল, যে সত্যিকারের পুরুষ, যে এমন একজন উন্নত পুরুষ — যেমন পুরুষদেরকে আমি বরাবর শ্রদ্ধার চোখে দেখেছি। হয়ত আমার ভেতরের এই পুরুষটি সবসময় মুক্ত স্বাধীন হওয়ার অপেক্ষায় ছিল।

নারীদের সাথে দৈহিক মেলামেশা অনেক বেশি আনন্দায়ক লাগতে লাগল, এমনকি একজন নারীর চুলে হাত বুলিয়ে দেওয়ার মাঝেই যে কত আনন্দ আছে সেটা বুঝতে পারলাম। একজন পুরুষ হবার আনন্দ উপভোগ করতে লাগলাম। নারীদের সঙ্গ বেশি প্রিয় হয়ে গেল। এর মানে এই না যে, আমি যত নারীকে দেখেছি সবার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছি! আমি উত্তপ্ত তরুণ ছিলাম না। বরং এটা ছিল একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যার ফলস্বরূপ প্রেম এবং সম্পর্ক শুরু হয়েছে।

আজ আমি একজন নারীর স্বামী।

আট বছর যাবৎ আমরা বিবাহিত আছি।

আর আমাদের একটা পাঁচ বছর বয়সী মেয়েও আছে। আর্ট আর থিয়েটার ভালোবাসি। তবে টিম স্পোর্টসগুলো প্রচণ্ড টানে। আমার খুব প্রিয় একটা মুভি হলো– সেভিং প্রাইভেট রায়ান, এই মুভিতে ভ্রাতৃত্ববোধ আর পুরুষদের অন্তর্বর্তী বন্ধুত্বকে দেখানো হয়েছে — যেই অসাধারণ জিনিসটা আমি আগে কখনোই উপভোগ করিনি।

অনেকে জিজ্ঞেস করে, আমি কি এখন পুরোপুরি একজন heterosexual? হ্যাঁ, প্রায় পুরোটা সময়ের জন্য এটাই সত্যি। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের জীবনেই এমন কিছু সময় আসে যখন যৌনতা বেশ বায়বীয় পর্যায়ে থাকে।

হঠাৎ হঠাৎ আমার ক্ষেত্রেও সেটা সত্যি। তবে আমি আমার ফেলে আসা গে লাইফস্টাইল মোটেও মিস করি না। আমার থেরাপিরও প্রায় পাঁচ বছর পরে, পুরোনো বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করেছিলাম। গে জীবনযাপনের ক্ষতিকর দিকগুলো তখন খুব ভালোভাবেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমার এক্স-বয়ফ্রেন্ডের গলার স্বর দেখলাম একেবারে মেয়েলি আর কেমন দুর্বল হয়ে পড়েছে, শুধু তাই নয়, সে ততদিনে এইচআইভি-ও বাধিয়ে ফেলেছে।

সেই মুহূর্তে একটা ব্যাপার খুব ভালোভাবে বুঝতে পারলাম – আমার থেরাপি নেওয়ার সিদ্ধান্ত এবং বিকৃতভাবে গড়ে ওঠা যৌন-আকর্ষণকে সারিয়ে তোলার জন্য

পরবর্তীতে নেওয়া আরেকটি থেরাপি শেষপর্যন্ত আমাকে রক্ষা করেছে!

তবে আমার জীবনের পরিবর্তনগুলোর কারণে আমি কাউকে জোর করে বদলে যেতে বা "ধর্মপরিবর্তন" করে গে থেকে স্ট্রেইটে পরিণত হতে বলব না। কারো নিজেকে "কনভার্ট" হবার জন্য বাধ্য মনে করার দরকার নেই।

তবে একটি কথা বলব, আমি বিশ্বাস করি, মানুষ জন্মগত ভাবে গে হয় না। এবং যে কেউ-ই চাইলে নিজের ভেতর বাস করা লুকোনো সত্তাটি বের করে আনতে পারে। সেই সত্তা যেখানে আমি আমার পৌরুষত্বকে খুঁজে পেয়েছি।"

লেখক পরিচিতি

মুফতি জাফিরুদ্দিন মিফতাহি রাহিমাহুল্লাহ

তিনি দারুল ইফতার (দারুল উলুম দেওবন্দ) একজন জেষ্ঠ মুফতি ছিলেন। দারুল উলুমের ১২ খন্ডের জনপ্রিয় ফাতওয়া সংকলন তিনিই করেছিলেন। তিনি একাধারে একজন লেখক, বাগ্মী বক্তা ও শিক্ষক ছিলেন। তিনি মাওলানা মানাযির আহসান গিলানির কিছুবই সম্পাদনার পাশাপাশি উর্দুয় ডজেনখানেক বই রচনা করেছিলেন। "ইসলাম কা নিযাম ই ইফফাত ও ইসমাত", "দারুল উলুম মাসলাক" তাঁর পাঠকপ্রিয় রচনা। পাঁচ খন্ডের কুরআন এর অনুবাদ ও ব্যাখাগ্রন্থ ও তিনি রচনা করেছিলেন। ইংরেজি ভাষায়ও তাঁর কিছু বই অনূদিত হয়েছিল।

ধারভাঙ্গা (বিহার) জেলার পুরানোদিহায় ১৪২৬ হিজরীতে (১৯২৬ সাল) মুফতি জাফিরুদ্দিন মিফতাহি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে মুফতি সাহেব, শাইখুল হাদিস হাবিবুর রহমান মুহাদিস আযমি সহ বিশিষ্ট উলামাদের তত্ত্বাবধানে মিফতাহুল উলুম মাও (উত্তর প্রদেশ) থেকে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করেছিলেন। সাঈদ সুলায়মান নাদভি, মাওলানা মিন্নাতুল্লাহ রাহমানি ও মাওলানা মানাযির আহসান গিলানি দ্বারা তিনি অনেক প্রভাবিত ছিলেন।

১৯৫৬ সালে, হাকিমুল উম্মাত ক্বারী মুহাম্মাদ তৈয়ব রাহিমাহুল্লাহ এর আমন্ত্রণে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে একজন গবেষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি দারুল উলুমে বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছিলেন। প্রথমত, তিনি মুফতি আযিসুর রহমানের ১২ খন্ডের "ফাতওয়া দারুল উলুম" সংকলন করেন। তিনি দারুল উলুমের প্রধান পাঠাগারের পরিচালনার পাশাপাশি একে সুসম্বদ্ধ করেছিলেন । তিনি দারুল উলুমের উর্দু মাসিকিতে সম্পাদকের দায়িত্বের পাশাপাশি ১৭ বছর সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। সরলতা, নিগূঢ়, নির্ঝঝাট আর চিত্তহারী গুন ছিল তাঁর লেখনীতে।

শারীরিক অবস্থার অবনতির দরুন ২০০৮ সালে তিনি দারুল উলুম ছেড়ে যান এবং শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত (৩১ মার্চ ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ) তাঁর গ্রামের বাড়ি দারভাঙ্গায় কাটিয়েছিলেন।

ড্যানিয়েল হাকিকাতজু

টেক্সাসের হাস্টন শহরে জন্মগ্রহণকারী একজন মুসলিম। যিনি হার্ভাড থেকে পদার্থে স্নাতক শেষে, দর্শনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। তিনি মূলত মুসলমান, পাশ্চাত্যবাদ ও আধুনিকতা সম্পর্কিত সমসাময়িক বিষয়ে "চিন্তার ভিতরে যেয়ে চিন্তার" আলোচনার জন্য বিখ্যাত। তিনি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সেমিনারে এই বিষয়ে পত্র উপস্থাপনের পাশাপাশি বিতর্ক করে যাচ্ছেন। সমকামিতা বিষয় নিয়ে তার লেখাগুলো একজন চিন্তাশীল মানুষকে গভীরভাবে ভাবতে সাহায্য করবে। তার লেখাগুলো মূলত "Muslim Skeptic Collection" ওয়েবে পাওয়া যায়। তিনি বর্তমানে আমেরিকায় স্ত্রী-সন্তান সহ বসবাসের পাশাপাশি এই বিষয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

আসিফ আদনান

১৯৮৮ তে চট্টগ্রামে জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেছেন। সকল বিষয়কে সত্যিকারের চোখ দিয়ে দেখানোর জন্য এবং গভীর আলোচনার জন্য তিনি ইতোমধ্যে পাঠকমহলে সাড়া ফেলেছেন। বইয়ের জগতে "চিন্তাপরাধ" লেখকের মৌলিক রচনা, যা প্রত্যেক পাঠকের চিন্তায় আঁচড় দিয়েছে। এছাড়া সত্যকথন, ব্যাংক, মুক্তবাতাসের খোঁজে বইয়ের সম্পাদনা করেছেন।

ডাঃ শামসুল আরেফিন

ডা. শামসুল আরেফীন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন সরকারি চাকরিজীবী হলেও একজন মুসলমান হিসেবে ইসলামি আদর্শে বলীয়ান হয়ে তিনি রচনা করেছেন বেশ কিছু ইসলাম সম্পর্কিত বই, যেগুলোর কোনোটি রচিত হয়েছে গল্পের আকারে, আবার কোনোটি রচিত হয়েছে প্রবন্ধ হিসেবে। ইসলাম বিষয়ক এই লেখক জন্মগ্রহণ করেন ১৯৮৯ সালে। সাদামাটাভাবে জীবন পার করা শামসুল আরেফীন শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেছেন ক্যাডেট কলেজে। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ থেকে তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ থেকে তিনি এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। ডা. শামসুল আরেফীন এর বই এদেশীয় মুসলমানদের মাঝে লাভ করেছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা। ডা. শামসুল আরেফীন এর বই সমূহ-তে ইসলামি মতবাদ ও আদর্শ প্রকাশের পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং ইসলামের বিরুদ্ধে আসা বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের ইসলামি ব্যাখ্যা ও ইসলামি উপায়ে চলার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিধানও উঠে এসেছে তাঁর বইগুলোতে। ডা. শামসুল আরেফীন এর বই সমগ্র এর মাঝে 'কষ্টিপাথর', 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড', 'মানসাঙ্ক' ইত্যাদি অন্যতম। মানুষকে দিনের শেষে সৃষ্টিকর্তার দেয়া সমাধানের পথেই ফিরে আসতে হবে- এ কথাই ফুটে ওঠে তার রচিত বইগুলোতে।

সমকামিতা যে একটি জঘন্য বিকৃতি, চরম সীমালঙ্ঘন, ও ঘৃণ্য পাপাচার তা সম্পর্কে মানুষের সংবেদনশীলতাকে নষ্ট করে দেওয়া। তাদের ভাষায় "সমকামিতা একটি ভালো জিনিস - একেবারেই শুরুতেই তুমি সাধারন মানুষকে এটা বিশ্বাস করাতে পারবে, এমন আশা বাদ দাও। তবে যদি তুমি যদি তাদের চিন্তা করাতে পারো যে সমকামিতা হলো আরেকটা জিনিস (ভালো না খারাপ না জাস্ট আরেকটা ব্যাপার) তাহলে ধরে নাও আইনগত ও সামাজিক অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তুমি জিতে গেছো।"

[Kirk & Madsen, The Overhauling of Straight America]